সূচীপত্র

সূচনা

প্রথম ভাগ : সাহিত্যিক নিবন্ধ

দ্বিতীয় ভাগ : নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপ্‌ল্

প্রকাশকের নিবেদন

পঞ্চাশের দশকে র‍্যালফ্ ফক্সের দ্য নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপল বইটি যখন এদেশের পাঠকদের হাতে এসে পৌঁছেছিল তখন মনে হয়েছিল সাহিত্য-বিষয়ক একটি অমূল্য গ্রন্থ তাদের হস্তগত হল। এই স্বল্পায়তন গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর পাঠক ও লেখকের সমাদর লাভ করে। বিশেষ করে প্রগতিশীল লেখক ও পাঠকরা এটিকে একটি অমূল্য গ্রন্থ-হিসাবে গ্রহণ করেন।

গ্রন্থটির ইংরাজী সংস্করণ অনেকদিন আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ বইটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে আজকের নবীন পাঠক ও লেখকদের পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। এবং এই কারণেই বইটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল।

মূল গ্রন্থটির নাম The Novel and the People। বিষয়বস্তুর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে অথচ গ্রন্থের নাম ইংরাজীতে রয়ে গেল, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু 'উপন্যাস ও জনগণ' এই নামের চেয়ে নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপ্‌ল্ নামটি শুনতে ভাল এবং পরিচিতও বটে।

গ্রন্থটির মূল অংশ—দ্য নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপল অনুবাদ করেছেন শ্রীসর্বজিৎ সেন এবং প্রথমাংশ, সাহিত্যিক নিবন্ধ অনুবাদ করেছেন শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ।

বইটির মধ্যে এমন কিছু লেখক ও গ্রন্থের নাম আছে যা আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। শ্রীসর্বজিৎ সেন তার দুই সহপাঠী বন্ধু শ্রীসঞ্জয় ব্যানার্জী ও গৌতম চৌধুরীর সহযোগিতায় একটি সহায়ক সংকেত তৈরি করে দিয়ে গ্রন্থ পাঠে অনেক সুবিধা করে দিয়েছেন। এর জন্যই এঁরা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ সংক্ষেপে র‍্যালফ্ ফক্সের অমূল্য জীবন-কথা এবং মৃত্যুর কাহিনী লিখেছেন। এ ছাড়া র‍্যালফ্ ফক্সের রচনাবলীর একটি Bibliography যুক্ত করে দিয়ে পাঠকদের—র‍্যালফ্ ফক্সের অন্যান্য রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। এজন্য সিদ্ধার্থ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থটি সচেতন লেখক ও পাঠকের সমাদর লাভ করলে প্রকাশকের অভিপ্রা৷ পূরণ হবে।

প্রকাশক

র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স

র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্সের জন্ম ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংল্যাণ্ডের হ্যালিফ্যাক্সে। সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান তিনি এবং সেই অনুসারেই শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। রুশ অক্টোবর বিপ্লব যখন বিজয় লাভ করে তখন তিনি অক্সফোর্ডের ছাত্র। সেই 'দুনিয়া কাঁপানো' দিনগুলি তখনই তাঁর মনোযোগ দাবী করে। তিনি গভীর আগ্রহে জারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। অথচ র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্সের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হত যদি তিনি বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকের জীবন বেছে নিতেন, বেছে নিতেন পণ্ডিত ব্যক্তি সুলভ অলস গৃহবন্দী সংস্কৃতি চর্চার জীবন, কারণ তাঁর সেই মননশীলতা ছিল, ছিল উপযুক্ত পারিবারিক আবহাওয়া। কিন্তু তা হল না, দেখা গেল ফক্স রুশ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজের আন্দোলন অনুধাবন করছেন। দেখা গেল, তিনি ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছে সবচেয়ে দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গী হয়েছেন, শোষণহীন নতুন এক সমাজের পুনর্গঠন প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে হাতে তুলে নিয়েছেন সাংবাদিকের লেখনী। দেখা গেল, র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। দেখা গেল, সাহিত্য সম্পাদকের সেই সম্ভাব্য পদটি অলঙ্কৃত না করেই ৩৬ বছর বয়সে স্পেনে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। তার আগেই তিনি নাট্যকার রাজনৈতিক লেখক ও সাহিত্য সমালোচকের ভূমিকায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এক দিকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য, অন্য দিকে মননশীলতা—এই দুই গুণের সমাবেশ ঘটেছিল র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্সের মধ্যে। ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে, সংস্কৃতির দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি শ্রমিক বুদ্ধিজীবী মোর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

র‍্যালফ ফক্সের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার পিছনে কোনো ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কারণ ছিল না। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন একজন মননশীল মানুষ হিসাবে ইতিহাসকে অধ্যয়ন করে। কি লেখক হিসাবে, কি সাংবাদিক হিসাবে বা লণ্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবে, র‍্যালফ ফক্স হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সার্থক নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর সার্থক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত করে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত সফর শেষে ব্রিটেনে ফিরে তিনি মার্ক্সবাদী ক্ল্যাসিক গ্রন্থগুলিকে নিবিষ্ট চিত্তে আবার অধ্যয়ন করেন এবং নিজের দেশের জনসাধারণের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িত করেন। তাছাড়া সাংবাদিক হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আরো বহু দেশ ভ্রমণ করার পর সর্বহারাদের শ্রেণী সংগ্রামের এবং উপনিবেশের মানুষদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক মর্ম তাঁর কাছে আরো পরিস্ফুট হয়। দেশবাসীর কাছে তাঁর লেখনী তখন নিপীড়কদের বিরুদ্ধে নিপীড়িতদের রুখে দাঁড়াবার কাহিনী পেশ করে। এই অধ্যায়ে, ১৯২৮ সালে তিনি 'দা কমিউন অফ ক্যাণ্টন' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা ক'রে চীনা জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এই সংগ্রাম থেকেই চীনের ইতিহাসের প্রথম জনপ্রিয় বিপ্লবী সরকারের উদ্ভব।

দ্বিতীয় বার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের সময় তিনি সেখানে দু' বছর (১৯৩১ থেকে ৩২) অতিবাহিত করেন এবং সোভিয়েত জনসাধারণের জীবন প্রণালী ও তাঁদের সমাজতন্ত্র গঠনের দুঃসাহসিক প্রয়াস পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে প্রয়োগের সঙ্গে তুলনা করার এই সুযোগ তাঁর চেতনাকে আরো সমৃদ্ধ করে।

আগেও বলা হয়েছে, বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ব্রিটেনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ফক্সের জীবনকে—তাঁর মত ও পথকে গঠিত ও প্রভাবিত করে। ১৯২৬ সালে ব্রিটেনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধর্মঘটটি সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করে দেয়। জনসাধারণ তখন এক সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু 'জেনারেল কাউন্সিল অফ দা ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ান কংগ্রেস'-এর দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃবৃন্দ স্ট্রাইক প্রত্যাহার ক'রে বিপ্লবী সংগ্রামের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। অবিলম্বে এই দক্ষিণ পন্থী শ্রমিক নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বৃটেনের কমিউনিস্টদের ওপর। ফক্সের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নিবন্ধে 'এ ডিফেন্স অফ কমিউনিজ্‌ম—রিপ্লাই টু এইচ. ল্যাস্কি', এই উদ্দেশ্যেই রচিত হয় ১৯২৭ সালে।

১৯২৯ সালে সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং বৃটেনও অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩, এই ক' বছরে বহু কলকারখানায় অভূতপূর্ব ধর্মঘট হয়। শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় ভূমিকা সম্বন্ধে ক্রমেই

সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিরও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ফক্সের সমস্ত রচনাই বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে আরো তীব্র করে তোলার উদ্দেশ্যে রচিত। উপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির নিপীড়িত জনসাধারণের সঙ্গে একজোট হয়ে তবেই বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণী মুক্তি অর্জন করতে পারবে, মার্ক্সের এই বক্তব্যের সমর্থনে র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই পর্বে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে—'মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্‌ অ্যাণ্ড লেনিন অন্‌ দি ব্রিটিশ ওয়ার্কিঙ ক্লাস মুভমেণ্ট,' 'দা কলোনিয়াল পলিসি অফ ব্রিটিশ ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম,' 'মার্ক্স অ্যাণ্ড এঙ্গেল্‌স অন আয়ারল্যাণ্ড' 'ক্লাস্‌ স্ট্রাগল্‌ ইন্‌ ব্রিটেন' এবং 'লেনিন: এ বায়োগ্রাফি'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৬ সালে, স্পেনের ফ্যাসিবাদী শক্তি হিটলার ও মুসোলিনির মদৎ পেয়ে স্পেনের রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। স্পেনের স্বাধীনতাকামী মানুষ সাহস ভরে এই দেশদ্রোহীদের এবং জার্মান ও ইতালীয়ান অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিহত করে। ইউরোপে ফ্যাসিবাদকে সশস্ত্র ও সংগঠিত রূপে মোকাবিলা করার এই প্রথম প্রয়াস। এই প্রয়াসে স্পেনের গণতন্ত্রকে জহ্লাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সারা বিশ্বের বিবেকবান অগ্রণী মানুষরা তখন সমবেত হন স্পেনে। তাঁরা রিপাবলিকান সৈন্যবাহিনীর ইণ্টার ন্যাশনাল ব্রিগেডে স্বেচ্ছসেবী সৈনিক হিসাবে যোগ দেন। তাঁদের সবারই হাতে ছিল অস্ত্র আর কণ্ঠে ছিল গান—

Arise, ye prisoners of Starvation!

র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্সও স্বাভাবিক ভাবেই এই সংগ্রাম থেকে সরে থাকেন নি। ১৯৩৬-এর নভেম্বরে তিনি ফ্রণ্টের দিকে যাত্রা শুরু করেন। অনেক বাধা অতিক্রম করে ঘুরপথে তবে তিনি স্পেনে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। এই বিপদ শঙ্কুল যাত্রাপথেও তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন—'ফ্রান্স ফেসেজ্‌ দা ফিউচার' ও 'পর্তুগাল টু ডে'। এই দুটি রচনায় তিনি ফ্রান্সের কর্নেল De Le Rocque এবং পর্তুগালের একনায়ক সালাজ্‌ারের উদাহরণ তুলে ধরে ফ্যাসিবাদের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

স্পেনে আসার পর যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিহত হন। একা র‍্যালফ ফক্সই নন, ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের তরফে ডিক্টেটর ফ্র্যাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে সেদিন পৃথিবী হারিয়েছে অবিস্মরণীয় বহু মানুষকে, যাঁদের মধ্যে আছে খুবই পরিচিত কয়েকটি নাম যেমন, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জন কর্নফোর্ড ও

গ্রাৎসিয়া লোর্‌কা। র‍্যালফ ফক্স স্পেনে আসেন ইন্টারন্যাশানাল ব্রিগেডের ইঙ্গ আইরিশ শাখার রাজনৈতিক কমিশনারের পদাভিষিক্ত হয়ে। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে করডোভার কাছে লোপেরা নামে একটি গ্রামে জার্মান বোমারু বিমানের আক্রমণে তিনি নিহত হন।

আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতীক রূপে, কমিউনিস্ট বীর রূপে তাঁকে স্মরণ করেছেন আমেরিকান লেখক মাইকেল গোল্ড: 'মাদ্রিদের ব্যারিকেডে ফক্স ব্রিটেনের মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন।'

শুধু রাজনৈতিক ফ্রন্টেই নয়, সাহিত্যিক ফ্রন্টেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুণর্মূল্যায়ন ও সৃজনশীল আত্মীকরণ এবং ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার কথা ফক্স লিখে গেছেন তাঁর 'কমিউনিজ্‌ম্ ফাইট্‌্ অন্ কাল্‌চারাল ফ্রন্ট''—শীর্ষক লেখাটিতে। ফক্স তাঁর নিজের কালের শ্রেণী সংগ্রামের দাবীর কথা স্মরণে রেখে অতীতকে অধ্যয়ন করেছেন তাই তাঁর রচনা হচ্ছে অতীত সংক্রান্ত গবেষণা আর বর্তমানের প্রয়োজনের মধ্যে সেতুবন্ধন।

ফক্সের জীবনের শেষ ও সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ 'দ্য নভেল অ্যাণ্ড দি পীপ্‌ল' ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা হিসাবে বইটি মার্কসবাদী সাহিত্য জগতে একটি ক্ল্যাসিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। এই আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর তাত্ত্বিক ভিত্তিটি যতখানি সুদৃঢ় তেমনি এই আলোচনা ইংরাজী সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথ সুগম করার জন্যও লেখক ও পাঠককে সচেতন করেছে। এখানে, মূলতঃ তিনটি ধারায় ইউরোপীয় ও বিশেষ করে ব্রিটিশ সাহিত্যের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, বাস্তবতার বিকাশ থেকে পশ্চিম-ইউরোপীয় উপন্যাসের বিকাশ। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক বুর্জোয়া শিল্পের অবনতির কারণ বিশ্লেষণ। তৃতীয়তঃ, আধুনিককালে প্রগতিশীল শিল্পের বিকাশের পন্থা ও উপায়। উপন্যাসের উদ্ভবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সময় ফক্স সামাজিক ইতিহাস অনুসরণ করেই শিল্পের পর্ব বিভাগ করেছেন। তাছাড়া মহাকাব্য ও প্রাচীন রচনাকে বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে এগুলি জনজীবনেরই সমৃদ্ধতর অভিব্যক্তি। ইতিহাস অনুসরণ করে ফক্স দেখিয়েছেন মহান শিল্প মাত্রেই জনসাধারণের কাছে ঋণী। জনসাধারণের জীবন ও সংগ্রাম, তাঁদের উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষার মর্মানুধাবন করতে পারলে তবেই শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে বাস্তবতার সত্যটিকে পরিস্ফুট করতে পারেন। ফক্স সমকালীন পাশ্চাত্য উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন: শিল্প

কি ভাবে তার বর্তমান সংকট থেকে অব্যাহতি পাবে? ফক্সের বিশ্লেষণ অনু-যায়ী বুর্জোয়া সাহিত্যের এই সংকট, ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটেরই একটি স্বাভাবিক পরিণতি। বুর্জোয়া সাহিত্য বুর্জোয়া সমাজের মতোই অবক্ষয়ী ও অমানবিক। এ যুগে সাহিত্যকে সৎ শিল্পের মর্যাদা অর্জন করতে হলে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতাকে অবলম্বন করতেই হবে।

প্রসঙ্গতঃ, সমালোচনাধর্মী বাস্তবতা থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উদ্ভবের প্রণালীটিও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। গত যুগের বাস্তববাদী লেখকদের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এ-যুগের বিপ্লবী লেখকদের। সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পকে মানবতাবাদী শিল্প, অর্থাৎ মহাকাব্য বলে অভিহিত করেছেন ফক্স, কারণ আমাদের কালে মানবতাবাদের সঙ্গে শোষণমুক্তির সংগ্রাম অবিচ্ছিন্ন; আমাদের কালে মানবতাবাদের অর্থ প্রলেতারীয়ান মানবতাবাদ।

মার্কসবাদী সাহিত্যকর্মীর কাছে ব্যক্তি র‍্যাল্‌ফ ফক্স যেমন আদর্শ তেমনি অপরিহার্য 'নভেল অ্যাণ্ড দ্য পিপ্‌ল' ও। ন্যায্য কারণেই এই বইটি তিরিশের দশক থেকেই প্রগতিপন্থীদের কাছে অবশ্য পাঠ্য বিবেচিত হয়ে আসছে।

র‍্যালফ্‌ ফক্স কিভাবে নিহত হলেন

হিউ স্লেটার

(ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস কনফারেন্স থেকে)

র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স, ইংল্যাণ্ডের সুপরিচিত কমিউনিস্ট লেখক, আন্দালুসিয়ার লোপেরার কাছে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন। তিনি ছিলেন ইণ্টারন্যাশা-নাল লিজিয়ন-এর একটি ব্রিগেডের অ্যাসিট্যাণ্ট পলিটিক্যাল কমিশনার।

ফ্যাসিস্টরা করডোভার দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং সরকারী সৈন্যবাহিনী বিশেষ বাহিনী পাঠায় পাল্টা আক্রমণের জন্য। Jaen প্রদেশে, করডোভার রাস্তায় প্রথম যে গ্রামটি পড়ে তার নাম লোপেরা। এটা পাহাড়ী অঞ্চল, সুদূরে দেখা যায় বিশাল বিশাল রুক্ষ পাহাড় আর আশপাশের নীচু নীচু পাহাড়গুলোকে ঢেকে রেখেছে অলিভ কুঞ্জ—সারি সারি অফুরন্ত অলিভকুঞ্জ। এই অলিভের ক্ষেতের মধ্যেই সবচেয়ে মারাত্মক লড়াই হয়েছিল, যে-জায়গাটাকে এখন 'ইংলিশ ক্রেস্ট' নাম দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কি তীব্র ভাবে র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্সকে নাড়া দিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই পাল্টা আক্রমণে ইংরেজ ভাষাভাষী কম্পানি একটা মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিল এবং এই আক্রমণ চালানো হয়েছিল একটা পাহাড়ের নীচ থেকে। সরকারী বাহিনী অলিভ গাছের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল কারণ পাহাড়ের চূড়া থেকে শত্রু পক্ষ নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছিল রাইফেলের গুলি বর্ষণ। ডজন খানেক জার্মান জাঙ্কার বিমান নীচু দিয়ে উড়ছিল, বোমা ফেলছিল আর তাদের মেশিনগান বুলেট নিক্ষেপ করছিল ঝাঁকে ঝাঁকে। র‍্যালফ্ ফক্স ছিলেন ব্রিগেড কম্যাণ্ডারের সঙ্গে। পাহাড়ের চূড়ার দিকে প্রায় অর্ধেকটা পথ উঠে এসেছিলেন তাঁরা। এই সময় তাঁরা বুঝতে পারেন যে, শত্রুসৈন্যের ডান দিকে তাঁদের মেশিনগান চালকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে, যা তাঁরা আগে বুঝতে পারেননি। ফক্স দৌড়তে শুরু করেন। মাথা নীচু করে একটা উন্মুক্ত অঞ্চল তাঁকে পার হতে হয়। কারণ তিনি এই সৈন্য সমাবেশের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। এ সত্যিই এক দুঃসাহসী কাজ, তখন বোম্বিং আর মেশিনগানের গুলি বর্ষণ চলছে প্রচণ্ড ভাবে। আড়াল ত্যাগ করে বেরিয়ে আসা মানেই মৃত্যু। ফক্স একথা জানতেন, কিন্তু ঝুঁকি নেওয়াটা প্রয়োজন বলে তিনি বিবেচনা করেছিলেন।

পরে পুরো ফ্রন্টটার চেহারা পাল্টে যায়, দু' পক্ষের গুলি বিনিময়ের মাঝখানে এই উন্মুক্ত অঞ্চল, 'নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড' হয়ে ওঠে। সেই রাত্রে একজন সৈন্যকে পাঠানো হয়। সে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের নিহত সৈনিকদের পকেট থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ করে আনে। যে-সব জিনিস সংগ্রহ করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল র‍্যাল্‌ফ ফক্সের নোট বই এবং তাঁকে লেখা একটি চিঠি। পরের দিন কয়েকজন কমরেডকে নিয়ে একটি দল তৈরি করা হয়েছিল। কথা ছিল তাঁরা রাত্রে মৃতদেহগুলি সনাক্ত করতে যাবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেই দিন বিকেলেই পুরো ব্রিগেডটাকে অন্য এক সেক্টরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সে-কাজ আর করা হয়নি।

যে মিলিটারি কম্যাণ্ডারের সঙ্গে র‍্যাল্‌ফ্ শেষ পর্যন্ত ছিলেন, তিনি বলেন, ফক্সের বিস্ময়কর সাহসিকতার কথা বর্ণনা করার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তিনি বলেন, 'উনি ছিলেন এক অসমসাহসী মানুষ, এবং প্রধানতঃ তাঁরই প্রদর্শিত উদাহরণের জন্যে আমরা শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম এবং আমাদের যে-কজনের প্রাণ বাঁচানো গেছে তারও কৃতিত্ব ওনারই প্রাপ্য। তিনি যে সত্যিকার বীর ছিলেন একথা বলার মানে এই নয় যে আমি প্রথা মাফিক একজন মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি।'

সাহিত্যিক নিবন্ধ

ব

টিল্ উলেনস্পিগেল—বিদ্রোহের উপাখ্যান

এই মহান গ্রন্থটিকে তার নিজের দেশের বাইরে পরিচিত করার জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধটির প্রয়োজন পড়েছিল। এই পরিচয় ঘটানোর জন্য বেল্‌জিয়ান কৃষক শ্রেণীকে যে-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তা তাঁদের শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী যন্ত্রণার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। এ এক বিচিত্র পরিহাস কারণ এই গ্রন্থের রচয়িতা চার্লস দ্য কোস্টার যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন ও দরিদ্রদের ভালবাসতেন। যুদ্ধের স্রষ্টা ও দরিদ্রের নিপীড়কদের প্রতি তিনি ছিলেন ভয়ঙ্কর রকমের বিরূপ। কিন্তু ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোস্টার যখন মারা যান তাঁর নাম কেউ জানতনা। তাঁর লেখা এই বইটি উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস, সর্বকালের মহান বিপ্লবী মহাকাব্যগুলির অন্যতম, অথচ বইটির নামও কেউ শোনেনি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যদি বেলজিয়াম সম্বন্ধে আবেগপ্রবণ আগ্রহ না জাগাত তাহলে ইংল্যাণ্ডে এখনো অবধি এই বইটির কথা কেউ জানতে পারত না।

১৯২২ সালে খুব চড়া দামে এই বইটি প্রথম ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়। সেই একই অনুবাদ আবার পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে। খুবই সুন্দর ভাবে মুদ্রিত ৬৭৭ পাতার বই, দাম ৭ শিলিং ৬ পেন্স। দামটা খুবই বেশী, কিন্তু আজকালকার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের অকিঞ্চিৎকর কল্পনাও যখন একই দরে বিকোচ্ছে তখন এটাকে সস্তাই বলতে হবে।

টিল্ উলেন্স্পিগেল (owlglass) এক ফ্লেমিশ কয়লাখনি-শ্রমিকের পুত্র। স্পেনের ফিলিপের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল। টিল্-এর পিতা ক্লেস একজন সৎ প্রাণবন্ত মানুষ। একজন গুপ্তচর তাঁকে স্প্যানিশদের কাছে ধরিয়ে দেয় এবং ধর্মদ্রোহী বিবেচনায় তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। ক্লেস্ তাঁর সঞ্চয় কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন সেই কথা বার করে নেবার জন্যই এই অত্যাচার চালানো হয়।

আর টিল্ হচ্ছে একজন দুর্নিবার বিদ্রোহী। "ক্লেস-এর চিতাভস্ম তার বুকের ওপর আঘাত হানে"। বিদ্রোহী শ্রমিকদের এক অবিনশ্বর প্রতিভূ টিল। রুশ বিপ্লব-নির্ভর সাহিত্যে এ রকম বহু চরিত্র পাওয়া যায় যারা টিল্-এর সমধর্মী— হাসিখুশি, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, বিয়ার পান করতে ও খেতে ভালবাসে, নিজের

বক্তব্যটা বোঝাতে গিয়ে যে-কোন সময়ে পাদ্রী বা বুর্জোয়াদের নিয়ে মোটা রসিকতা করতে প্রস্তুত, অথচ তারা নির্ভয়, বুদ্ধিমান, তৎপর এবং শত্রুকে আমৃত্যু ঘৃণা করে। এই বই পড়তে পড়তে প্রায়ই হাসতে হাসতে পেট ফাটার উপক্রম হবে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী মনে হবে, সেই চিতাভস্মের বোঝা বুকের ওপর যেন আঘাত হানছে, যেমন হেনেছিল টিল্‌কে এবং সেই অবিনশ্বর বিপ্লবী উদ্দেশ্যর কথা মনে পড়ে যাবে।

'The Legend of Tyl Ulenspiegel and Lamme Goedzak, and their Adventures Heroical, Joyous and Glorious in the Land of Flanders and Elsewhere'—এটি একটি সুগঠিত উপন্যাস। রিচার্ড স্ট্রাউসের গীতি-কবিতার জার্মান লোককথার বীরের সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে আছে, টিলের জন্ম ও কৈশোরের গল্প, সৎ কর্মী ক্লেস্‌-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও তাঁর মৃত্যুর কথা, অর্ধ-নির্বোধ ক্যাথারিন ও তার অবৈধ কন্যা এবং টিলের প্রেমিকা ও সঙ্গিনী নিলির কথা এবং স্প্যানিয়ার্ডদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার কাজ শুরু করার জন্য টিলের আহ্বানের কথা।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ল্যাম্মি গোয়েড্‌জাকের (Lammey Goedzak) সঙ্গে টিল্‌-এর ফ্ল্যাণ্ডার্স ভ্রমণের বৃত্তান্ত। এই ল্যাম্মি হল টিলের স্থূলকায় এক বন্ধু। মদ্যপান ও ভক্ষণে সারা ফ্ল্যাণ্ডার্সে তার আর জুড়ি নেই। দয়ালু, আবেগপ্রবণ ও একটি বিষাদময় চরিত্র। বিপ্লবের জন্য যে শক্তি তৈরি হচ্ছে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে টিল্‌, আর ল্যাম্মি খুঁজছে তার স্ত্রীকে। তার স্ত্রী এক স্প্যানীশ রাস্‌পুটিনের প্রভাবে পড়ে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। বিদ্রোহের জন্য গোপন আলোড়নের এ এক অপূর্ব চিত্র নির্ভীক কৃষক, মুদ্রাকর, কর্মকার এবং শ্রমিকদের চিত্র, যারা গোপনে তৈরি করছে অস্ত্র, বিলি করছে নিষিদ্ধ ফ্লেমিশ বাইবেল আর ওদিকে এগ্‌মণ্ট, হর্ন প্রভৃতি মহান অভিজাতকুলের লোক ও অবশিষ্টরা তখন ইতস্তত করছে, অকারণ ঝগড়া বাধিয়ে রেখেছে, সাহসভরে স্পেনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে ও লড়াই করতে নারাজ। যুগ যুগ ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের ঘৃণ্যতম রূপটি দেখা যায় এখানে সেই গুপ্তচর, সংবাদদাতা, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দালালরা। দেখলেই বোঝা যাবে ঠিক এই একই ব্যাপার আজ ভারতবর্ষে চলছে।

তৃতীয় খণ্ডে বিদ্রোহের শুরু। উইলিয়াম দা সাইলেণ্ট বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করছে, টিল্‌ ও ল্যাম্মি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশের মধ্যে। তারা স্প্যানিশ

মনোভাবাপন্নদের ধরিয়ে দিচ্ছে, অস্ত্রের চোরাচালানের ও বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য সংগ্রহের কাজ সংগঠিত করছে। লার্ক পাখীর মতো শীষ দেয় টিল্ আর যখন তার উত্তরে "তূর্যনিনাদ" শুনতে পায় বুঝতে পারে বিদ্রোহীদের কোন গুপ্তচরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে।

এই খণ্ডেই টিল্ তার পিতার হত্যাকারীকে আটক করে। এই লোকটি গোপনে বসে নজর রাখত বালিয়াড়ির নিঃসঙ্গ পথিকদের ওপর, মেলা-ফেরত মহিলা ও মাতাল কৃষকদের ওপর। সে অতি ঘৃণ্যভাবে তাদের হত্যা করত ও লুঠ করত।

বিশ্বাসঘাতকের পরিণতি ভয়ঙ্কর। "আর তার হাতটা কেটে ফেলা হল, এবং তার জিভে বিঁধিয়ে দেওয়া হল তপ্ত শলাকা, এবং ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল টাউন হল-এর দরজার সামনে।" এই বইয়ে কোন আবেগ প্রবণতা নেই। বিদ্রোহীরা স্প্যানিয়ার্ডদের মতো শঠ নয় কিন্তু তারা প্রতিশোধ নেয় দ্রুত, সেখানে তারা নির্দয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে টিল্ ও ল্যাম্মি ভিখারীদের দলের সঙ্গে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। স্থলে যে বিদ্রোহ বিফল হয়েছিল এবার সমুদ্রে তা সফল হয়। টিল্ নিলিকে বিবাহ করে এবং ল্যাম্মি তার স্ত্রীকে খুঁজে পায়। এই অংশগুলি বইয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর এবং দ্য কোস্টারের আসল উদ্দেশ্য কি সেটা পুরোপুরি বোঝা যায়। কারণ শেষ পর্যন্ত টিল্ কিন্তু মরে না। টিল্ তখন মাটিতে পড়ে আছে, আপাতদৃষ্টিতে প্রাণহীন, নিলি পাশে বসে কাঁদছে, এমন সময় এক পাদ্রী, এক অল্ডারমেন (পৌরঅধিকর্তা) দু'জন বার্গোমাস্টার (হল্যাণ্ডের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট) এবং এক ধনী কৃষক তাকে দেখতে পায়।

পাদ্রী তো এই দৃশ্য দেখেই খুশীতে ফেটে পড়ে।

"ভিখিরি উলেন্ স্পিগেল্টা মরেছে তাহলে!" পাদ্রী বলে ওঠে, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ওহে চাষী, হাত চালাও, একটা কবর খোঁড়ো·· ··"। এরপর চাষী কবর খোঁড়ে এবং উলেন্‌স্পিগেল্‌কে তার মধ্যে রেখে বালি চাপা দেয়। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পাদ্রী শুরু করে প্রার্থনা······এমন সময় হঠাৎ মাটির নীচে প্রচণ্ড তোলপাড। উলেন্‌স্পিগেল্ হাঁচতে হাঁচতে, চুল থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে পাদ্রীর টুঁটি টিপে ধরে।

পাদ্রী, অল্ডারমেন, বার্গোমাস্টার ও চাষী টিলের সমস্ত বিদ্রূপ ও ঘৃণার এই প্রতীকরা পিঠটান লাগায়।

টিল্ বলে, "ফ্ল্যাণ্ডার্স মাতার তেজ উলেন্‌স্পিগেল্, আর তাঁর হৃদয় নেলিকে

কি কেউ কবর দিতে পারে?" কারণ হু কোস্টারের কাছে একজন শ্রমিকই তার দেশের শাশ্বত তেজ, এবং একমাত্র এই শ্রমিকের মাধ্যমেই সেই দেশের মুক্তি আসবে। পাছে তাঁর রচনা থেকে এই কথাটি স্পষ্ট ভাবে ধরা না পড়ে সেইজন্তে হু কোস্টার একটি মুখবন্ধ লিখেছিলেন। একটি তিক্ত বর্বর মুখবন্ধ। এটি এমন একজন মানুষেরই কথা, যিনি বুর্জোয়াদের নির্যাতন ও আত্মতুষ্টিকে ঘৃণা করতেন এবং যে মানুষটিকে উৎপীড়িত হতে হয়েছে। বর্তমান ইংরাজী সংস্করণে মুখবন্ধটি অনূদিত হয়নি কারণ স্যার এডমাণ্ড গস্‌সে নামে ওই "অপূর্ব পেঁচা"-টির মতে এটি নাকি "দুর্বোধ্য" এবং লেখক এখানে "দিশেহারা হয়ে পড়েছেন"।

মুখবন্ধটির নাম "পেঁচার মুখবন্ধ"। পেঁচাকে এখানে আত্মতুষ্ট নোংরামির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ হল সেই সর্বজ্ঞানী শিকারী পাখী যে রক্ত পান কোরে জীবন ধারণ করে আর অন্ধকারে আঘাত হানে। পেঁচা এই মুখ-বন্ধটি লিখেছে এবং কি লিখেছে দেখুন—

"আপনি হয়তো বিস্মিত হবেন যে প্রজ্ঞার প্রতীক হল কি না একটা বিষণ্ণ অদ্ভুত পাখী, চশমা আঁটা এক পাণ্ডিত্যাভিমানী [স্যার্ এডমাণ্ড!], মেলার এক অভিনেতা, অন্ধকারের ও নিঃশব্দ বিচরণের এক বন্ধু, এবং যে কখন আসে কেউ শুনতে পায় না এবং এইভাবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতোই যে খুন করে বেড়ায়? কিন্তু ওহে ভেকধারী ভালো মানুষেরা, যারা আমায় দেখে হাসছ, সব কিছু সত্ত্বেও তোমরাও আমারই মতো,......তোমাদের সবার ইতিহাসেই কি এমন কোন বিষণ্ণ প্রভাতের উদয় হয়নি, যে-প্রভাত তার পাণ্ডুর আলো ছড়িয়েছে নর নারী ও শিশুদের বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ-জমা ফুটপাতের ওপর? পৃথি-বীতে রাজত্ব করতে শুরু করার পর থেকে কিসের ওপর বেঁচে আছে তোমাদের রাজনীতি? হত্যা এবং গণহত্যার ওপর......"

পেঁচা লেখককে বলছে:

"তুমি কি নিশ্চিত যে এখন পৃথিবীতে কোন চার্লস ফিফথ বা ফিলিপ সেকেণ্ড নেই? তোমার কি ভয় করে না যে, সতর্ক সেন্সর-ব্যবস্থা সমসাময়িক মহাত্মাদের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে কিনা জানতে গিয়ে তোমার ওই হাতির পাকস্থলীর মধ্যে অনুসন্ধান করবে এবং বলবে, কেন তুমি এই সম্রাট আর এই রাজাকে সমাধিকক্ষে ঘুমোতে দাওনি? কেন তুমি অমন এক মহিমান্বিতকে দেখে ঘেউ ঘেউ করেছ? যারা আঘাত ডেকে আনে তারা সেই আঘাতেই মরবে। এমন মানুষ আছে যারা তোমায় ক্ষমা করবে না, আমিও তোমায় ক্ষমা করছি না, তুমি আমার বুর্জোয়া খাদ্য পরিপাকে বিঘ্ন সৃষ্টি করছো।'

বেচারা ছ্য কোস্টার! আটচল্লিশের নির্ভেজাল তেজে প্রদীপ্ত দ্য কোস্টার জানতেন তাঁর বইটি কখনোই সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। তবে তাঁর সেন্সর ব্যবস্থাকে ভয় পাবার কোন দরকার ছিল না। তাঁকে এর চেয়েও শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হয়েছে—এই পেঁচারা তাঁকে "দেশপ্রেমিক" লেখক বলে অনুগ্রহ করেছে। দ্য কোস্টার একমাত্র তাঁর নিজের লোকেদের মধ্যেই নিরাপদ থাকতে পারেন। তিনি তাঁর বইটি লিখেছিলেন শ্রমিকদের জন্য। শ্রমিকরাই বইটিকে সযত্নে রক্ষা করুক।

সানডে ওয়ার্কার, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮

"সোয়ান সঙ"

অনেক কিছুরই "সোয়ান সঙ" (শেষ গান)। ফর্‌সাইট্ পরিবারের শেষ গান, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ গান এবং শেষ গান জন গল্‌স্‌ওয়ার্দির। জন গলস-ওয়ার্দি সেই লেখক যিনি তাঁর সারা জীবন নিজের দেশের শাসক শ্রেণীকে পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়েছেন এবং তিনি যা লিখেছেন তাকে "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃশ্য" বলা যায়। যাঁরাই উপন্যাস পড়েন "ফর্‌সাইট্ সাগা" পড়েছেন। এটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি পরিবারের এক সুবৃহৎ ইতিহাস—এই পরিবারের উর্ধারোহণের এবং শেষ পর্যন্ত পরিবারটির ভাঙনের ইতিহাস। এই বিবরণ আছে দ্বিতীয় ট্রিলজিটিতে, 'সোয়ান সঙ' যার শেষ খণ্ড। এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই ধরা উচিত। ফরসাইট্‌দের এই ইতিহাস একটি শ্রেণীর সত্যকার ছবি। এই শ্রেণী এক উল্লেখযোগ্য শ্রেণী। এই শ্রেণী এককালে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এই সেই শ্রেণী যে সবার ওপর আধিপত্য করত ও ঘৃণা করত বাকি দুনিয়াকে এবং তারই পরিবর্তে বাকী দুনিয়া ঘৃণা করত আবার এই শ্রেণীকে।

"যত হতচ্ছাড়া বিদেশী", এই মন্তব্য সোমেস্ ফর্‌সাইটের। যারা বৃটিশ নাগরিকত্বের গোলাপী আভার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার মতো ভাগ্য করে আসেনি তাদের উদ্দেশে। আমরা অবশ্য সোমেস্-এর হয়ে এটাও যোগ করে দিতে পারি যে শুধু বৃটিশ নাগরিক হলেই চলবে না, বৃটিশ নাগরিক হিসাবে একমাত্র যেটা কাজে লাগতে পারে সেটা হচ্ছে সোমেস-এর পরিবারের মতোই সমৃদ্ধশালী ও অভিজাত কোন পরিবারের সভ্যপদ। এই হতচ্ছাড়া বিদেশীরাই সোমেস্-এর মহিলার দল, যারা তাঁর সম্পদ সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য সেকথা তিনি এতগুলো শব্দ যোগে ব্যক্ত করেননি। তিনি কেবল তাঁর পরগাছা গৃহভৃত্যদের জন্য—মালি, গাড়ির ড্রাইভার ও বাটলারের জন্য কিঞ্চিত মাত্র, অতি সামান্য পরিমান সাধারণ মানবতাবাদ মঞ্জুর করেছেন।

এছাড়া, তাঁর বর্ণনায় গাড়ির ড্রাইভার সাধারণতঃ, সেই রিগ্‌স্ "লোকটা"। মালি তাঁর ধারণায় "কখনো কখনো কাজ করে, হয়তো বা মাঝ রাতের পর অতি মূল্যবান মুহূর্তে।" আর বাটলার হল "এই বাটলারটা।"

জেনারেল স্ট্রাইকের সময় সোমেস্ এদের সবাইকে "স্পেশাল" হিসাবে

তালিকা-ভুক্ত করেন। স্ট্রাইক চলাকালীন সোমেস্ ও তাঁর মতো আর সবাই, এমন কি তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে নিরেট মস্তক ও আবেগপ্রবণ, যেমন সোমেস্-এর দুঃসহ জামাতা মাইকেল মণ্ট অবধি একেবারে খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করেছিল যে তাদের দেশবাসী ভাইয়েরাও "হতচ্ছাড়া বিদেশী" ছাড়া কিছু নয়।

এই ঘটনার আগে, বলতে গেলে, এদের সম্বন্ধে সোমেস্-রা আদৌ সচেতনই ছিল না। যেটুকু ছিল, সেটা একটা সখের ব্যাপার, যখন হাতে আর কোন কাজ থাকতনা, যখন তাঁরা বেকারদের জন্যে বস্তি গড়তে বা মুরগী প্রতিপালন করতে উঠে পড়ে লাগতেন।

কিন্তু ওনাদের রীতিমত সচেতন করে দিয়েছিল এই জেনারেল স্ট্রাইক, যে ঘটনা থেকে "সোয়ান সঙ" শুরু হচ্ছে। তখন ওনারাই হয়ে দাঁড়ালেন সাক্ষাৎ "ইংল্যাণ্ড", ১৯১৪-র গৌরবময় স্মৃতিতে ভরপুর, ওনারাই দেশকে তখন রক্ষা করছেন। বাকী সবাই, লক্ষ নিযুত ধর্মঘটী ও তাঁদের পরিবার বর্গের নামকরণ হল "ওরা", মানে একটা অচেনা অজানা দুরাচারী শক্তি, যে শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, যেমন লড়তে হয়েছিল জার্মানদের বিরুদ্ধে। পক্ষান্তরে, সোমেস্ ও তাঁর বন্ধুরা হল "আমরা"। "ওরা বলে আমরা সংগঠিত হতে পারি না।"

স্ট্রাইক শুরু হবার পরের দিন হাইড্ পার্কে গিয়ে তরুণ মণ্ট মন্তব্য করল, 'এই ঘটনার পরেও কি আমরা পারি না!'

সোমেস্-এর একটি কন্যা আছে। সে আরো দুঃসাহসী, সমাজের এক নেত্রী, এক কলঙ্কময় আইনের মামলার নায়িকা, পাজামা ও বোতল-খাঁচের আমোদ-প্রমোদের দৃঢ়চিত্ত সংগঠিকা। এক ব্যারোনেটের পুত্র তরুণ মণ্ট তার স্বামী। মণ্ট একজন এম, পি। সোমেস দুহিতা ফ্লয়ার ভাবে তাদের একজন মুসোলিনি দরকার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এক রেলওয়ে টার্মিনাসে দলছুট বিশ্বাসঘাতকদের জন্য একটা ক্যাণ্টিন খোলে। এই মেয়েটির এক কাকা ছিল ডিক্ শেপার্ড টাইপের একজন জনপ্রিয় যাজক। এই লোকটি "স্পেশাল" হয়ে দাঁড়ায়। মণ্টের সঙ্গে তার যখন হোয়াইট হলে দেখা হয়, মণ্ট তার অঙ্গে ইউনিফর্ম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে প্রত্যুত্তরে যাজক বলে, "আপনিও কি ওদের মতো নাকি, যারা ভাবে যে পার্থিব আনন্দের মধ্যে গীর্জার স্থান নেই?"

জন ফর্‌সাইট্, ফ্লয়ারের এক পূর্বতন প্রেমিক, বিয়ে হয়েছে এক আমেরিকান "ফর্‌সাইট"-এর সঙ্গে। সে স্ট্রাইকের খবর পেয়েই ছুটে আসে ইংল্যাণ্ডে।

দালাল ফায়ারম্যান হিসেবে সে একটা রেল্-ইঞ্জিনে কাজ নেয়। "স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে এক অস্বাভাবিক আনন্দ আছে—আবার ইংল্যাণ্ডে আসা, ইংল্যাণ্ডের জন্য কিছু করা।"

আর আশ্চর্য ব্যাপার, লেখকও মনে হয় বিশ্বাস করছেন যে এই মূর্খ, নিষ্ঠুর, অর্থগৃধ্নু ও লম্পট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর নারীর পালের কথা বলতে গিয়ে তিনি যেন সত্যিই ইংল্যাণ্ডেরই বিবরণ দিচ্ছেন। লেখক উপলব্ধি করেছেন যে এরা একটা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং এক দিক দিয়ে এই সংকটের হুমকি দিচ্ছে "ওরা", সেই অন্ধকার অচেনা জনসাধারণ। কিন্তু ওই অবধিই। তিনি যে-ভাবেই চেষ্টা করুন না, গলসওয়ার্দি বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে, তাঁর এইসব চরিত্রদের টিকিয়ে রাখা দরকার। অবশ্য একথা ঠিক যে, সত্যিই বাস্তব জীবনে এ ধরনের লোক দেখা যায়। এরাই হল "ইংল্যাণ্ড", "ইংলিশ" কৃষ্টি, "ইংলিশ" সভ্যতা। এদের মধ্যে বৃদ্ধ সোমেসই আসল ঘুঘু, লোভের চোটে সে হাঁকপাঁক করছে, তার জীবনের নিয়ন্ত্রক আবেগ হল তার সম্পত্তি-চেতনা। এমন কি কন্যা ফ্লয়ারের প্রতি তার যে উন্মত্ত ভালবাসা সেই ভালবাসাও আসলে সুন্দর এক টুকরো রক্ত মাংসের প্রতি ভালবাসা, যা তার নিজের, যা তার সৃষ্টি। তার এই কন্যাকে সেই প্রয়োজনীয় পরিবেশাদি সে যৌতুক দিয়েছে, যার মধ্যে তাকে সবচেয়ে গৌরবময় ও সুন্দর দেখাবে।

ফ্লয়ার নিজেও সংকীর্ণমনা, একটি ভড়ংবাজ, শুধু সামাজিক উচ্চাশা পোষণ করে। সে তার পিতার মতোই সম্পত্তি সম্বন্ধে সচেতন। জন ফরসাইট্কে তার আমেরিকান পত্নীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ফ্লয়ারের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই একথা ব্যক্ত হয়। অরণ্যে গ্রীষ্মের এক রাতে পাঁচ মিনিটের জন্য সফল হয়েছিল ফ্লয়ার। তারপর বাড়িতে এক অগ্নিকাণ্ড ঘটলে দুর্ঘটনায় পড়ে সোমেস্ মারা যায় এবং ফ্লয়ার এক মেকী অনুশোচনার তাড়নায় তার স্বামী ও সন্তানের কাছে ফিরে আসে।

বাকী সবাই অসার অকর্মণ্য মানুষের পাল। তারা বস্তি উন্নয়নের কাজ নেয়, এক মহান "পুনর্গঠন" প্রকল্প, কারণ তাদের এই ফাঁপা অপ্রয়োজনীয় জীবন ভরাতে তাদের কিছু একটা করা দরকার, এবং রাজনীতিকেও তারা যথেষ্ট বলে মনে করে না। অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে তাবা কাজের ভান করে, অহেতুক সময় নষ্ট করে, কিছু জানে না, কিছু বোঝে না এবং যখন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তখন অন্ধের মতো, বর্বরের মতো লড়াই করে। এঁরাই ইংল্যাণ্ডের ভদ্রলোক! নিজেদের ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়াগুলো অবধি তারা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে অসমর্থ।

"সোয়ান সঙ"-এ গল্‌স্‌ওয়ার্দি যে অধঃপতনের ছবি এঁকেছেন তা লেখক হিসাবে তাঁর কর্মক্ষমতাকেও তীব্রভাবে দংশণ করেছে। গল্‌স্‌ওয়ার্দি কোন দিনই উপযুক্ত লেখনী হাতে একজন বিশ্বস্ত পর্যবেক্ষকের বেশী কিছু ছিলেন না। কিন্তু তবু তো সেটাও একরকম। "সোয়ান্‌ সঙ"-এ তিনি মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন, যেন এই সব লোকদের নিয়ে তিনি একেবারে তিতি বিরক্ত। মনোযোগের অভাবের জন্য লেখাটাও ভুলে ভরা, স্বয়ংক্রিয়। "ইংলিশ" নিসর্গচিত্র ও "ইংলিশ" মানবতাবাদ সম্পর্কিত প্রাচীন গল্‌স্‌ওয়ার্দি-সূত্রগুলিকে যেন স্রেফ উগ্‌রে দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, এই রকম একটা বাক্যের কি অর্থ করবে লোকে : "এটা মনে হয়নি যে জন্‌-এর জন্য ফ্লয়ারের এই আকাঙ্ক্ষা একটা প্রতীক হতে পারে! ফ্লয়ারের রক্তে যে তৃষা রয়েছে জীবনের জন্য, সম্পূর্ণ জীবনের জন্য এবং শুধুই জীবনের জন্য—তারই প্রতীক হয়তো।" গিলবার্ট ফ্র্যাঙ্কাউ বা "পেগ্‌'স নভেলটিজ"-এর একজন লেখককে এটা মানায়, কিন্তু বৃটিশ বুর্জোয়াজির সাহিত্য-কেশরীর পক্ষে এটা নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়েরই লক্ষণ। "সোয়ান সঙ"-এর লিখনশৈলীতে এই রকম অনেক উদাহরণ আছে যা মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচকের হাতে যদি সময় থাকত, তাহলে তিনি আকর্ষণ বোধ করার মতো অনেক কিছুই খুঁজে পেতেন এই দুটি ট্রিলজিকে তুলনা করে, উঠতি ফরসাইট বনাম পড়তি ফরসাইটদের এবং তদনুসারে স্রষ্টার লিখনশৈলীর বিনাশ তুলনা করে।

সান্‌ডে ওয়ার্কার, ২৯শে জুলাই, ১৯২৯

"ওপ্‌ন্‌ কন্সপিরেটর"
(প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারী)

একজন চিন্তাশীল লেখক তাঁর আত্মজীবনী লিখে রেখে গেছেন এই ব্যাপারটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বিরল। মিস্টার এইচ জি ওয়েল্‌শ-এর "এক্সপেরিমেণ্ট ইন অটোবায়োগ্রাফি"-র সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার বোধহয় এইটাই। কারণ ওয়েলশ নিজের সম্বন্ধে মনে করেন যে তিনি যতটা না মননধর্মী সাহিত্যের একজন স্রষ্টা তার চেয়ে বেশী এবং সর্বোপরি একটি প্রবণতার অভিব্যক্তি। "ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব থেকে বাস্তব প্রয়োগের উপযোগী একটা বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়ে তুলতে আমি আমার জীবন শক্তির একটা বড় অংশ ব্যয় করেছি," ওয়েলশ তাঁর মুখবন্ধে লিখেছেন। সম্পূর্ণ আন্তরিক সততার সঙ্গে একথা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি মনে করেন তাঁর উপন্যাসের চেয়ে তাঁর ইতিহাস বিজ্ঞান ও অর্থনীতির ওপর জনপ্রিয় রচনাগুলির গুরুত্ব বেশী। এই যে তিনি শেষ জীবনে তাঁর এই আত্মজীবনীটা লিখলেন, সম্ভবতঃ তার মানে হয়তো এই যে, তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ এইচ জি ওয়েলশ তাঁর যে-কোন বইয়ের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারেন।

হয়তো কথাটা সত্যি। স্তালিন তাঁর সাক্ষাৎকারে ওয়েলশকে "একজন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষ" বলেছেন। অবশ্যই তিনি যা লিখেছেন, সেই লেখাই তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে, তবে এক অর্থে তিনি আবার মানুষ হিসাবে তাঁর রচনার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছেন। "আত্মজীবনী"-টা তো তারই স্বাক্ষী।

প্রথম খণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডেও আমরা মাঝে মাঝে সেই সৃষ্টিশীল লেখকের দর্শন লাভ করি, জীবনের প্রতি যাঁর তীব্র আসক্তি রয়েছে, যিনি গ্রহণ, অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করতে ব্যস্ত, যিনি প্রস্তুত হচ্ছেন "কিপ্‌স্‌" এবং "টোনোবাঙ্গে" লেখবার দিনটির জন্য। কিন্তু এই ওয়েলশ অতি দ্রুত প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারী হয়ে দাঁড়ান এবং বইটির প্রধান সম্পর্ক এই পরবর্তী ব্যক্তিটির সঙ্গে। "প্রধান সমস্যাগুলির প্রতি তাঁর যত মনোযোগ থাক অপ্রধান বিষয়গুলিকে তিনি যতই দূরে সরিয়ে রাখুন, প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারী কিন্তু কমিউনিস্ট বা বিজ্ঞান জগতের প্রত্যক্ষবাদীর মতোই, অবিকল রক্ত বা ফুসফুসের মতোই তাঁর অস্তিত্বের চরম সীমা অব্দি শেষ পর্যন্ত সুসমঞ্জসভাবে 'সত্যি' থাকেন।"

কাজেই আত্মজীবনীর উদ্দেশ্যটাও ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে "প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র-কারী"-র বিমূর্ত রূপের পিছনে কিপ্‌স্‌ ও মিস্টার লিউইসহাম-কে দেখানো যায়। এবং এই উদ্দেশ্যটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। উপরন্তু, কাজটা নির্বাহ করা হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে।

কারণ ইতিহাসের নির্মম ব্যঙ্গ এমন ভাবে কাজ করল যে, কিপ্‌সের কথা যখন শ্রুতিগোচর হল, যখন ক্ষুদ্র মানুষটা স্বর পেল এবং অভিব্যক্তির একটা উপায় খুঁজে পেল, ঠিক তখনই লোকটা দেখল, সে জীবন রক্ষার এক লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আধুনিক পুঁজিবাদ অন্তিম পর্বে প্রবেশ করবার সময় বিপুল পরিমাণে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কেরাণী, শিক্ষক, দোকান কর্মী, প্রযুক্তিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কিন্তু তারই সঙ্গে পুঁজিবাদ আবার উচ্চবর্ণ ও নারকীয় পেষণকারীদের এমন ক্ষমতা ও গুরুত্ব প্রদান করার ব্যবস্থা করে, অতীতে যা স্বপ্নাতীত ছিল।

কিপ্‌স্‌ এবং মিস্টার লিউইসহাম্‌ তাঁদের সব দুর্বলতা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁদের গভীর অনুসন্ধিৎসা আছে, আবেগ এবং বোধশক্তি আছে। কেন এরা গুঁড়িয়ে শেষ হয়ে যাবে? এই পৃথিবীতে যারা জন্মেছে তাদের কারুর চেয়ে এদের দৃষ্টিশক্তি কম নয়। তারা দেখতে পাচ্ছে যে পৃথিবীটা অবিন্যস্ত, দুঃশাসিত অপরিচ্ছন্ন, পরিকল্পনাহীন। তারা বুঝতে পারছে যে তাদের মগজের মূল্য আছে এবং আধুনিক সভ্যতায় তাদের অবদান তুচ্ছ নয়। জীবনে তাদের দুটি মাত্র বিকল্প আছে, হয় সুশোভন স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধির মধ্যে আরোহণ করা, নয় তো প্রম্‌লি বা কেন্ট-এর "অ্যাটলাস হাউস" কি ইউস্টন্‌ রোডের বসতির মধ্যে, ঘৃণ্য দারিদ্র্য ও কদর্যতার মধ্যে ডুবে যাওয়া। স্বাভাবিক ভাবেই তারা আরোহণটাকেই বাঞ্ছনীয় মনে করে যাতে অন্তিম বিপর্যয়ের ভীতিপ্রদ দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে ওপর তলার শ্রেণীতে পৌছবার পথটা খুঁজে নিতে পারে।

কিন্তু মানুষ হিসেবে তাদের আবার সদিচ্ছাও আছে। তাদের এই সংগ্রাম তাদের বাধ্য করেছে জগতটাকে বুঝতে চেষ্টা করতে। কাজেই, তারা দেখতে পায় যে জগতটা ভাল নয় এবং তারা এটাকে পরিবর্তন করার তাগিদ অনুভব করে। অথচ জীবন তবু বয়ে চলে ও তারা দেখে যে, মিস্টার লিউইসহামের সুযোগ অতি সামান্য, আরো বড়ো হতে পারার আশাতো দূরের কথা। তখন তারা আরো বর্ধিত উৎসাহে পরিবর্তন দাবী করে। তারা তখন প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র-কারী হয়ে দাঁড়ায়।

যে কথাটা নামের মধ্যেই স্পষ্ট সেটা হচ্ছে, এই প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে কোন

গোপন কিছু নেই। বিপ্লব ছাড়াই পৃথিবীকে এরা পাল্টাতে চাইছে। এই কাজটা এরা সেই শ্রেণীকে প্রভাবিত করে সমাধা করবে, যে-শ্রেণী তাদের আকাঙ্ক্ষিত। সেই "সংগঠনকারী", রকফেলার ও ফোর্ডদের শ্রেণী। এই শ্রেণীর "সেরা" মানুষদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতি-সচেতনদের যুক্ত করে কাজটা তারা সমাধা করবে। আর শ্রমিক জনতার কথা যদি ওঠে, প্রকাশ্য ষড়-যন্ত্রকারীরা তাঁদের ভয় পান ও অপছন্দ করেন। এই অপছন্দের ব্যাপারেও ওয়েল্‌শ খুবই সৎ। "নিকৃষ্টের উৎকৃষ্টতায় আমি কোনদিনই বিশ্বাসী নই।···আমার চিন্তার ক্রমবিকাশের কথা এই ইতিহাসে আমি লিখব। আমার চিন্তা কমিউ-নিস্ট ধারারই খুব কাছ দিয়ে এগিয়েছে কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে সংগঠিত শ্রেণী-হীন সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণার মূল কথা হচ্ছে, এটি একটি প্রসারিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যার মধ্যে ওপর দিকে যেমন অভিজাত ও ধনবানদের স্থান আছে তেমনি নিচের দিকে আছে কৃষক, প্রলেতারীয় ও নিঃস্বদের স্থান।"

আধুনিক সমাজের মধ্যবর্তী অংশের কণ্ঠস্বর হচ্ছেন ওয়েল্‌শ, তাঁর সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এইখানেই। এঁরা আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা থেকে রেহাই পাবাব জন্য আকুল কিন্তু এঁদের নিজেদের সে সংগঠনও নেই বা সে সম্ভাবনাও নেই যে তারা এই দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসা করবে এবং বৈরিতাকে ধ্বংস করবে। তারা বেশ ভাল ভাবেই বোঝে যে এটা একমাত্র সমাজতন্ত্রের পক্ষেই সম্ভব এবং সমাজতন্ত্রকে তারা ভারী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রকে যে আসতে হবেই তাব কারণ হল, তারা চাইছে সমাজতন্ত্র আসুক। সমাজতন্ত্রকে আসতে হবে কারণ এটা "যৌক্তিক।" "এইটাই তো সত্যি যে বর্তমানে সার্ব-জনীন স্বাধীনতা এবং প্রাচুর্য অর্জনের পথে কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, আছে শুধু মনমালিন্য, আত্মকেন্দ্রিক অধিকারবোধ, দৃঢ়মূল সংস্কার, ভ্রান্ত শব্দ-মালা, চিন্তার কুঅভ্যাস, অবচেতন ভীতি ও ত্রাস এবং মানুষের মনে খোলামেলা অসামঞ্জস্য—বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ পদাসীন। ওই সাবজনীন মুক্তি ও প্রাচুর্য আমাদের নাগালের মধ্যেই দোদুল্যমান অথচ আমরা তা অর্জন করতে পারছি না. এবং আমরা, ভবিষ্যতের নাগরিকেরা, এই বর্তমান দৃশ্যপটে ইতস্তত ভ্রাম্যমান, যেন একটি জাহাজের যাত্রী, যে-জাহাজের তীরে ভেড়ার সময় পেরিয়ে গেছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনেই বন্দর অথচ জাহাজের নিয়ন্ত্রণকক্ষের একটা বিশৃঙ্খলার জন্যেই বন্দরে আমরা ঢুকতে পারছি না। যদিও এই জগতে যারা মুখ্য পদাসীন তাদের সবার সঙ্গেই আমার অল্পবিস্তর খাতির আছে, আমার সেই প্রাব্যক্ষমতা নেই যে এদের সকলকে সংহত করতে পারি। আমি তাদের সঙ্গে

কথা বলতে পারি, এমন কি তাদের বিচলিতও করতে পারি কিন্তু আমি কিছুতেই তাদের মগজগুলোকে দর্শনক্ষম করতে বাধ্য করতে পারি না।"

এইটাই হল ওয়েল্‌শ্‌-এর সমস্যা। সমস্যাটার তিনি মীমাংসা করেননি এবং এটা তাঁর মৌলিক সততারই অঙ্গ যে, সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছেন বলে তিনি খুব নিশ্চিন্তভাবে কোনও ভান করছেন না। সাধারণভাবে এই একই সমস্যা রয়েছে বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের। এরাও "আসল লোকদের' সঙ্গে কথা বলতে পারে কিন্তু তাদের কথা অশ্রুতই থেকে যায় আর সারাক্ষণই মানবতার জাহাজটি সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ে হেলেদুলে টলমল করে। জাহাজটিকে অবিলম্বে ধ্বংস করার হুমকি দেয় এই ঝড়। এইচ. জি ওয়েল্‌শ 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ'র বিশৃঙ্খলা দেখতে পান কিন্তু নেভিগেটারদের মগজগুলিকে দৃষ্টিক্ষম করতে পারেন না। যাত্রীদের তরফ থেকে তবু তিনি এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে চান, যদিও জাহাজটির প্রত্যাবর্তনের সময় বহুক্ষণ পেরিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, একেবারে ভরাডুবি হবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এরকম অনেকে আছে যারা মনে করে নৌকর্মীদের বিদ্রোহই একমাত্র জাহাজটিকে নির্বিঘ্নে তীরে এনে ভেড়াতে পারে। কিন্তু এরকম দুরন্ত দাওয়াই যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। কাজেই এমন ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে তারা বরং বাদবিতর্কই চালিয়ে যাবে। তবু একথা সত্যি যে, নাবিকদের কারুর কাছেই একটিও বোর্ড অফ ট্রেড-এর সার্টিফিকেট না থাকলেও তারা নৌপরিবহনে সক্ষম। একেবারে শঙ্কাহীনভাবে না হলেও বন্দরে পৌঁছবার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাদের আছে।

ওয়েলশ কিন্তু একথা বিশ্বাস করেন না এবং উত্তেজনা ও বিপদ যত বেশীই হোক, বিদ্রোহী নৌকর্মীদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে তিনি ভয় পান। আত্মজীবনীটা পড়লে সহজেই বোঝা যায় কেন তিনি ভয় পাচ্ছেন। কারণ তিনি এই বিশ্বাসের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছেন যে বোর্ড অফ ট্রেড-এর সার্টিফিকেটের মধ্যে যে-ইন্দ্রজাল আছে তার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এটা ফেবিয়ান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি।

ফেবিয়ানদের বিশ্বাস ছিল অসামরিক সরকারী দপ্তর সমূহের 'মুখ্য পদগুলি' অধিকার করেই তারা দেশ শাসন করতে পারবে। "তারা ভাবতে চেষ্টা করেছিল যে-কোন আধুনিক প্রশাসনিক ও পরিচালক গোষ্ঠী, অভিভাবক বর্গ বা কংগ্রেসের পক্ষে 'লোক সমাজের' ভূমিকা পালন করা ও জটিলতম অর্থনৈতিক কর্মভার 'অধিগ্রহণ' করা সম্ভব।" ওয়েলশ কখনো একথা বিশ্বাস করেন নি। কারণ তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল যে, শাসক শ্রেণীর অভ্রান্ততাকে ভিত্তি করেই

গড়ে উঠেছে এই চিন্তাধারা। আর এই শাসক শ্রেণীকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। কাজেই ফেবিয়ানদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ঘটে।

কিন্তু তাঁর নিজের ধারণাই কি কখনো খুব একটা ভিন্ন ধরনের ছিল? কঠিন শৃঙ্খলার ও বুদ্ধিবৃত্তির আভিজাত্যের বন্ধনে আবদ্ধ কিছু নির্বাচিত নর-নারীর এক দলের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সেই "সুযোগ্য গ্রহণকারীকে"। যাকে প্রথমে তিনি "সামুরাই" আর পরে "প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারী" আখ্যা দিয়েছেন।

যুদ্ধের ভয়ঙ্কর শিক্ষা সত্ত্বেও, বর্তমানের এই সঙ্কট সত্ত্বেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না যে এটা একটা ক্ষমতার ব্যাপার, শ্রেণী বিন্যাসের ব্যাপার। সত্যিই তিনি এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গির ঘোর বিরোধী। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক মনটার জন্য তাঁর ওই রকম সাচ্চা আবেগ রয়েছে, তাঁর সেই বৈজ্ঞানিক মনটা নিশ্চয় উপলব্ধি করবে যে, যারা পৃথিবীটাকে ভাগাভাগি করে নেবার যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দিতে পারে, এবং মানবিক উত্তরাধিকার বিপন্ন করতে পারে, তারা সম্ভবতঃ মহত্তম প্রতিভাবানদের জন্য পথ করে দেবেনা। মানুষের মগজ তারা খরিদ করে। খরিদ করা ভিন্ন মানুষের মগজ আর তাদের অন্য কোন কাজে লাগেনা।

ওয়েলশ একটা বিরাট ভুল করেছেন। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের ক্যাপটেন আর অফিসাররাই যে আবার জাহাজটির মালিক, এই তথ্যটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাঁরা যেমন নির্বাচিত কিছু যাত্রীর হাতে পরিচালনা ভার দেবেন না, তেমনি দেবেন না বিদ্রোহী নাবিকদের হাতে। যাত্রীরা যদি নিজেদের এবং সেই সঙ্গে জাহাজটিকেও রক্ষা করতে চান তাহলে তাঁদের নাবিকদের সঙ্গে হাত মেলানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মার্ক্স-এর প্রতি ওয়েলশ-এর ঘৃণা বিস্ময়কর হলেও খুব সহজেই তার ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমেই বলতে হয়, ওয়েলশ কখনো মার্ক্স-এবং এঙ্গেলস পড়েন নি। পড়লে তিনি অবশ্যই এই অতি মৌলিক তথ্যটি জানতে পারতেন যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় কখনোই ইউটোপিয়ান-দের দোষী সাব্যস্ত করেননি। বরং, তাঁরা এঁদের চিনতেন এবং ইউটোপীয়ানদের রচনা যেভাবে শ্রদ্ধা করতেন, স্বয়ং ওয়েলশও তা করেন না। মার্ক্স সম্বন্ধে ওয়েলশ এই ভাবে লিখেছেন।

"তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলি পরীক্ষা করেন, বিশ্লেষণ করেন এবং তার থেকে কতকগুলি স্থূল সাধারণীকরণ প্রস্তুত করেন। কিন্তু একটা প্রকল্পকে সংশ্লেষণ করার মতো চিন্তা শক্তির অভাব ছিল তাঁর। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে

তিনি সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রতি একটা সত্যিকার ঈর্ষা জাগিয়ে তোলেন। ভোঁতা বুদ্ধিকে তাঁরা প্রখর কাণ্ডজ্ঞান হিসাবে মুখোশ পরিয়ে রাখতেন। আর পরিকল্পনা করা, তার মানে "ইউটোপিয়ানিজম্" শেষ পর্যন্ত একটি কালো জুজুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মার্ক্সবাদী অসহিষ্ণুতা নানা রকম জুজুর যে লম্বা ফর্দ বানিয়েছিল, এটা তার মধ্যে অন্যতম।"

এই কথাগুলো বড়ই হাস্যকর অনুকরণ। একমাত্র এই বলেই এর ব্যাখ্যা করা যায় যে, ওয়েল্‌শ্‌ কখনো মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স্ পড়েননি। এইটুকুই বোধ হয় যথেষ্ট নয়। এটা একমাত্র এইভাবেই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় যে, মার্কস এঙ্গেলস্-এর কথা ওয়েল্‌শ শুনেছেন অন্যের মুখ থেকে, যারা মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা বিকৃত করেছে, তাদের কাছ থেকে। ওয়েল্‌শ যে-চিত্র এঁকেছেন তা খুবই নিখুঁত তবে কিনা সেটা হিণ্ডম্যান্, বেলফোর্ট ব্যাক্স প্রাক্ যুদ্ধ পর্বের ইংরাজ "মার্ক্সবাদ"এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই "মার্ক্সবাদ"-কেই এঙ্গেলস যথাসম্ভব ক্রুদ্ধভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপরেখা খুব পরিষ্কার ভাবে দিয়েছেন 'দা গথা প্রোগ্রাম'-এ, 'দা হাউসিঙ প্রবলেম'-এ, 'দা পেজেন্ট কোশ্চেন ইন ফ্রান্স অ্যাণ্ড জার্মানী'-তে, 'অ্যান্টি ডুয়েরিঙ'-এ, তাঁদের চিঠিপত্রে এবং আরো বহু জায়গায়। এই দুটি মানুষের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের সংগঠন সম্বন্ধে এমন জ্ঞান ছিল যে তার তুলনায় কেনসিঙটন নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রটিকে নেহাতই এক খেলো অপেশাদার বলে মনে হয়। ওয়েল্‌শ সামরিক বিষয়ে তাঁর কল্পনার জন্য গর্বিত হতে পারেন, তাঁর বিশ্বযুদ্ধের আগেকার রোমান্সগুলির অনেক অনুমান অসামান্য হতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এঙ্গেলসের প্রকৃত জ্ঞান ও ভবিষ্যদ্বাণীর কাছে তা একেবারেই নিষ্প্রভ।

মার্কস ও এঙ্গেলস পরিকল্পনাকে অশ্রদ্ধা করতেন এবং এই কারণেই মার্কস ও এঙ্গেলস ওয়েলেশ-এর সঙ্গে একমত নন, একথা ঠিক নয়। তাঁদের ভিন্নমত পোষণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, তাঁরাই প্রথম দেখিয়েছিলেন যে কোন্ অবস্থায় পরিকল্পনা সম্ভব হয় এবং ধনতান্ত্রিক অরাজকতা অপসারিত হয়। স্তালিন ওয়েল্‌শের সঙ্গে আলোচনার সময় এই মূল বৈষম্যটিকে এত সহজে সন্নিবদ্ধ করেছেন যে তাঁর কথার সারসংক্ষেপ করার চেষ্টা করাটা মূর্খামি হবে।

"অবশ্যই, ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত যদি একটানে কারিগরী বিদ্যায় বিদ্বানদের ধনতান্ত্রিক জগত থেকে মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু এটা একটা ইউটোপীয়া (অলীক চিন্তা)। কারিগরী বিদ্যায় বিদ্বানদের মধ্যে

এমন মানুষ কজন আছে যারা সাহস করে বুর্জোয়া জগত ত্যাগ করে চলে আসবে এবং সমাজকে পুনর্গঠিত করার কাজে যোগ দেবে? আপনি কি মনে করেন এই ধরনের মানুষ সংখ্যায় খুব বেশী? ইংল্যাণ্ডের বা ফ্রান্সের কথাই চিন্তা করুন না? না, নগণ্য কয়েক জন আছে যারা তাদের মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজী হবে এবং দুনিয়াকে পুনর্গঠিত করতে শুরু করবে।

"তাছাড়া, আমরা কি এই সত্যটিকে বিস্মৃত হতে পারি যে, দুনিয়াটাকে পাল্টাতে গেলে তার জন্য 'রাজনৈতিক ক্ষমতা' প্রয়োজন? মিস্টার ওয়েল্‌শ্‌, আমার ধারণা, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটিকে আপনি একেবারেই গুরুত্ব দেন না। এটা আপনার চিন্তা ভাবনার মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েও তারা কি করতে পারে? যদি তারা ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি উত্থাপন করতে সক্ষম না হয় এবং যদি তাদের সে ক্ষমতা না থাকে? খুব বেশি হলে তারা সেই শ্রেণীটিকে সাহায্য করতে পারে যারা ক্ষমতা দখল করছে কিন্তু তারা নিজেরা জগতটাকে পাল্টাতে পারবে না। এটা একমাত্র এক মহান শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব যে-শ্রেণী ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর স্থান নেবে এবং পূর্ববর্তী ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর মতোই সর্বময় কর্তা হবে। এই শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। অবশ্যই কারিগরী বিদ্যায় বিদ্বানদের সাহায্য গ্রহণ করা হবে এবং পক্ষান্তরে তাদেরও সাহায্য করা হবে। কিন্তু তা বলে একথা কখনোই ভাবা উচিত নয় যে কারিগরী বিদ্যায় বিদ্বানরা একটা স্বনির্ভর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে। দুনিয়াটাকে পাল্টানো একটা মহান, জটিল এবং কষ্টকর প্রক্রিয়া। এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এক মহান শ্রেণীর প্রয়োজন। বড় বড় জাহাজ দীর্ঘ যাত্রায় বের হয়।"

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হচ্ছে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারীর রুজভেল্ট ও স্তালিন সকাশে তীর্থযাত্রা দিয়ে। সমাপ্তিটা আকর্ষণীয় এবং তা একদিক দিয়ে চিন্তাশীল পাঠকের হয়ে এই বিস্ময়কর, কর্ম ব্যস্ত, ও আকর্ষণীয় জীবনের সমস্যাটির সমাধান করে দিয়েছে। ওয়েল্‌শ রুজভেল্টকে একজন সরল, সাহসী, বুদ্ধিমান ও উদ্যমী মানুষ হিসেবে দেখেছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারীদের, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণদের মনগুলি "ব্রেন্‌স ট্রাস্ট"-এ জমা আছে আবিষ্কার করে তিনি আহ্লাদিত হয়েছেন। 'ব্রেন্‌স্ ট্রাস্ট' (মগজ ব্যাঙ্ক)—এই শব্দদ্বয়ের মধ্যেই তিনি একটা সাবধান বাণী অনুভব করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অন্ধ করে রেখেছে। শুধু এই একটি বিপদই নয়, তাঁব ধর্মমতের আরো গুরুতর অনেক বিপদের প্রতিও তিনি অন্ধ। ট্রাস্ট, এই একটা শব্দের

মধ্যেই ঠাসা আছে একচেটিয়া অধিকারের চিন্তা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিন্তা। সঙ্কটের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আমেরিকান ধনতন্ত্র বিদ্বজ্জনের মগজ কিনে নিচ্ছে, একটা "ট্রাস্ট" গঠন করছে এবং লড়াইয়ে নামছে।

রুজভেল্ট আমেরিকান জনতার কাছ থেকে যে সমর্থন পেয়েছেন ইতিহাসে কোন ধনতান্ত্রিক নেতা তা পায়নি। তা ছাড়া তাঁর আছে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারীদের "ব্রেন্‌স ট্রাস্ট"। তবু কিন্তু তাঁর "পরিকল্পনা" করার ক্ষমতা নেই। সংগঠন ও পরিকল্পনার যেসব গালভরা বক্তৃতা খবরের কাগজের পাতা ভরাচ্ছে আর রেডিও থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তা তিনি বাস্তবায়িত করতে পারছেন না। আমেরিকান নির্বাচন তাঁকে সাবধান করে দিয়েছে।

রুজভেল্ট বিপুল ভোটের ব্যবধানে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। বিরোধী পক্ষ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু তবু এই বিশাল বিজয়ের মধ্যেও দুটি জিনিস চোখে পড়ে। একটি হল, রুজভেল্টের সমর্থক ও ওয়েল্‌সের বন্ধু, আপটন্‌ সিনক্লেয়ারের ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্ণর পদে পরাজয়। "ক্যালিফোর্নিয়ায় দারিদ্র্যের অবসান" ঘটানোর জন্য সিন্‌ক্লেয়ারের প্রস্তাবগুলি সম্পত্তি বিষয়ক কায়েমী স্বার্থকে অতি কোমলভাবে ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু তবু তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত করার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট ছিল। রুজভেল্ট যদি প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারীকে গুরুত্ব দেবার মতো মূর্খামি করতেন, তাঁর ভাগ্যেও একই ঘটনা ঘটতো।

দ্বিতীয় শিক্ষাটি পাওয়া যাবে সংবাদপত্রের মন্তব্য থেকে। অসাধ্য সাধন করতে পারেন বলে রুজভেল্টের ওপর তাঁদের আস্থার কথা ঘোষণা করেছেন লক্ষ লক্ষ আমেরিকান শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কাজেই রুজভেল্ট সযত্নে অগ্রসর হবেন, প্রাজ্ঞ সংবাদপত্র এই কথা বলছে। যাঁরা তাঁকে ভোট দিয়েছেন তাঁরা চান বিপ্লবহীন সামাজিক অরাজকতা বন্ধ হোক। যারা দেশ শাসন করে তারা বুঝছে যে, রুজভেল্ট যত সমর্থন অর্জন করবেন, তাঁর অবস্থাও ততই বিপজ্জনক হবে। আমাদের বলা হচ্ছে, রুজভেল্ট "বামপন্থীদের" দিকে ঝুঁকবেন না। "মহাকাব্যিক" পথে তিনি কোন আকস্মিক পরীক্ষা করতে চেষ্টা করবেন না। এবং যারা আমাদের একথা বলেছে, ঠিকই বলেছে।

রুজভেল্ট প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রকারীর অসহায়তার প্রতীক। বুদ্ধিমান, সাহসী ও উদ্যমী হয়েও তিনি সেই সব শক্তির হাতের পুতুল, যেগুলিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তাঁর বাসনা যা-ই হোক, তাঁর ইচ্ছাশক্তি যতই দৃঢ় হোক, রুজ্‌ভেল্ট বাস্তব অবস্থার নিয়ন্ত্রক নন। তিনি এমন কিছু লোকের

হাতে একটি যন্ত্র মাত্র যাদের তিনি সত্যিই হয়তো আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করেন।

ওয়েল্‌শ্‌ স্তালিনকেও একজন সরল, সাহসী, বিনয়ী ও বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে দেখেছেন। এখনকার মতো যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিমূর্ত ভাবে একজন মানুষকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব তাহলে বিমূর্ত ভাবে দেখলে স্তালিন হয়তো ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের চেয়ে বড় মাপের মানুষ নন। নেতা হিসাবে মানুষের কাছ থেকে তিনিও আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন, এমনকি রুজভেল্টের চেয়েও বেশী পরিমাণে। কিন্তু স্তালিনের কাছে এই আস্থা বিব্রতকর নয়। বরং, তাঁর কাজের জন্য এটি সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

রুজভেল্টের সঙ্গে স্তালিনের অমিল এখানেই যে, সোভিয়েত জনসাধারণ, যখন তাঁদের ভবিষ্যতের জন্যে, তাঁদের সমাজের পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা করেন, তখন স্তালিন তাঁদের নেতৃত্ব দিতে পারেন। কারণ, তাঁর এবং তাঁদের সেই 'ক্ষমতা' আছে। ধনতন্ত্রের অরাজক শক্তিগুলির প্রতি তাদের সম্মান জ্ঞাপন করতে হয় না। তাঁরাই তাঁদের দেশ এবং দেশের সম্পদের মালিক। এখানে "ব্রেন্‌স্‌ ট্রাস্ট"-এর কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে আছে কমিউনিস্ট পার্টি, সম্পত্তিহীনদের সেই মহান শ্রেণীর সংগঠন।

এর মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি? কমিউনিস্টরাও কি বুদ্ধিজীবীদের এক অভিজাত শ্রেণী নয়, অনেকটা সেই ওয়েল্‌শ-এর সামুরাই-এর মতো? সাদৃশ্য আছে ঠিকই কিন্তু সেটা যৎসামান্য। কমিউনিস্টরা কোন ট্রাস্ট নয়, বুদ্ধিবৃত্তির কোন একচেটিয়া কারবারী নয়। তাঁরা একটি শ্রেণীর অগ্রণী রক্ষী। তাঁদের মধ্যেই পাওয়া যাবে সব কিছু যা এই জগতটাকে পাল্টাবার ও নতুন সমাজ গড়বার জন্য সজীব, সক্রিয়, সচেতন এবং উৎসাহী। এ কোন অভিজাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আদর্শ নয়, ট্রাস্টের তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু একটি আক্ষরিক অর্থে কমিউনিস্টরা অভিজাত। নতুন জগতের যোদ্ধাদের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এঁরা তার সবই গ্রহণ করেছেন।

নতুন সমাজের "সুযোগ্য গ্রাহক" হবে সরকারী অসামরিক দপ্তর বা পার্লামেন্টারি প্রতিষ্ঠান সমূহ, এটা ওয়েল্‌শ কখনোই বিশ্বাস করেননি। বিশ্বাস না করে তিনি ঠিকই করেছেন। নতুন মানবতা সৃষ্টির সুযোগ কখনো মুষ্টিমেয় ক'জন ব্যুরোক্র্যাট পেতে পারে না। কিন্তু তাবলে সেটা মুষ্টিমেয় ক'জন "সংগঠনকারী"-রও কর্ম নয়। অগ্রণী রক্ষী হিসাবে কমিউনিস্টদের দায়িত্ব হল মানুষকে উজ্জীবিত করা, নেতৃত্ব দেওয়া, প্রত্যেকটি মানুষকে কিয়দংশে তাদের

সংগঠনকারী রূপে তৈরি করা। এই জন্যেই বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বলবার সময়, স্তালিন বলতে পেরেছিলেন, "আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবধর্মী, কারণ আমাদের পরিকল্পনা জীবন্ত মানুষ নিয়ে, আপনাদের এবং আমাকে নিয়ে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং আমাদের শ্রম নিয়ে, আমাদের নতুন পথে কাজ করবার আগ্রহ নিয়ে, পরিকল্পনা কার্যকর করার ইচ্ছা নিয়ে।"

রুজভেল্ট কখনো একথা বলতে পারেন না, কারণ তিনি বাস্তব অবস্থার নিয়ন্ত্রক নন, ক্রীতদাস। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্যাপটেন কিন্তু বলতে পারেন, "আপনাদের এবং আমাকে নিয়ে" পরিকল্পনা করার কথা এবং তিনি যা বলেন তার একটা সত্যিকার অর্থ আছে। ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রেষ্ঠ মানবিক প্রচেষ্টা, মানবিক ইচ্ছা এবং মানবিক শ্রমও কারারুদ্ধ ও পরাজিত এবং "আমাদের পরিকল্পনা" নিয়ে কোন কথাবার্তা মানেই বিদ্রুপ করা। 'বেলিশা বিকল্প' খাড়া করা বা মেট্রোপলিটান পুলিশের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য যদি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয় তো, ভাল কথা। কিন্তু তাবলে এক নতুন ব্রিটেনের জন্য পরিকল্পনা করা, যে-দেশে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা একত্রে সচেষ্ট হবেন নতুন সমাজ গঠনের জন্যে, যে-সমাজে আর শ্রমিক বা বুদ্ধিজীবী বলে কিছু থাকবেনা, থাকবে শুধু এক মহান প্রকল্পের সহযোগিরা, এটা একটা ইউটোপিয়াই থেকে যাবে যদি না ক্ষমতার কথা বিবেচনার মধ্যে ধরা হয়।

যাই হোক, এই আত্মজীবনী এ-কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি একটি মানুষের বিশ্বস্ত কাহিনী। যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে চলেছে যখন, এমন একটা সময়ে এই মানুষটি আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক ভাল ভাবে তাঁর নিজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তিনি যদি তাঁর নিজ শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, যেমন তিনি ব্যর্থ হয়েছেন নিজের সাহিত্যিক সমস্যা সমাধানে, তবে তার কারণ তাঁর সততা বা উদ্দেশ্যর অভাব নয়। এর কারণ হল তিনি যে পথে চলেছেন সে-পথ কোন সমাধানে পৌঁছে দিতে পারে না। তা বলে এর জন্যে তাঁর জীবনকে মূল্যহীন হয়ে পড়তে হবে না বা তাঁর মননশীলতাকে আকর্ষণ হারাতে হবে না। আমাদের এ-কালের সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে ওয়েল্‌শ মাথা উঁচু করে আছেন। তাঁর নিজের সাহিত্য জীবন একটা আত্মসমর্পণ হওয়া সত্ত্বেও বা আত্মসমর্পণ বলেই হয়তো তিনি এই স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর চিত্তাকর্ষক রচনা "ডাইগ্রেসান অ্যাবাউট্‌ নভেলস্‌"-এ তিনি স্পষ্ট স্বীকার করছেন, পূর্ণাঙ্গ মানব চরিত্র-অধ্যয়ন প্রাপ্তবয়স্কের কাজ,

দার্শনিক কাজ। প্রলম্বিত এবং বর্ধিত বয়ঃসন্ধিকাল, যে-সময়টায় জগতের সঙ্গে মানুষের সাধারণ ভাবে পরিচয় ঘটে, সেই সময়টা আমার জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। ফলে, চরিত্র পর্যবেক্ষণ করাটা মুখ্য ভূমিকা নিতে শুরু করে আমার জীবনের শেষ দিকে। আমাকে প্রথমেই সেই খাঁচাটা পুনর্গঠিত করে নিতে হয় যার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনগুলো পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজ করবে। তার আগে, তাদের এই খাঁচার মধ্যে নিয়ে আসার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির দিকে আমি মনোনিবেশ করতে পারিনি।"

এটা একটা খুবই সাহসী বিবৃতি। অবশ্য, উপন্যাস শেষ পর্যন্ত জীবনীর জন্য পথ ছেড়ে দেবে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। একজনের জীবনে যতই উপাদানের প্রাচুর্য থাকুক না, সত্যিই সদর্থে জীবন যাপন করেছে এমন একজন মানুষের পক্ষে বাস্তবতাকে সত্যানুগ ভাবে ব্যক্ত করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। এটা একটা বিস্ময়কর প্যারাডক্স (কূটাভাষ) এবং এই প্যারাডক্স থেকেই যাবে। সত্যকে পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করতে গেলেই জীবনী হয়ে দাঁড়ায় গল্প-কাহিনী। যাই হোক, ওয়েল্‌শ উপন্যাসকে ত্যাগ করে বাস্তবতার জন্য একটি কাঠামোর সন্ধান করে হাজারো বার ঠিক করেছেন। তাঁর চেয়ে শক্তিধর মানুষ হয়তো নিজেদের কালকে গদ্য সাহিত্যে অভিব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু এমন মানুষ খুবই বিরল যিনি সমকালীন বুদ্ধিজীবী-জীবনের ওপর দিয়ে ওয়েল্‌শ এর মতো স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। ওয়েল্‌শ এক মহান সাংবাদিক ও জনপ্রিয় রচনার স্রষ্টিকার, এক "এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট"। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর যতই দ্বিধা থাক তা সত্ত্বেও তিনি সেই অনাগতের আহ্বায়কদের একজন, যদিও তিনি যখন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তূর্যনিনাদ করেন, সেই স্বরে একটু ভীতির কাঁপন থাকে।

লেফট রিভিউ

ডিসেম্বর ১৯৩৪

আঁরি বারবুস্ স্মরণে

মাত্র ক' সপ্তাহ আগে প্যারিতে ওয়ার্ল্ড রাইটার্স কংগ্রেসের মঞ্চে আঁরি বারবুস্‌কে দেখেছি। প্রেরণাদায়ক অগ্রণী এক মানুষ। নতুন জগতের আদর্শের প্রতি নিজের নিষ্ঠার আগুনে নিজেই দীপ্যমান।

রোগা মলিন চেহারা, উন্নত শির। মুখের মধ্যে গালের ওপর সুস্পষ্ট অস্থি সংস্থান। কোটরাগত চোখদুটি প্রেরণাদায়ক। তাঁর জীর্ণ দেহের সঙ্গে চোখদুটি বেমানান। তাঁর চোখে কোন ক্লান্তি নেই। তাঁকে যে-ই দেখেছে, তাঁর চোখ দুটি তাদের প্রত্যেককে নাড়া দিয়েছে, আকর্ষণ করেছে।

জনাকীর্ণ সভাকক্ষে তিনি যখন বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ান, প্রত্যাশী শ্রোতারা বিপুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তাঁদের সেই হর্ষধ্বনি তাঁকে আবেষ্টন করে এবং ক্ষণেকের জন্য ভালবাসার উষ্ণতা তাঁকে কাঁপিয়ে দেয়।

মনে হয়, এই মানুষটি এবং জনগণ অভিন্ন সত্তা।

আঁরি বারবুস্ ফরাসী শ্রমিক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের কাছে অতি আদরের। কারণ তাঁদের আদর্শের প্রতি, সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের আদর্শের প্রতি, কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য অতি গভীর এবং অচঞ্চল।

এর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই, আরেকবার আমি তাঁকে দেখি এবং সেই শেষ বার। কিন্তু সেদিনটি হয়তো তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় দিন ছিল। তিনি একটি ট্যাক্সিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দীর্ঘ ন্যুব্জ দেহটি একটি বিশাল লাল পতাকার ভাঁজের মধ্যে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী প্যারিবাসীদের সম্মুখে। প্যারী, বিপ্লবের শহর, কিন্তু তবু এত বড় বিক্ষোভ প্রদর্শন এর আগে আর কখনো হয়নি।

সেদিন ছিল ১৪ই জুলাই। ১৭৮৯-র সেই মহান বিপ্লবের বর্ষপূর্তি উৎসবের দিন, যে বিপ্লব দুনিয়াটাকে দিয়েছিল বদলে। পিপল্‌স্ ফ্রন্ট মার্চ করে যাচ্ছিল, প্রায় পাঁচ লক্ষ নারী ও পুরুষ। ১৭৮৯-র বিপ্লব তাঁদের যে অধিকার প্রদান করছে—শ্রমজীবীর জন্য রুটি কাজ ও শান্তি এবং সভ্যতার দুশমন ফ্যাসিবাদী ডাকাতদের নিরস্ত্রীকরণ—এই মহান অধিকার রক্ষার জন্য তাঁরা ছিলেন বদ্ধপরিকর।

এই মহান জনপ্রিয় আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য আঁরি বারবুস্-এর চেয়ে বেশী প্রশংসা আর কারুর প্রাপ্য নয়। আজো অনুভব করা যাচ্ছে যে সারা দুনিয়ায় এই আন্দোলনের প্রভাব রয়ে গেছে। বারবুস্-ই সেই ব্যক্তি যিনি যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমস্টারডাম-প্লেয়েল আন্দোলনের সূত্রপাত করে ১৯৩৫-এর ১৪ই জুলাইকে সম্ভব করেছেন এবং পিপলস ফ্রণ্টের বিপুল সাফল্য তাঁর নিজেরও সাফল্য।

ঠিক এইভাবেই বারবুসকে সর্বদা স্মরণ করা উচিত—ফ্রান্সের অতুলনীয় শ্রমিকদের ভালবাসার আঁচ নিয়ে, তাঁদেরই মতো বিপ্লবী বহ্নিতে উদ্দীপ্ত হয়ে। কিন্তু যে ভয়ঙ্কর এবং কঠিন সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে সে কথা তাঁর ওই শীর্ণ ও ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে কেউই বিস্মৃত হতে পারবে না। ১৮৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করে আঁরি বারবুস্ যুদ্ধপূর্ব যুগের ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মতোই বিকাশ লাভ করেছিলেন। এই বুদ্ধিজীবীদের মতোই তিনি হতাশায় ও নান্দনিক নৈরাশ্যে ভুগতেন।

তিনি তখন কবি এবং ঔপন্যাসিক, একটি কেতাদুরস্ত পত্রিকার তরুণ সাহিত্য সম্পাদক। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর না ছিল সংযোগ, না ছিল জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি। শুধু ছিল বিয়োগাত্মক মানব জীবন সম্পর্কে গভীর আন্তরিকতা ও অনুভব।

লেনিনের ভাষায়, তিনি ছিলেন তখন একেবারেই অজ্ঞ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি শান্তিপ্রিয় বিনয়ী আইন-মান্যকারী সদস্য।

একটি অপরাধ বারবুসকে পাল্টে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অপরাধ। এবারো লেনিনের ভাষায় বলা যায়, তিনি এরপর একজন অসামান্য দৃঢ়চেতা, মননশীল সৎ চরিত্রের লেখকে পরিণত হন।

তাঁর লেখা Le Feu (আণ্ডার ফায়ার) বইটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ এবং এমনই এক প্রতিবাদ যে বইটি পড়লে বোঝা যায় যে এর রচয়িতা ট্রেঞ্চের নরকে বসে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত দেখেছেন।

Le Feu-এ একটা সতর্ক ভাব, তখনো অবধি কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকলেও এই উপন্যাস কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে ও সন্দেহাতীতভাবে এই শিক্ষাটা খুব ভাল ভাবেই দেয় যে, যুদ্ধের অপরাধ স্খালন করতে হলে দেশে দেশে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ চালাতে হবে। এই অপরাধীরাই তো জনসাধারণকে বধ্যভূমিতে ঠেলে দিয়েছে। ১৯১৭ সালে, যুদ্ধরত একজন সৈনিক, একজন অফিসারের পক্ষে এই বই লেখা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাহসিকতার এক উল্লেখ-

যোগ্য নিদর্শন। লেনিন সর্বদাই জোর দিয়ে বলতেন যে পশ্চিমী দুনিয়ার জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা বৃদ্ধির সবচেয়ে আকর্ষণীয় লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে বারবুসের লেখা। 'আণ্ডার ফায়ার' এবং তার পরবর্তী খণ্ড 'লাইট'।

বারবুস্ এর পর থেকে শুধু একটি পথের কথাই জানতেন, কমিউনিজমের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের পথের কথা। যুদ্ধে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল, ব্যক্তিগত জীবনে আদপেই সুখী ছিলেন না, তবু এই মানুষটি নিজেকে এবং তাঁর মেধাকে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

তাঁর মহান উপন্যাস, 'চেন্‌স' পুরোপুরি সফল না হলেও, যুগ যুগ ধরে মানুষ কিভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে তা উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছে। একাধারে নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর মহান ভালবাসার এবং শোষণকারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণার স্বাক্ষ্য বহন করছে তাঁর লেখা এই উপন্যাসটি এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের নিপীড়নকারীদের প্রতি ঘৃণাভরা জ্বলন্ত কাহিনীগুলি (Les Bourreaux, Faits Divers)।

ফ্রান্সে তিনিই প্রথম মহান লেখক জোলাকে তাঁর পুরনো আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবীরা জোলাকে এই আসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তাছাড়া প্রথমে Clarte ও তারপরে Monde-র সম্পাদক হিসাবে বারবুস ফরাসী বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি জোরালো বামপন্থী ধারা গড়ে তোলেন।

বারবুসের শেষ বইটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হবে। এটি স্তালিনের জীবনী—বিশ্বের শ্রমিকদের নেতার প্রতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সফলভাবে মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য এক মহান লেখকের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মৃত্যুর আগে তিনি লেনিনের পত্রাবলীর এক সটীক সংস্করণ নিয়ে এবং একটি মহৎ উপন্যাস নিয়ে কাজ করছিলেন। মানবিক সম্পর্কাবলীতে এখন যে পরিবর্তনগুলি আসছে সেটাই দেখাবার কথা ছিল এই উপন্যাসে।

বারবুসের নাম সারা পৃথিবীর লোক জানতো। তাঁর লেখা অনূদিত হয়নি এমন কোন ভাষা নেই বললেই চলে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা কোনদিন তাঁকে দেখেননি, যাঁরা জানতেন না তিনি কোন দেশের মানুষ, তাঁদের কাছেও কিন্তু বারবুস্ ছিলেন সভ্যতার ক্ষুব্ধ বিবেকের প্রতীক, মূলধনের দানব ও তাদের গোলামদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

বারবুস্ এমন একজন মানুষ যিনি এক তিক্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকার সময়

স্বয়ং নিজেকে পুনর্গঠিত করেছেন। পুনর্গঠিত করেছেন যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর হতে পারেন। এই লক্ষ লক্ষ মানুষই নতুন মুক্ত সমাজের জন্য যুদ্ধরত, যে-সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতা, মানবিক সম্পর্ক কলুষিতকারী ধনতন্ত্র চিরতরে নির্বাসিত হবে।

বারবুসের মহান সৃষ্টি 'আণ্ডার ফায়ার 'বইটি শত্রুর মুখে একটি গুলির মতো এবং এই গুলি নিক্ষেপ করেছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি তখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতেন। সেই বারবুস্ যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন। সংগ্রাম তাঁকে শীর্ণ করেছিল কিন্তু ততদিনে তিনি বিজয় যাত্রায় অগ্রসর অসংখ্য সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর প্রিয়তম নেতাদের অন্যতম রূপে স্বীকৃত।

আরেক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্ণে অভিনন্দন ও বিদায় সম্বর্ধনা জানাই আঁরি বারবুস্‌কে, বিপ্লবের নায়ককে।

ডেইলি ওয়ার্কার

৩১শে আগস্ট, ১৯৩৫

সাহিত্য ও রাজনীতি

(লণ্ডনের কন্‌ওয়ে হলে ম্যাক্সিম গোর্কির স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণ, জুন, ১৯৩৬)

আমার ধারণা, আমরা সকলেই এ বিষয়ে নিশ্চয় একমত হব যে, গোর্কি ছিলেন আমাদের কালের মহান চিন্তাশীল লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়ে গেল, সেই হৃদয় বিদারক অনুভূতি শুধু তাঁর নিজের দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দূর দূরান্তরের মানুষও সেই ক্ষতির কথা অনুভব করেছেন। গোর্কি ছিলেন এমনই এক সাহসী মানুষ, তাঁর সরলতা ছিল এতই গভীর আর সততা এতই তীব্র যে, শুধু তাঁর নিজের দেশেরই নয় সারা দুনিয়া জুড়ে সমস্ত দেশের শত সহস্র মানুষ তাঁকে ভালবাসে কারণ তাঁরা আজ যে-লড়াই চালাচ্ছেন, গোর্কিও মানবতার সপক্ষে সেই একই লড়াই করেছেন।

কয়েক মাসের মধ্যে আমরা ইংল্যাণ্ডে তিন চার জন লেখককে হারিয়েছি। তাঁদের মধ্যে হয়তো এক জন কি দু' জন, 'মহান' ইংরেজ লেখক। তাঁদের সম্মানার্থে কোন সভা ডাকা হয়নি কিন্তু আজ রাতে আমরা এমন একটি মানুষকে সম্মান জানাচ্ছি যিনি জন্মসূত্রে আমাদের কাছে বিদেশী। তিনি যে তাঁর নিজের দেশের বাইরেও এ ভালবাসা পেয়েছেন তার কারণ, পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডের শোষিত জনগণের দুঃখ যন্ত্রণা আশা এবং জয়ী হবার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে আন্তরিক ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এমন মানুষ খুবই বিরল যিনি গোর্কির মতো স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেয়েছেন যে মানুষের নীচতার শিকড়টি খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের সভ্যতার সম্পত্তি-কাঠামোর মধ্যে।

সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসের উদ্বোধন করার সময় জনসমক্ষে গোর্কি যে ভাষণটি দেন, সেইটিই তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। সে প্রসঙ্গ আজ রাতে মিস্টার হার্বার্ট গ্রিফিথস ও মিস্টার র‍্যালফ্‌ বেট্‌স্‌ উল্লেখ করেছেন। গোর্কি সেই ভাষণে বলেন, "ধ্বংসদণ্ডের আদেশ জারী হয়ে গেছে এমন এক পৃথিবীতে আমরা বিচারক হয়ে এসেছি। আমরা এসেছি সাচ্চা মানবতাবাদকে সমর্থন করতে। এই মানবতাবাদ বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ এমনই মানুষদের মানবতাবাদ, যারা ঈর্ষা, লোভ এবং শ্রমজীবী চরিত্র বিকৃতকারী শতাব্দী-প্রাচীন দোষগুলি থেকে মেহনতী মানুষের দুনিয়াকে মুক্ত করার জন্য ইতিহাসের আহ্বান পেয়েছে।

"আমরা হচ্ছি সম্পত্তির শত্রু, ধনতান্ত্রিক জগতের সেই নীচ ও ভয়ঙ্কর দেবীর শত্রু। আমরা হচ্ছি সর্বপ্রকার পশুসুলভ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের শত্রু, আর এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই হল ওই দেবীর ঘোষিত ধর্ম।"

আজ আমাদের মনে হচ্ছে গোর্কির জীবন মহান এবং তাৎপর্যময়, কেননা সেই দেবীকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে গোর্কির জীবন জড়িত ছিল। খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিল গোর্কির জীবন রাশিয়ার মেহনতী মানুষের অতীতের সঙ্গে। সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়, সেই সময়েই শ্রমিক শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীনতাকামীরূপে। এবং উৎপাদনের উপকরণ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বর্জন করার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এক নতুন সমাজ যে সমাজ এক শ্রেণীহীন সমাজ। এই সেই প্রথম সমাজ যেখানে মানুষ মানুষ হিসাবে পূর্ণ মূল্য পাবে।

রাশিয়ার তিনটি বিপ্লবের সঙ্গেই গোর্কির জীবন জড়িত ছিল—১৯০৫ সালে, ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে। আজ রাতে অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, গোর্কি ছিলেন লেনিন ও স্তালিনের একজন খাঁটি ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁদের মতো গোর্কিকেও কারাবাস ও নির্বাসন ভোগ করতে হয়েছে। জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন বলশেভিকদের সমর্থক। গোর্কি নিজে ছিলেন কখনো ভবঘুরে, কখনো কারখানার শ্রমিক বা রেলশ্রমিক। শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে তিনি অংশভাগী ছিলেন। নৈরাজ্যর মধ্যে দিয়ে জীবনের একটা পর্ব অতিক্রম করার পর, বলশেভিকদের ও লেনিনের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সেই দৃঢ়তা, সারল্য এবং অজেয় বিশ্বাস, যা জারের সাম্রাজ্যকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল। লেনিনের স্মৃতি কথা নিয়ে লেখা বইটিতে গোর্কি এই সব গুণাবলী সঙ্কলিত করেছেন ও তার বর্ণনা দিয়েছেন। গোর্কি সব সময়েই অনুভব করতেন যে, এই গুণাবলীই একদিন রুশ দেশের চেহারা পাল্টে দেবে।

একটি সমস্যা নিয়ে আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। রুশ সমাজের অন্তর্দেশ থেকে যে-গোর্কি উঠে এসেছিলেন, তিনি কিভাবে রাতারাতি রুশ সাহিত্য জগতে এত খ্যাতি লাভ করলেন? আমার মনে হয়, তৎকালীন রুশ সমাজ ও সাহিত্যের দিকে ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টি ফেরালেই এর কারণটা আপনারা বুঝতে পারবেন। সে সময়ে রাশিয়ার মহত্তম লেখক চেকভ। তিনি এসেছিলেন আশির দশকের ভয়ঙ্কর নিরাশার মধ্যে থেকে। তখন বুদ্ধিজীবীদের আর কোন ভবিষ্যত নেই বলে মনে হত। মনে হত, রুশ সমাজের সেরা শক্তিগুলি বুঝি

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরর্থক এক সংগ্রামে নিঃশেষ হয়ে গেছে। চেকভের সমস্ত রচনাই এই অনুভূতিসিক্ত। গোর্কি যখন খ্যাতিলাভ করেছিলেন তলস্তয় তার মধ্যেই পূর্ণ খৃষ্টীয় নেতিবাদের পথ গ্রহণ করেছেন। গোর্কি এই নিরাশার মধ্যে কিছু একটা সজীবতা আনেন এবং তাবৎ রুশ জনগণের কাছে পৌছে দেন আশার এক নতুন বার্তা। এই কারণেই, রুশ দেশের জনজীবনের মধ্যে এক নতুন শক্তি হিসেবে অভ্যুদয়ের জন্য, তাঁর খ্যাতি রাতারাতি সারা রুশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর পুরো রচনাশৈলীর মধ্যেই এই কথা অনুভব করা যায়।

কারিগরী অর্থে লেখক হিসেবে গোর্কিকে নিয়ে কেউ কোন কথা বলেননি। তাঁর লেখা ইংরাজী অনুবাদকদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু রুশ লেখক হিসাবে গোর্কি অত্যন্ত শক্তিধর। তাঁর এই শক্তি এসেছে সরাসরি জনসাধারণের কাছ থেকে, যাঁদের মধ্যে তিনি বাস করতেন। তিনি সব সময়ই জোর দিয়ে বলেছেন যে ভাষার সবচেয়ে মূল্যবান কোষাগার খুঁজে পাওয়া যাবে সাধারণ মানুষের কথার মধ্যে, জনসাধারণের লোকগাথা এবং কাহিনীর মধ্যে। এখানেই পাওয়া যাবে ভাষা ও সাহিত্যের মহত্তম সম্পদ।) তাঁর সমস্ত রচনাই তার প্রমাণ।

গোর্কি যেমন দ্রুত খ্যাতি লাভ করেন এবং রুশ সাম্রাজ্যের 'অ্যাকাডেমি অফ লেটার্স'-এর সদস্য নির্বাচিত হন, ঠিক তেমনি দ্রুত তাঁর নামটি অপসারিত হয় স্বয়ং জারের ব্যক্তিগত নির্দেশে। এই অসম্মানজনক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ, দু'জন শ্রেষ্ঠ রুশ লেখক চেকভ ও কোরোলেঙ্কো অ্যাকাডেমির সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন—এর জন্য চিরদিন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। কিন্তু এর থেকে আমাদের শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহিত্য জগতের কী দুরবস্থার চিত্রই না পাওয়া যায়! রুশ সাহিত্যের তিনজন মহত্তম প্রতিনিধিকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হল (তার মধ্যে একজন তো বহিষ্কৃত), তলস্তয়কে প্রায় একই সময়ে অর্থডক্স চার্চ থেকে সমাজচ্যুত হতে হল এবং রুশ সাম্রাজ্যের যেখানে যত উপাসনার স্থান ছিল সর্বত্র তলস্তয়কে অভিসম্পাত দেওয়া হল। গোর্কি কিন্তু রাশিয়ার লেখকদের দেখালেন যে স্বৈরতন্ত্র যদি পাশবিক ও হিংস্রও হয়, তবু সেই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বার পথ ও উপায় আছে। তিনি দেখালেন, ১৯০৫-এর সেই ভয়ঙ্কর পরাজয়ের পরও নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। এই অধ্যায়ের পর গোর্কি প্রবাসী হন। বেশ কয়েক বছর তিনি বিদেশে কাটান। কিন্তু যতদিন তিনি বিদেশে ছিলেন, তা সে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রই হক বা অন্য কোন দেশে, সর্বদাই তিনি সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য কাজ করেছেন। তিনি যখন ক্যাপ্রিতে বাস করছিলেন তখনও স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য ও রুশ বিপ্লবের আগমনের জন্য তিনি তাঁর লড়াই চালিয়ে যান।

আপনাদের মনে পড়বে, তিনি ক্যাপ্রিতে একটি স্কুল খুলেছিলেন বিপ্লবী শ্রমিকদের শিক্ষা দেবার জন্যে। গত সপ্তাহের শেষে লণ্ডনে লেখকদের যে সভা ডাকা হয়েছিল সেখানে এইচ. জি ওয়েল্‌শ তাঁর ভাষণে এমন কতকগুলো কথা বলেন যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক টুলি স্ট্রীটের সেই তিন জন দর্জির প্রতি খুব একটা প্রশংসাসূচক নয়। তাঁর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন ইলিয়া এরেনবুর্গ। এরেনবুর্গ উল্লেখ করেন যে, গোর্কি একসময় একজন ধাতু-শিল্পী, একজন দর্জি ও একজন ছুতোরকে সংগ্রহ করে ছিলেন এবং এই কাজটা তাঁর পক্ষে বেমানান বিবেচনা করেননি। গোর্কি বিশ্বাস করতেন রুশ সাম্রাজ্যকে উৎখাত করা অসম্ভব নয়, আর সে-সময় রুশ সাম্রাজ্য ঠিক ততটাই শক্তিশালী বলে মনে হত যেমন এখন মনে হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে।

স্কুল চালানো ছাড়াও গোর্কি এই সময়ে অন্যান্য কাজও করেছেন। সক্রিয় বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। গোর্কির সঙ্গে লেনিনের যে সব পত্র বিনিময় হয় তার মধ্যে এমন অনেক চিঠি আছে যাতে শুধু দর্শনের প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা হয়নি, রাশিয়ায় কাগজপত্র চোরাই-চালানের ব্যাপারে গোর্কি কি ভাবে বলশেভিকদের সাহায্য করতে পারেন, এই ধরনের কাজের প্রশ্নও আছে। গোর্কি 'ইতালিয়ান' সীমেন্স ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন ওডেসায় বলশেভিক সাহিত্য প্রেরণ করার জন্যে।

আজকের 'স্পেকটেটর'-এ গোর্কির রচনায় সম্বন্ধে ই. এইচ. কার্‌'-এর একটি বিজ্ঞপ্তি পড়লাম। এই বিজ্ঞপ্তির এক জায়গায় কার্‌ বলেছেন, ক্যাপ্রিতে বাস করার সময় গোর্কি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, রাজনৈতিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেন এবং সেই সব লেখার নামগুলো পর্যন্ত আজ আর কারুর মনে নেই। এই শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে আপনারা যারা শ্রমিক, তাঁদের বলছি—আপনারা কি 'মা'র নাম ভুলে গেছেন? রাশিয়ার বাইরেও এমন অনেক মানুষ আছেন, রাজনীতিতে যাঁদের হাতেখড়ি হয়েছে 'মা' পড়ার মধ্যে দিয়ে। এই বইটির আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। এই বইটি আরেকটি মহান শিল্পকর্ম, 'মাদার' নামে চলচ্চিত্রটির জন্মদাতা।

রাজনীতির এই প্রশ্নকে গোর্কির নামের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মঙ্গল-

বারের 'টাইম্‌স্'-এর প্রধান আকর্ষণ হিসাবে ব্রিটিশ লেখকদের প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ ছিল। 'টাইম্‌স্' সবসময়ে আমাদের সম্মান দেয় না। এখানকার এই নিবন্ধটি ছিল বিশেষ এক শ্রেণীর ব্রিটিশ লেখকদের প্রতি ধমক। কারণ এই লেখকরা নাকি রুচিহীনতার পরিচয় দিয়ে একটি স্থূল রসিকতা করেছেন। তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে 'অথরস্' সোসাইটিকে যোগ দেবার প্রস্তাব করেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ প্রস্তাবটি পরে হারিয়ে যায়। কিন্তু এমন প্রস্তাবের অর্থ কি? আজকের দিনের বেশ কিছু ব্রিটিশ লেখকই মনে করেন, লেখক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা যদি আরো নিবিড় না হয় তাহলে ইংরাজী সাহিত্যের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাঁরা মনে করেন বর্তমানে বৃটিশ সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করার এটাই হল শ্রেষ্ঠ পন্থা। তাঁরা মনে করেন এটাই হল ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় আশা। এদিকে 'টাইম্‌স্' আবার এই সপ্তাহে সাহিত্যকে নিয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার 'টাইম্‌স'-এর পাতায় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি মত ছাপা হয়েছে। এই মতের প্রবক্তা মিস্টার চার্লস মর্গ্যান, যিনি 'টাইম্‌স'-এর সঙ্গে জড়িত আছেন। মিস্টার মর্গ্যান সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন, আমাদের বর্তমান সমাজের পুরো কাঠামোটাই এমন হওয়া উচিত যাতে লেখককে পুরোপুরি রক্ষা করা যায় এবং লেখক যাতে আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার কোনরকম সুযোগ না পায়। মিস্টার এভলিন ওয়াকে তিনি একটি পুরস্কার প্রদান করবার সময় বলেছিলেন, "তিনি দেখেছেন এইসব পুরস্কারকে উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু হথর্ণডেন-এর সম্বন্ধে বিদ্রূপের কারণটা চিরকালই সেই একই থেকে গেছে। অভিযোগটা হল এই যে, এ ব্যাপারটা কোন সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক মহল থেকে সংগঠিত করা হয় না। আজকাল অনেকে যেরকম আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন সেই রকম তারাও যদি বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্যকে রাজনীতির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে না পারলে সেটা শুধু সময়েরই অপচয় হয়, তাহলে তাঁরাও অতি অবশ্য হথর্নডন কমিটিকে সমর্থন জানাতেন না। কিন্তু আজ একথা সত্যিই বলা যায় যে, ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সেই চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কাজেই বছরে এই যে একবার করে তাঁদের ডাক পড়ে: একটি ভাল বইকে নির্বাচিত করা হয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য, এটা তাঁর মতে একটা ভাল কাজ। কারণ বইটি বাছাই করার সময় শুধু দেখা হয় বই হিসাবে তার মূল্য কতখানি। সেই বই কোন প্রকৃত বা আকাঙ্ক্ষিত একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম করতে লেখা কিনা, সেটা কিন্তু বিবেচ্য নয়। এমন বইও নির্বাচিত হয়, যার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে,

এমন কি কমিটির কিছু কিছু সদস্যের সঙ্গে তিনিও রাজনৈতিক দিক থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাইতো হওয়া উচিত।"

সম্ভবত অজ্ঞতার কারণেই মিস্টার চার্লস মর্গ্যান এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। এই তথ্যটি আদপেই তাঁর নজরে পড়েনি যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাহিত্য রাজনীতিধর্মী, স্পষ্টতঃ এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই রাজনীতিধর্মী! একটা দেশের ইতিহাসের দিকেই দেখুন না, তুর্কীর ইতিহাসটা দেখুন। সত্তর দশকের প্রথম দিক অবধি তুর্কীতে চমকপ্রদ সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মহত্তম তুর্কী কবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি নাটক লিখেছিলেন যাতে পঠন ও লিখনে অক্ষম তুর্কী জনগণের কাছে দেশের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তার কথা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই নাটকটি তুর্কী জীবনে সম্পূর্ণ নতুন শিল্পের একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। বহু দেশেই বার বার এই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। আমাদের দেশে উপন্যাস শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন এমন একজন যিনি তাঁর সমস্ত কাজেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তাঁর নাম ডিফো, এবং তাঁর সর্বাধিক পরিচিত রচনা 'রবিনসন ক্রুশো।' অষ্টাদশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বস্তুতপক্ষে এই লেখাটিকে রাজনৈতিক অর্থনীতির (political economy) একটি গবেষণাপত্র (thesis) হিসাবে ব্যবহার করেছে।

আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হল, আজকাল এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রথম যে পথটি দেখিয়েছিলেন, সেই পথ গ্রহণ করা ভিন্ন তাঁদের আর কোন আশা নেই। তাতে করে দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও রক্ষা করা যাবে এবং নতুন ও মহত্তর একটি দেশ গড়ে তোলার সংগ্রামও চালানো যাবে। আমরা এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক পেয়েছি যাঁদের উদ্ভব শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। যেমন, এইচ জি ওয়েল্‌শ, মিডল্‌টন্‌ মারি এবং ডি এইচ লরেন্স। এঁরা তিনজনই এসেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর পরিবার থেকে কিন্তু তিন জনই নিজেদের শ্রেণী ত্যাগ করেছেন। এরাঁ তিনজনেই চেষ্টা করেছেন 'সমাজ'-এ প্রবেশ করার জন্য পথ তৈরি করে নিতে। আমাদের দেশে বর্তমানে এটা একমাত্র আপোষের দ্বারাই সম্ভব এবং তার জন্যে প্রয়োজন, সংস্কৃতির যারা বেসাতি করে, যারা বিশ্বাস করে তারাই আমাদের বুদ্ধিজীবী জীবনের একচেটিয়া অধিকারী, সেই অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়ের হাতে নিজেদের সমর্পণ করা। এই তিনজনের আত্মজীবনী পড়লেই দেখা যায় এরা কি সাংঘাতিক ভাবে যুঝে গেছে দারিদ্র্য ও উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে এবং এও

দেখা যায় কিরকম দুঃখজনক ভাবে সবার ক্ষেত্রেই উন্নাসিকতাই জয়ী হয়েছে। এই ঘটনার মধ্যেই বিগত দুই পুরুষের বুদ্ধিজীবী জীবনের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। দেখা যায় কিভাবে শাসক শ্রেণী দেশের সাংস্কৃতিক জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমি মনে করি এটা খুবই শুভ এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে নবীন লেখকরা সেই পথ বাতিল করে দিচ্ছেন, যে-পথ নিয়েছিলেন ওয়েল্‌শ্‌, লরেন্স ও মিডল্‌টন্‌ মারি। নবীন লেখকরা এই অধঃপতিত সামাজিক চক্রকে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী জীবনের ওপর একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করতে দিতে রাজী নন।

সমালোচকরা বলেন রাজনীতিই গোর্কির সর্বনাশ করেছে। তাঁরা বলেন, ১৯১৭-র পরে তিনি কি করেছেন দেখুন। তার মানে তাঁরা বলতে চান, তিনি সৃজনশীল কিছু করেন নি। যে কোন ইউরোপীয় লেখকের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ১৯১৭-র পর থেকে গোর্কির সৃজনশীল রচনা, পরিমাণে ও গুণে উভয় দিক দিয়েই উন্নততর। সামাজিক কাজ হিসাবে তিনি যা করেছেন, তা তাঁর ইতিপূর্বেই অমরতা প্রাপ্ত-নামটিকে আরো বড় সম্মানে ভূষিত করেছে। তাঁর অন্য কোন কাজ তাঁকে এরকম সম্মান দিতে পারেনি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পর যে-নতুন সংস্কৃতির উদয় অবধারিত, তারই পথ প্রশস্ত করেছিলেন তিনি। তাঁর সামাজিক কাজ শুধুমাত্র রক্ষণশীল ছিল না, ছিল মূলতঃ সৃজনশীল। আবার বলি, ১৯২৮-এ সোভিয়েত ইউনিয়নে চিরকালের মতো ফিরে আসার পর তিনি যে কাজ করেছেন, সমগ্র রুশ সাহিত্যকে পুনর্গঠিত করার জন্য ও তাবৎ সোভিয়েত লেখকদের নিয়ে ইউনিয়ন অফ রাইটার্স সৃষ্টি করার জন্য যে প্রচণ্ড দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর এই অবদানের জন্য দেশের প্রতিটি লেখক সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁকে চিরকাল স্মরণে রাখবে।

"হোয়াইট সী ক্যানাল" নামে সমষ্টিগত রচনা প্রকল্পের রূপদাতা হিসাবে গোর্কির সৃজনশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন র‍্যাল্‌ফ্‌ বেট্‌স। কিন্তু এই বইটি আবার গোর্কির অনুপ্রেরণায় গৃহীত বিশাল এক রচনা সম্ভারের একটি খণ্ড মাত্র। এই রচনা হবে সমস্ত কলকারখানা ও উদ্যোগের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহৎ সব খামারের ইতিহাস। এই রচনা সমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ব্যক্ত করবে। এটি কোন মহান সাহিত্য কর্ম হতে যাচ্ছে না, এটি হবে সমাজতন্ত্র গঠনের ইতিহাস। এই প্রথম এরকম সমষ্টিগতভাবে একটি ইতিহাস প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে দেশের সেরা সৃজনশীল শক্তিগুলিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে সহযোগিতা করার জন্য। এই বিপুল কাজের জন্য প্রশংসাটা গোর্কিরই প্রাপ্য। তাছাড়া গোর্কিই প্রথম প্রস্তাব

দেন এবং ব্যবস্থা করেন যাতে গৃহযুদ্ধের ও রুশ বিপ্লবের বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস রচনা করা যায়। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এর বেশ কিছু পরিচ্ছেদ লেখার কাজে গোর্কি ও স্তালিন সহযোগিতা করেছিলেন।

শেষ করার আগে, গোর্কির মৃত্যুর পর দু'ধরনের প্রতিক্রিয়ার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। প্রথম প্রতিক্রিয়া হল জর্জ বার্নার্ড শ'র। সোভিয়েত সরকারের কাছে শ' যে বাণী পাঠিয়েছেন সেটি হতাশার ও পরাজয়ের। শ' বলেছেন, তাঁর মনে হচ্ছে যে পুরনো লোকেরা সবাই একে একে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের আর বেঁচে থাকার তেমন কোন উপযোগিতা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের অতীতকালের মহান নামগুলি নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ কি? তাঁদের তো ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করার ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হলে তো অতীতের কথা চিন্তা না-করলে চলবে না। তাছাড়া গোর্কির অতীত হল সেই শ্রমিক শ্রেণীর অতীত, যাঁদের জন্যে বিপ্লব সফল হয়েছে। এই কথা অনুভব করার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মানুষটিকে অত ভালোবাসতো আর সেই জন্যই এই মানুষটির জন্য তারা আজ শোকাকুল।

গোর্কির মৃত্যুর পর আমি দ্বিতীয় যে-প্রতিক্রিয়াটি দেখেছি সেটি ভিন্ন ধরনের। এই প্রতিক্রিয়া লণ্ডনের এক শ্রমিক মেয়ের। কারখানার কর্মী এই মেয়েটি গোর্কির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিবরণ পড়েছিল খবরের কাগজে। মেয়েটি বলেছিল, "যিনি এত লোকের ভালবাসা পেয়েছেন, তাঁর এই মৃত্যু খুব দুঃখের ব্যাপার।" এই কথাক'টির মধ্যে এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছে যা অতি সত্যি। "জনসাধারণ যাঁকে এত ভালবাসেন তাঁর পক্ষে মৃত্যুবরণ করাটা দুঃখজনক। একটি মানুষ যার জন্য সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, সেগুলি যখন জন্ম নিচ্ছে, সেই জন্মলাভ দেখার জন্যই তাঁর বেঁচে থাকা উচিত। কারণ, যে-মানুষজনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সেই মানুষরা সারাক্ষণই যে তাঁরই জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করছে।"

তাছাড়া আরেকটি কথাও মনে রাখা দরকার। গোর্কিকে আজ যে ভালবাসা দেখানো হয়েছে, সেই ভালবাসাই ভবিষ্যতের সোভিয়েত ইউনিয়নে উর্বর হয়ে উঠবে, সেই ভালবাসাই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্যে, মানবাত্মার সেরা ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য আরো অনেক এবং আরো মহান সব ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম দেবে।

হেনরি ফিল্ডিং—গদ্য-যুগের প্রতিভা

হেনরি ফিল্ডিং "টম্ জোনস্"-এর রচয়িতা। থ্যাকারে বলেছেন, "এই শেষ বই যেখানে একজন ইংরাজ ঔপন্যাসিককে মানুষের ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছে।" ব্রিটিশ সাহিত্যের গদ্য-যুগের সেরা প্রতিভাধরের আসনটি সুইফট-এর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে দাবী করতে পারেন হেনরি ফিল্ডিং।

ইংরেজ ধনতান্ত্রিক শ্রেণী যে-সময়ে বিকাশ লাভ করছিল তদানীন্তন কালের সংস্কৃতি ব্যক্ত হয়েছে মার্লো শেক্সপীয়র ও মিলটনের কাব্যে।

আরো ক্ষমতা লাভ করার জন্য এবং সম্প্রসারণের জন্য লড়াইয়ে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী কোন্ পথ গ্রহণ করবে সেটা যখন শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত করে দিল সপ্তদশ শতাব্দীর মহান বিপ্লব এবং শতাব্দীর শেষ ভাগে বুর্জোয়া ও অভিজাতদের মধ্যে যখন প্রেমহীন বিবাহ নিষ্পন্ন হয়ে গেল, তারপর আসলো গদ্যের যুগ।

এই যুগটির ওপরই আধিপত্য বিস্তার করেছেন সুফইট্ ও ফিল্ডিং। এঁরা দু'জনেই ছিলেন প্রতিভাধর এবং দু'জনেই অদ্ভুত অনিয়মিত জীবন যাপন করেছেন। অবশ্য তাঁরা দু'জনেই নবগঠিত রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একজন ছিলেন গীর্জার উচ্চ পদাসীন কর্তা, আরেকজন বো স্ট্রীটের এক ম্যাজিস্ট্রেট।

এঁরা দু'জনেই সমসাময়িক জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই জীবনকে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে সামাজিক পদ্ধতির নোংরামি ও ভয়াবহতা ধরা পড়েছিল।

ফিল্ডিং অবশ্য নতুন মানুষদের দিক থেকে সুইফটের মতো ঘৃণাভরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেননি। নিজের ভুল ভ্রান্তি ও অতি মানবতাবাদ সত্ত্বেও তিনি তাঁর চারটি উপন্যাসের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন এক অপূর্ব কল্পনার জগৎ। এই চারটি উপন্যাস শুধু তাঁর নিজের কালের সর্বোত্তম চিত্রই নয়, এ হল মানুষ নামে ইতিহাসের সেই প্রাণীর সর্বোত্তম চিত্র।

ফিল্ডিং স্বয়ং তাঁর রচনায় এই ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর জোর দিতে ভালবাসতেন। মানুষকে তিনি অতীতের, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের এমন এক জীবন্ত-প্রাণী রূপে দেখেছেন যাদের একটা ইতিহাস আছে।

তিনি বারবার বলেছেন, তাঁর শিল্প হল মহাকাব্য এবং তাঁর "টম জোনস" সত্যিই প্রথম আধুনিক মহাকাব্য। "টম জোনস" লিখে উপন্যাসকে তিনি এক

গৌরব শিখরে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পর উনবিংশ শতাব্দীর মহান রুশ লেখকরা ছাড়া আর কেউ সে উচ্চতায় পৌছতে পারেন নি।

এক অভিজাত পরিবারে ফিল্ডিঙের জন্ম হয়েছিল (তাঁর বাবা ছিলেন মার্লবরোর একজন জেনারেল এবং এই পরিবার হ্যাপসবুর্গ পরিবার থেকে তাদের উদ্ভবের কথা দাবী করে) কিন্তু তিনি ছিলেন দরিদ্র। শুধু কলমের ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্য। তরুণ বয়সে ও প্রথম যৌবনে তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার প্রথমদিকের লণ্ডনের এক বিচিত্র বোহেমিয়ান জগতের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে।

সমস্ত মহান ইংরেজ লেখকদের মতো তিনিও ছিলেন রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং কাজের মানুষ। দারিদ্র্যের অবসান ঘটার পর প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পদটি পেয়ে যান। তখন থেকেই তিনি আইন-ব্যবস্থার ভয়াবহ অপব্যবহার ও বিচার যন্ত্রের অযোগ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন।

ফিল্ডিঙের জীবনটা কর্মব্যস্ত ছিল বলেই তিনি নর নারী সম্বন্ধে ওই রকম জ্ঞানার্জন করতে পেরেছেন। এই জন্যেই তাঁর মধ্যে বিশ্বজনীন এক আয়রনি-র (ব্যজস্তুতি) বোধ জাগ্রত হয় এবং ইংল্যাণ্ডের এক প্রান্তের মানব জীবনের ওপর লেখা তাঁর উপন্যাসগুলিও সেই কারণেই বিশ্ব মানবের জীবনকে প্রতিফলিত করেছে।

সমাজের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে ফিল্ডিঙের সচেতনতা ছিল অতি তীক্ষ্ণ। তিনি জানতেন দরিদ্রদের ওপর ধনীরা এখানে দস্যু বৃত্তি চালায়, চালায় দৈহিক ও নৈতিক উভয় প্রকার শোষণ। তিনি দেখেছিলেন যে এই সমাজ সামাজিক মাপকাঠির এক প্রান্তে নোংরামি ও মূর্খামির এবং তার বিপরীত প্রান্তে দুর্দশা ও অধঃপতনের জন্ম দেয়।

এই মৌলিক সমালোচনার কথা বুঝতে না পারলে ফিল্ডিঙের কল্পনার জগৎটাকে বোঝা যাবেনা কারণ এই সমালোচনাই হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।

সর্বত্রই এর প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস, 'জোসেফ অ্যাণ্ড্রুজ'-এ 'বড় লোক ও ছোট লোক সম্পর্কে মতামত'-এর মধ্যে, গ্রাম্য বিচারকদের নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে আক্রমণের মধ্যে এবং গ্রাম্য জমিদারদের আঘাত করার মধ্যেও এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

'টম জোনস'-এও একই ব্যাপার। 'অ্যামেলিয়া'-য় শ্রেণী বিভক্ত বিচার ব্যবস্থাকে হেয় করে যে-চিত্র আঁকা হয়েছে তার কোন জুড়ি নেই বললেই চলে।

তবে জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি সবচেয়ে বিশদভাবে ব্যক্ত হয়েছে বিখ্যাত সেই ব্যঙ্গ গ্রন্থ 'জোনাথন্ ওয়াইল্ড'-এর মধ্যে।

শেষোক্ত লেখাটি এমনই একটি গ্রন্থ যা হিটলার বা মস্লে নিশ্চয় পুড়িয়ে ফেলবেন। এমন কি অতীতে উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও এই বইটি সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর নীরবতা রক্ষা করে এসেছেন কারণ সমাজকে এর চেয়ে প্রলয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দোষারোপ করে স্বয়ং ফিল্ডিংও আর কিছু লেখেননি। সুইফটকে সহ্য করে নেওয়া তবু সম্ভব কারণ একদিক দিয়ে তাঁকে উন্মাদ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় আর অন্য দিক দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গটিকে রূপকথা বদনাম দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু স্বয়ং অপরাধীকে নিয়ে লেখা ফিল্ডিঙের গল্পের বেলায় ওই পদ্ধতি খাটবেনা। এখানে অপরাধীকে তিনি উপস্থিত করেছেন আর পাঁচজন "মহান ব্যক্তি"-র ধাঁচে। 'অফ হ্যাটস' নামে বিখ্যাত পরিচ্ছেদটি বুর্জোয়া রাজনীতির ওপর যেভাবে রায় দিয়েছে আজ অবধি আর কোথাও তাকে ওই ভাবে দংশন করা হয়নি। ওয়াইল্ড যেখানে তার সঙ্গীকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে লুঠের মালটা পুরোপুরি ওয়াইল্ডের হাতেই সমর্পণ করা উচিত, ওয়াইল্ডের সেই বক্তৃতার মতো নিখুঁত আয়রনির উদাহরণ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। ওয়াইল্ড বলছে :

"নশ্বরদের মধ্যে আমরা যারা উচ্চ বর্ণের তাঁদের সম্বন্ধে ঠিকই বলা হয় যে আমরা জন্মেছি শুধু পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ গ্রাস করার জন্য এবং একই ভাবে নিম্ন বর্ণের সম্বন্ধেও একথা বললে মোটেই ভুল হবে না যে তারা জন্মেছে শুধু আমাদের জন্যে এই সম্পদ সৃষ্টি করতে।"

একথা বুঝতে দেরী হয় না যে ফিল্ডিংকে তাঁর সমসাময়িক লোকেরা পছন্দ করত না, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপরও আক্রমণ চালানো হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসগুলি যদিও সাফল্য অর্জন করেছিল কিন্তু সর্বজন সমক্ষে তাঁকে প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন পরবর্তী যুগের একজন মানুষ, যিনি ছিলেন এক অনন্য ঐতিহাসিক ও শিল্পী।

'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার'-এর রচয়িতা এডওয়ার্ড গিবন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, "টম্ জোনস-এর এই রোমান্স, মানুষের আচার আচরণের এই অনুপম চিত্র, এসকুরিয়ালের প্রাসাদ এবং অস্ট্রিয়ার রাজ ভবনের প্রতীক স্বরূপ ঈগল পক্ষীটির চেয়েও দীর্ঘজীবী হবে।"

শেক্সপীয়রের মতো ফিল্ডিঙেরও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বেশী তথ্য জানা

যায় না। ১৭০৭ সালে তাঁর জন্ম হয়, এবং লিসবনে ১৭৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

অষ্ট্রিয়ার রাজভবনের ঈগল পক্ষীটি মারা গেছে, এবং এসকুরিয়ালের প্রাসাদকে ফ্যাসিস্ট বন্দুক এখন টুক্‌রো টুক্‌রো করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু 'টম্ জোনস' এখনো আমাদের ঐতিহ্যের এক গৌরবময় এবং সজীব অঙ্গ।

ডেইলি ওয়ার্কার,
৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৬

র‍্যাল্‌ফ্ ফক্স রচিত পুস্তকের তালিকা

1. Captain Youth : A Comedy in 3 acts. (Daniel, 1922)
2. People of the Steppes (Constable 1925)
3. Storming Heaven (do , 1928)
4. Lenin : A Biography (Gollanz , 1933)
5 Colonial Policy of British Imperialism (Martin Lawrence, 1933)
6. Marx & Engels on the Irish Question (do , 1933)
7. Class Struggle in Britain, 2 vols. (do , 1934)
8. Communism (do , 1935)
9. Jenghis Khan (do , 1936)
10. France faces the future (Lawrence & Wishart , 1936)
19. Portugal Now (do , 1937)
12. The Novel and the People (do , 1937)
13. Marxism and modern Thought (Translation)
14. Essays in Historical Materialism („)

নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপ্‌ল্‌

মুখবন্ধ

শিল্পের সঙ্গে জীবনের যে বিশাল ও সুগভীর সম্পর্ক বিরাজমান, তা নিয়ে এই প্রবন্ধে কোন বিশদ আলোচনা হবে না। এই প্রবন্ধের সীমিত লক্ষ্য হল ইংরাজী উপন্যাসের বর্তমান অবস্থাকে খতিয়ে দেখা। প্রচলিত এবং প্রায় সর্বজনবিদিত কিছু ধ্যানধারণা ও আইডিয়া একসময় যে-কোন উপন্যাসেরই ভিত্তি-প্রস্তর হিসেবে কাজ করত। কিন্তু জীবনের ক্রমবর্ধমান গতি ও আধুনিকতার সঙ্গে এমন কিছু সঙ্কট এসে পড়েছে যার ফলে সেই সব ধ্যানধারণা আর আগের মত কোন নিয়মানুগ ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ তো করছেই না, বরং ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে সেই গোড়ায়, যার ওপর এতদিন সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল উপন্যাসের অবয়ব। এই প্রবন্ধে সেই বিশেষ সঙ্কট নিয়ে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে রাখি ; তা ছাড়া উপন্যাসের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে কিছু আলোচনা করাও এই প্রবন্ধের সীমিত লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে।

এখানে হয়তো আমার বলে রাখা উচিত যে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি উপন্যাসের একটা ভবিষ্যৎ আছে, যদিও বর্তমানে উপন্যাস এক ভয়ানক অস্থির অবস্থার মধ্যে রয়েছে। উপন্যাস হল আমাদের সভ্যতার এক মহান লোকশিল্প মহাকাব্যের একমাত্র উত্তরসূরী, আমাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের গান, শ্যঁস দ্য জেস্‌ৎ এবং উপন্যাস বেঁচে থাকবে। জীবনের অর্থই হল পরিবর্তন। অন্তত শিল্পে এই পরিবর্তন যে সবসময়ই অধিকতর ভাল কোন কিছুর জন্য হবে, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা পরিবর্তন। জীবনের এই সতত সংঘটিত পরিবর্তন যদি উপন্যাসে স্থান না পায় তাহলে উপন্যাস তার প্রাণশক্তি হারাবে। এইসব পরিবর্তনই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মানুষের ইতিহাসে কালক্রমে অনেক নতুন শিল্পই জন্মগ্রহণ করেছে। যেমন, সিনেমার কথাই ধরা যেতে পারে। কিন্তু আজ অব্দি কোন শিল্পই পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি। মানুষ তার সচেতনতার সর্বপ্রকার বিস্তৃতির ওপরে সজাগ লক্ষ্য রাখে, যা-কিছু বাস্তব জগত সম্বন্ধে মানুষের অনুভবকে এক উচ্চ সুরে বেঁধে দেয় তাকেই সে আঁকড়ে ধরে। উপন্যাসও এক নতুন শিল্প। এ কথা সত্যি যে উপন্যাসের শিকড় সুদূর অতীত অব্দি বিস্তৃত, ট্রিম্যালকিও'র ব্যাঙ্কেট,

দাফঁ এবং ক্লো পর্যন্ত ; হয়তো বা আরও পিছিয়ে দেখতে গেলে হেরোডোটাস অব্দি। এসব সত্বেও উপন্যাস তার নিজস্ব অধিকার, সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব আইন-কানুন এবং বিশ্বব্যাপী সমর্থন ও প্রশংসা সমেত আজ একান্তভাবেই আমাদের সভ্যতার, এবং সর্বোপরি মুদ্রণযন্ত্রের সন্তান।

উপন্যাস সত্যিই সাহিত্যের এক সামান্য অংশমাত্র। কিন্তু সেই অর্থে দেখতে গেলে নাটকও তাই, এবং নাটককে স্বতন্ত্র এক শিল্পমাধ্যম হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতে কেউই অস্বীকার করবেনা। উপন্যাস কেবলমাত্র গদ্য কাহিনী (fictional prose) নয়। উপন্যাস হল মানুষের জীবনের গদ্য, উপন্যাস হল মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার ও তাকে অভিব্যক্তি দেবার প্রথম নান্দনিক প্রচেষ্টা। এই প্রসঙ্গে ই, এম, ফরস্টার উপন্যাসের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করেছেন—তিনি বলেছেন অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের থেকে উপন্যাসের তফাৎ হল এইখানেই যে, উপন্যাস গোপনীয় যা কিছু, তাকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারে। অতএব কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্র, অঙ্কন বা সঙ্গীত যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবকে উপস্থাপিত করে উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে স্বতন্ত্র।

উল্লিখিত এই সকল শিল্পমাধ্যম বাস্তবের এমন অনেক দৃষ্টিকোণকে অভিব্যক্তি দিতে পারে, যা উপন্যাসের নাগালের বাইরে। কিন্তু তা সত্বেও ব্যক্তিমানুষ বা ইন্‌ডিভিজুয়ালের পূর্ণ জীবনকে একটি উপন্যাস যেরকম সন্তোষজনকভাবে প্রকাশ করতে পারে, সেরকমভাবে প্রকাশ করতে পারে না এই সব অন্যান্য শিল্পমাধ্যম। এর কারণ কি সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেরই অন্য কোথাও আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। আলোচনার সুবিধার্থে আপাততঃ পাঠকসাধারণকে এই বক্তব্য গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে উপন্যাস শিল্পে এমন কি সমস্যা হঠাৎ দেখা দিয়েছে যে একাধিক লোক এর ওপর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দেবে, দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যাবে চারদিকে, ঠিক যেরকম ভুল পথে সর্বনাশের দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলে তাকে চেঁচিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয় ? এর উত্তর হল—হ্যাঁ, জীবিকাসূত্রে এই জগতে জড়িত অধিকাংশ ব্যক্তি এতদিনে মোটামুটি একমত যে, ইদানীং ইংরাজী উপন্যাস তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উভয়ই হারিয়ে এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন। বিশেষতঃ উপন্যাসের প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ উপন্যাস পড়া হয় ব্যাপকভাবে—সেই বৈশিষ্ট্যই আজ লোপ পাবার মুখে। উপন্যাস ক্রমশঃ অপাঠ্য হয়ে উঠছে।

অবশ্যই একথা সত্যি নয় যে সস্তা চটুল লাইব্রেরীর বই-এর তাকে এক

অবস্থান ধর্মঘটের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বরং আগে যত উপন্যাস পড়া হত তার চাইতেও অনেক বেশি পরিমাণে উপন্যাস পড়া হচ্ছে এবং পড়া হচ্ছে অপাঠ্য উপন্যাসগুলো। হেঁয়ালি কখনো ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য হতে পারে না, কাজেই আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করব।

প্রথম এবং প্রধান সমস্যা কোয়ালিটি বা গুণ। ইদানীং যেরকম অজস্র জনপ্রিয় উপন্যাস বাজারে বেরোচ্ছে, আগে সেই পরিমাণে বের হয়নি। এইসব উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য হল এদের খুব তাড়াতাড়ি, চিন্তাভাবনা না করেই, রেডিও বন্ধ করে (কিংবা চালিয়েও), ট্রেনে, বাসে, সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে গিয়ে একদমে পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। একবার পড়ে ফেলার পর সমদ্রুতগতিতে ভুলেও যাওয়া যায়। এবং দ্বিতীয়বার আর পড়বার দরকার হয় না। যাই হোক, মোটামুটিভাবে, এইসব উপন্যাসের সঙ্গে বর্তমান আলোচনায় আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা এরা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় কোনমতেই।

স্বভাবতই এইসব উপন্যাসের লেখকরাও এক বাস্তব জগত চিত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্বচিৎ কদাচিৎ, তাও কোন বিশেষ ব্যক্তিগত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যে বাস্তবকে এইসব উপন্যাসের ঘটনার ঘনঘটার মধ্য থেকে বের করে আনা যায়, সেই বাস্তব কোনমতেই আমাদের চেতনায় সেই ধাক্কা দেয়না, আমাদের ভাব অনুভূতিকে তা কোনমতেই টানটান করে বেঁধে ফেলতে পারেনা উপন্যাসের বক্তব্যের সঙ্গে, পারেনা আমাদের পাঠক মনকে সদাসতর্ক অবস্থায় ধরে রাখতে। আমরা কেবলমাত্র উপন্যাসটিই পড়ি। উপন্যাসের নায়ক যা দেখছে সেই জিনিস আমরা তার চোখ দিয়ে দেখতে পারিনা, নায়কের অভিজ্ঞতা আমাদের সচেতনতার সঙ্গে একসূত্রে কোনমতেই বাঁধা হতে পারেনা। অধুনা যে কোন উপন্যাস সমালোচক কয়েক একর ব্যাপী অন্ধকার, নীরস, ছাপানো পাতা ঘেঁটে একগাদা ক্লান্ত সপ্তাহ পার করে দিয়েও শেষ অব্দি বস্তাপচা কিছু ভাবালুতা আর বয়ঃসন্ধিকালিন কিছু বিশেষ ধরনের সম্পর্ক ব্যতীত অন্য আর কিছু না পেয়ে চিরবিষণ্ণ বিশ্বনিন্দুকের হতাশা নিয়ে ফিরে আসেন। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকেনা। এই প্রসঙ্গে মিষ্টার সিরিল কনোলীর কথা মনে পড়ছে। অন্য যে কোন সমালোচক অপেক্ষা ঠোঁটকাটা এই সমালোচক বলেছেন, যেহেতু বর্তমান উপন্যাসে সমালোচনার মত কিছুই আর আজকাল তিনি পাচ্ছেন না, সেহেতু উপন্যাসটির চাইতে তাঁর নিজের কথাই থাকছে বেশি পরিমাণে। মন্দ নয়!

অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার, বাজে বই-এর এই স্ফীতি কিন্তু কোনমতেই পাঠকের

সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য হয়নি। এটা হয়েছে সদা-বর্ধমান পাঠকসমাজের রুচি নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের জন্য প্রকাশকদের ব্যবসায়িক কলাকৌশলে। পাঠক সমাজ আজ-কাল আর তাঁরা যা পছন্দ করেন তা পাচ্ছেন না। বরং উল্টোটাই ঘটছে। হাতের সামনে তাঁরা যা পাচ্ছেন তাই তাঁদের পছন্দ করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে।

এইসব অতিকায় এবং একান্তভাবে যুক্তিবাদী প্রকাশকদের অধিকাংশেরই নিজস্ব প্রেস ও বই বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা আছে। আর আছে, আধুনিক ব্যবসার অন্যতম প্রধান অঙ্গ, ব্যাঙ্কে প্রভূত পরিমাণ টাকা। অতএব ব্যবসা চালিয়ে যাবার জন্য তাঁদের সব সময়ই বই-এর খোঁজে থাকতে হয়। তাঁদের চাই বই, আরও বই এবং এই ক্ষেত্রে উপন্যাসই বাঞ্ছনীয়। কেননা অন্যান্য ক্ষেত্রের লেখকদের চাইতে ঔপন্যাসিকদের মজুরি কিছুটা কম দিলেও চলে। অপেক্ষাকৃত কম পয়সায় উপন্যাস প্রকাশ করা যায় অনায়াসেই। আর যদি এসব উপন্যাস স্বকীয়তা বর্জিত হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। যে কোন সস্তা লাইব্রেরী তাদের লুফে নেবে।

প্রকাশকদের মধ্যে সব সময়ই একটা অঘোষিত যুদ্ধ চলে পরস্পরের মধ্যে। কাজেই তাঁদের প্রকাশিত বই-এর তালিকায় ক্রমাগত আরো, আরো বই-এর নাম জুড়ে দেওয়া হতে থাকে। নিজেদের ছাপাখানাগুলিকে সবসময় কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য এইসব প্রকাশকদের অনবরত নতুন বই-এর খোঁজে থাকতে হয়। ফলতঃ কি ছাপান হচ্ছে সেটা খুব একটা চিন্তনীয় বিষয় থাকেনা। এইসব বইগুলি আজেবাজে জঞ্জালই হোক, বা তাদের মধ্যে সুপ্ত কোন প্রতিশ্রুতিই থাকুক, এরা এক টাইপে ছাপা হয়, এক ধরনের কাগজের ওপর ; বাঁধাই হয় এক ধরনের কাপড়ে একই ধরনের মলাট দিয়ে। যে সব লাইব্রেরীগুলিতে এদের বিক্রী করা হয় তারাও এক এবং অপরিবর্তিত।

সাধারণত এইসব উপন্যাসের মলাটের উপর প্রকাশকরা উক্ত বই-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে দু-চার কথা মুদ্রিত করে দেন। সমালোচকরা বহুদিন ধরেই ভাল মন্দর পার্থক্য বিচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। অত্যন্ত ঢিমে তালে, যান্ত্রিক চেতনায় তাঁরা বেশির ভাগ সময়ই প্রকাশকদের মত মেনে নেন ; এ ছাড়াও প্রকাশকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমালোচকদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপরেও নির্ভর করে উপন্যাসের সম্বন্ধে কি বলা হবে।

প্রকাশকদের এই ব্যবসায়িক খেলার মধ্যে লেখকদের ভূমিকা শূন্য। বই-এর বাজারে কাটতি বাড়লে লেখকের অবশ্যই গুরুত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু মূলতঃ তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকেন সেই একঘেয়ে ব্যবসাজনিত টানাপোড়েনের মধ্যে।

খ্যাতি বাড়লে লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের সম্পর্কও অন্যদিকে মোড় নেয়। কিন্তু তার মূলেও সেই ব্যবসা।

পাবলিসিটি বা প্রচার বিজ্ঞাপনের মারপ্যাঁচ, বিভিন্ন সস্তা ক্লাব বা লাইব্রেরীতে বিশেষ ধরনের বইয়ের চাহিদা ও রপ্তানী বাড়ানো, পারস্পরিক পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন, বিশেষ প্রেসের তাঁবেদারি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে তা আয়তনে বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাবে। কিন্তু এই প্রবন্ধের সঙ্গে এই ধরনের সমস্যাগুলির খুব একটা প্রত্যক্ষ, যৌক্তিক সম্পর্ক নেই বলে সযত্নে আমি এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছি।

প্রধানত যে বিষয়টি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তা হল, প্রকাশনা বস্তুটি এখন সম্পূর্ণভাবে এক বিশালবপু ব্যবসার অঙ্গবিশেষ। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রকাশকদের ঘাড়ে দোষ চাপালে তা এক হাস্যকর মূর্খতা ছাড়া কিছুই হবেনা। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁরা আজ এরকম একটা অবস্থায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। এর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হল সাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস আজ এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন। গুণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ বেড়ে চলেছে বিপুল হারে।

এ ছাড়াও আছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তা হল ঔপন্যাসিকদের নিজেদের মধ্যেকার দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা। একথা অনস্বীকার্য যে দুর্বল এবং বাজে লেখার এই প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যেও ভাল ঔপন্যাসিক আছেন, যাঁরা এখনও অদ্বি সততা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডি, এইচ, লরেন্স মারা গেলেন এই সেদিন। জেমস জয়েস এবং ই, এম, ফরস্টার এখনও জীবিত। রেবেকা ওয়েস্ট, অ্যালডাস হাক্সলি এবং কম করে আরও আধ ডজন ঔপন্যাসিক এখনও সম্পূর্ণভাবে বিবেকোচিত সততা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, সাফল্য যাই হোকনা কেন।

ইদানীং সিরীয়স লেখকদের যে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তা মারাত্মক। অন্য যে কোন শিল্পী বা স্রষ্টার চাইতে একজন লেখকের পক্ষে তাঁর নিজের দেশকে অভিব্যক্তি দান করার সুযোগ অনেক বেশি। গোটা পৃথিবী জুড়ে তাঁর লেখা পড়া হয়। অতীতের ইংল্যাণ্ডকে বহির্বিশ্বের লোক বিচার করত প্রধানতঃ ওয়েলস, কিপলিং, গলসওয়ার্দি এবং কনরাড-এর লেখা দিয়ে। একদম আধুনিক কালে বহির্বিশ্ব ইংল্যাণ্ডকে বিচার করছে প্রধানতঃ হাক্সলির লেখা থেকে। আশার কথা, হাক্সলি ছাড়াও কিছু উঠতি তরুণ লেখকের লেখাও অনূদিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে।

অতএব নিজের দেশের অতীত ও বর্তমান, এই দুয়ের প্রতিই ঔপন্যাসিকের এক বিশেষ দায়িত্ব থাকে। অতীত থেকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়ে থাকেন, তা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের কোন্ কোন্ অংশ বর্তমানেও অর্থবিশিষ্ট, ঔপন্যাসিক তা উপলব্ধি করতে পারেন। ঔপন্যাসিক বর্তমান সম্বন্ধে যে মতামত পোষণ করেন তার গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। কেননা, তাঁর সময়ের মৌল ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্পিরিট বা মননকে ভাষার মাধ্যমে রূপ দেবার দায়িত্ব তাঁর ওপর। এই প্রসঙ্গে অনেকে বিরোধী মতামত পোষণ করেন। বলেন, তাঁর উপন্যাসের প্রতি অন্যান্যরা কে কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাবে, সেটা ঔপন্যাসিকের দেখার দায়িত্ব নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যা পেয়েছেন, তিনি যে বক্তব্য রাখছেন, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এ কথা যদি মেনেও নেওয়া যায়, তবুও এটা কোনমতেই অস্বীকার করা যায়না যে, কোন লেখকই বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অস্বীকার করে বেরিয়ে আসতে পারেন না। যে পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদ তার সব রকমের উৎকট আত্মম্ভরিতা এবং বিনাশমূলক রূপ নিয়ে উপস্থিত সেই পৃথিবীতে জীবিত লেখকদের মধ্যে উক্ত জাতীয়তাবাদকে কে কোন্ চোখে দেখছেন এটা জানা বা জানতে আশা করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য আজকের ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই এই ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এইসব সমস্যায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছেন।

কোন বিশেষ ধর্মের জন্য কি কোন লেখক তাঁর দেশকে অস্বীকার করবেন? মিষ্টার এভলিন ওয়া তাই করেছেন। এবং এর একমাত্র ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি অন্য এক দেশের উৎকট জাতীয়তাবাদের উন্মুখ ক্রোড়দেশে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে আজকালকার রোম্যান ক্যাথলিসিজম পরোক্ষভাবে ফ্যাসিস্ত ইতালিকে সমর্থন করে। এবং সব কয়টি আধুনিক দেশের মধ্যে আগ্রাসী নীতি আর আত্মশ্লাঘার দিক দিয়ে জার্মানির পরেই যে ইতালির স্থান, সে কথা সবাই জানে। কোন লেখক কি ডি, এইচ, লরেন্সের রক্ত এবং জাতির ধারণা বা কাণ্টের যৌক্তিক পরিণতির ওপর আস্থা রাখতে চলেছেন? তাহলে তাঁর অবস্থা হেনরি উইলিয়ামসনের মত হতে পারে। ডি, এইচ, লরেন্সের ব্লাড অ্যাণ্ড রেস কাণ্টে বিশ্বাসস্থাপন দিয়ে শুরু করে উইলিয়ামসন শেষ অব্দি গিয়ে পৌঁছেছিলেন নাৎসী সংস্কৃতির সমর্থনে, অর্থাৎ মধ্যযুগীয় টর্চার চেম্বার (নির্যাতন প্রকোষ্ঠ) বা যুদ্ধের 'আত্মিক' মহিমা ইত্যাকার কয়েকটি বিষয় তাঁকে সমর্থন করতে হয়েছিল।

মিস্টার ওয়া জেসুইট শহীদ এডমণ্ড ক্যাম্পিয়নের জীবনী লিখেছেন এবং তার জন্য তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে হ্যথর্নডেন পুরস্কার দিয়ে।

কিন্তু শেক্সপীয়র বা মার্লো কি পারতেন ক্যাম্পিয়নকে একজন শহীদ বলে স্বীকার করতে? যখন ইংল্যাণ্ড তার জাতীয় অবস্থিতির জন্য রীতিমত সংগ্রাম করছে, লড়াই করে গড়ে তুলছে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিবেশ তখন ক্যাম্পিয়নের কার্যকলাপ শেক্সপীয়রের দুটি ছত্রে খুব ভালভাবে পাওয়া যাবে :

"the fools of time,
which die for goodness, who have lived for crime"

পরিষ্কার করে বলতে গেলে, আজকের লেখককে খুব ভালভাবে জেনে নিতে হবে কোন জিনিসটি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী, কোনটি জাতীয়তাবাদ-সম্মত, কোনটি বা জাতীয়তাবাদ বিরোধী। বর্তমানের যতটা মূল্য, অতীতেরও ঠিক ততটাই। আমাদের চলার পথে এদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে ঠিকই; তবে অতিরিক্ত বোঝার চাপে আমরা যেন অযথা ঝুঁকে না পড়ি সেদিকেও রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি। অতীতের ঠিক যতটুকু আমাদের প্রয়োজনীয় ততটুকু গ্রহণ করে অবশিষ্ট যে অংশ পথের ওপর বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে তাকে বর্জন করতে যেন আমরা সক্ষম হই।

দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কট বহুলাংশে দর্শন, অতএব আঙ্গিক বা ফর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহাযুদ্ধের পর থেকে অধিকাংশ ইংরেজ লেখকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বশেষ ইওরোপীয় লিবারাল সিগমুণ্ড ফ্রয়েড দ্বারা অনুপ্রাণিত। *ফ্রয়েড বিশ্লেষিত ও উন্নতকৃত সাইকো-অ্যানালাইসিস হল ব্যক্তির প্রতি মহিমা আরোপ, অর্থাৎ বুদ্ধিবাদী নৈরাজ্যর চূড়ান্ত পর্যায়। অন্য যে কোন আইডিয়া বা ধ্যান-ধারণার চাইতে এই মতবাদ নিঃসন্দেহে গত কুড়ি বছরে ইংরাজী উপন্যাসের ওপর অনেক বেশী প্রভাব ফেলেছে। ফ্রয়েডীয় বিচার বিশ্লেষণ সম্বলিত কয়েকটি উপন্যাস পরতে পরতে ব্যক্তি সম্পর্ক খুলে দেখিয়ে যথেষ্ট স্বকীয়তা লাভ করেছে, তবুও সামগ্রিকভাবে ফ্রয়েডের চিন্তাধারা বুদ্ধিবাদের জগতে একটা দৈন্য এনে দিয়েছে।

সর্বশেষ যে বিষয় নিয়ে আজকালকার লেখককে প্রায়ই মুস্কিলে পড়তে হয়, তাকে বলা যেতে পারে সামাজিক প্রসঙ্গ। লেখক যে পৃথিবীতে বাস করেন, তার সমস্যাবলীর প্রতি পুরোপুরি উদাসীন তিনি থাকতে পারেন কি? আসন্ন যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের ধাতব গর্জন তাঁর কানে গিয়ে কি পৌছায় না?

* উক্তিটি মিস্টার ডে. লুইস-এর থেকে ধার করা। —লেখক

ঔপন্যাসিক কি তাঁর নিজের দেশের অবস্থার দিকে চোখ বুজে থাকতে পারেন? তিনি যখন দেখেন তাঁর চারদিকে ডানা মেলছে আতঙ্ক, ব্যক্তিগত লোভের মুনাফা বাড়ানর পবিত্র কাজে লিপ্ত করে রাখা হয়েছে রাষ্ট্রকে, বারবার অস্বীকার করা হচ্ছে জীবনকে, তখন কি তিনি নীরব থাকতে পারেন?

ক্রমেই ঔপন্যাসিকরা হৃদয়ঙ্গম করছেন, তাঁদের কান, চোখ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি হল আসলে অনুভূতির ইন্দ্রিয় সকল এবং এরা, responsive to the stimulus of the human world, মানবজগতের উদ্দীপনা অনুসারে সাড়া দেয়। এইসব ইন্দ্রিয়, তথাকথিত ট্র্যাডিশনাল 'আর্ট' নামক এক আত্মিক জগতের নিষ্ক্রিয় ভৃত্য নয়। তাঁরা বুঝছেন যে, তাঁরা এমন একটা সময়ে বেঁচে আছেন যখন মানুষের ভাগ্য আগের থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়, এবং মানবতাবাদ এতদিন যাঁদের ঐতিহ্য ছিল তাঁরা এখন আর মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন না।

মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ঔপন্যাসিকরা এ ব্যাপারে অবহিত আছেন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যুদ্ধবিগ্রহ এবং একনায়কতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজ্যের প্রায়োন্মাদ আত্মকেন্দ্রিকতার ওপর ভিত্তি করেই হবে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস করে যে সামাজিক সম্পত্তিভিত্তিক নতুন কিছু মূল্যবোধের জন্যই চলেছে মানবজাতির নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস করে 'সব যুদ্ধ থেমে যাবে একদিন', বিধ্বস্ত হবে উগ্র জাতীয়তাবাদ, এবং গড়ে উঠবে এমন এক বিশ্বসভ্যতা যেখানে সুস্থ চেতনাসম্পন্ন দেশগুলি এগিয়ে আসবে সাহায্যার্থে।

বেশির ভাগ ঔপন্যাসিকই কমবেশি, দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিকতর স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁরা উপলব্ধি করেন এই নতুন সভ্যতা আসবে মেহনতি মানুষের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এবং তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন এই সভ্যতার নতুন দিগন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্মোচিত। এতে তাঁদের ঔৎসুক্য ও উৎসাহ এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে মার্কসবাদের ওপর, যা একশো সত্তর মিলিয়ন অধিবাসী সম্বলিত রাশিয়ার বিপ্লবীচেতনাসম্পন্ন শ্রমজীবী মানুষের জীবনদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

তদুপরি এরকম একটা ধারণা অনেকের মনেই দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে যে, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন এবং তার ফলশ্রুতি, রুশীয় বিপ্লব নিজভূমে সফল হলেও, মার্কসবাদ শৈল্পিক অভিব্যক্তির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, কেননা মার্কসবাদ মূলত

বস্তুতান্ত্রিক। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, মার্কসবাদ শিল্পীকে কিছু অন্ধ মতবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে।

সময় পাল্টেছে। মার্কসবাদের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হয়েছে। তাই আগে যেমন জোরের সঙ্গে এই সব মতামত প্রকাশ করা হত, আজকাল আর ততটা জোরের সঙ্গে করা হয়না। তথাপি, মার্কসবাদে বিশ্বাসী এমন অনেক ব্যক্তির মধ্যেও এরকম একটা ধারণা কাজ করে যে, সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ বা বিপ্লবী উপন্যাস ইত্যাদি খুব সিরিয়াসলি না পড়লেও চলে, কেননা মূলত এগুলি শ্লোগান ছাড়া কিছুই না।

অতএব ইংরাজী উপন্যাসের ভবিষ্যৎ এবং যেসব সমস্যা ইংরেজ ঔপন্যাসিকরা ভোগ করছেন তার সমাধান নিহিত আছে মার্কসবাদে। এই মতবাদের শৈল্পিক সূত্র—সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ একদিন সাহিত্যের জগতে বামপন্থীদের একত্রিত এবং পুনরুজ্জীবিত করবে। সংক্ষেপে এই মূল বক্তব্য সামনে রেখেই আমি আমার মুখবন্ধ শেস করছি।

মার্কসবাদ এবং সাহিত্য

মার্কসবাদ বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শন বস্তুর আদ্যতাতে বিশ্বাসী এবং এই দর্শন আরো বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী আমাদের বহির্ভূত এক স্বাধীন অস্তিত্ব হিসেবে বর্তমান। কিন্তু একই সঙ্গে মার্কসবাদ বলে, প্রতিটি বস্তুই সতত পরিবর্তনশীল, প্রতিটি বস্তুর একটি ইতিহাস আছে এবং কোন কিছুই পরিবর্তনাতীত বা স্থির নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে খুঁজলে খুব সামান্য কয়েক জনকে পাওয়া যাবে যাঁরা বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের বিরোধী ছিলেন, যদিও তাঁদের বস্তুবাদী দর্শন মার্কস বা এঙ্গেলসের বস্তুবাদী দর্শনের থেকে অনেকাংশে আলাদা। রাবেলা এবং মঁতেইন-এর দর্শনচিন্তায় প্রভাবিত সেক্সপীয়রের কাছে মার্কসীয় জীবনদর্শন অসংযত বা সাজ্ঘাতিক কিছু একটা বলে মনে হতনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ ব্রিটিশ লেখকের কাছেই বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শন বিনা প্রশ্নে গৃহীত ও স্বীকৃত হত।

কিন্তু আজ সেই অবস্থা নেই। নেই প্রায় এক শতাব্দীরও বেশিকাল ধরে। আজকালকার সাহিত্য পত্রপত্রিকাগুলির প্রধান আপত্তি হল মার্কসবাদ এবং কবিকল্পনা কখনই একসঙ্গে চলতে পারেনা। তাঁদের মতে এর একমাত্র ফলশ্রুতি হবে এক অপবিত্র চিৎকার চেঁচামেচির সামিল, কোন সার্থক সৃষ্টি নয়। এই ধরনের মতবাদ অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের বিকৃত মতবাদ। কেননা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই, কল্পনাপ্রবণ যে কোন লেখকের, বিশেষতঃ ঔপন্যাসিকের বস্তুবাদী জীবনদর্শন গ্রহণ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

বস্তু এবং আত্মা বা মননের চূড়ান্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্কসীয় সিদ্ধান্ত হল—অস্তিত্বই চেতনাকে নির্ধারিত করে রাখে, "Being determines consciousness"। কার্যতঃ কোন শিল্পী এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস না করলেও তাঁকে এই উক্তির মৌলতা এবং প্রাথমিক সত্য স্বীকার করতেই হবে। কেননা যে কোন কাল্পনিক সৃষ্টিই হল যে-বাস্তব জগতে স্রষ্টা বাস করছেন তার প্রতিফলন। এই জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ বা ঘৃণা ইত্যাদি থেকেই তাঁর সৃষ্টির উদ্ভব।

আলো, রং, আঙ্গিক, আকৃতি, বাতাসের নিশ্বাস, জীবনের গান, প্রাণী জগতের সৌন্দর্য ও কুশ্রিতা, রক্তমাংসের নরনারীর কাজকর্ম, স্বপ্ন, আশা, হতাশা এইসব নিয়েই তো শিল্প।

মিলটন কবিতার থেকে তিনটি বৈশিষ্ট্য দাবী করতেন। কবিতা হবে সহজ সরল, ইন্দ্রিয়গত বা সেনসুয়াস এবং আবেগপ্রবণ বা প্যাশনেট। যে শিল্প ইন্দ্রিয়গত নয়, বাস্তব জগতের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক নেই স্পর্শসাধ্য বস্তুসকলের সঙ্গে, তা কোন শিল্প তো দূরের কথা, শিল্পের ছায়াও নয়। স্রষ্টা এবং বহির্জগতের মধ্যেকার সংঘাত, বাস্তবকে আয়ত্ত করা এবং পুনরায় সৃষ্টি করার ঐকান্তিক চাহিদাই হল সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নির্যাস। "কিন্তু মার্কসবাদ কি দাবী করেনা যে, যে কোন শিল্পকর্মই হল অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের এক নিছক প্রতিফলন?" এখানে আপত্তি উঠবে।

না। এ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর পজিটিভিস্ট বা দৃষ্টবাদী স্কুলের কতিপয় বস্তুবাদী দার্শনিকের মতবাদ ছিল তাই। তবুও মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যের মূলগত মিল প্রায় ছিলনা বললেই চলে। জীবনের আত্মিক প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে শৈল্পিক সৃষ্টিও অন্যতম। মার্কস তাঁর "ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকনমি" গ্রন্থের ভূমিকাতে এই আত্মিক প্রক্রিয়া (Spiritual process) এবং জীবনের বস্তুগত ভিত্তির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর ধ্যানধারণাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

"মানব অস্তিত্বের বস্তুগত উপায়ের অন্তর্গত যে উৎপাদন প্রণালী তা গোটা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিগত জীবনপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মানুষের চেতনা, বা আরো সহজ কথায়, চিন্তাভাবনা, তার অস্তিত্বকে নির্দিষ্ট করে দেয়না। বরং উল্টোটাই হয়, অর্থাৎ তার অস্তিত্বের ওপরেই সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তার চিন্তাভাবনা ও চেতনা। সমাজে বস্তুগত উৎপাদনী শক্তিগুলি তাদের বিকাশের এক বিশেষ অবস্থায় এসে উৎপাদনের বিদ্যমান সম্পর্ক বা সম্বন্ধসমূহের সঙ্গে অথবা, যার সাথে তারা আগেই সক্রিয় ছিল, সেইসব সম্পত্তিগত সম্পর্কাবলির সঙ্গে এক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। উৎপাদনী শক্তিগুলির বিকাশের আকৃতি প্রকৃতি থেকে এইসব পারস্পরিক সম্বন্ধই তাদের শৃঙ্খল বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তখন আসে সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুবিশাল সম্পূর্ণ সামাজিক কাঠামো কমবেশি দ্রুতগতিতে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়।"

এই ধরনের বিপ্লবে সাধারণত দুটি শক্তির টানাপোড়েন কাজ করে। তা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রভেদ করে নিতে হবে দুটি বিষয়ের মধ্যে—একদিকে উৎপাদনের অর্থনৈতিক শর্তসমূহের অন্তর্গত বস্তুগুলির বিপ্লব, যা নির্ধারিত হতে

পারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্তকরণের মধ্য দিয়ে। আরেক দিকে থাকে আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক অথবা দার্শনিক, অর্থাৎ আদর্শগত ফর্মগুলি। ক্রমে মানুষ এই সংঘাত সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং নিজের পথ নিজেই বের করে নেয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

অতএব অবধারিতভাবে মার্কস বিশ্বাস করতেন যে জীবনের বস্তুভিত্তিক প্রণালী বা ধরণই শেষ পর্যন্ত জীবনের বুদ্ধিবাদী পথকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা বলে তিনি একবারও বলেননি যে এই দুই প্রণালীর মধ্যের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, অতি সহজদৃষ্ট ও যান্ত্রিকভাবে বিকশিত। সামন্ততন্ত্রকে হটিয়ে দিয়ে ধনতন্ত্র কায়েম হলে সামন্ততান্ত্রিক শিল্পও দূরে হটে যাবে, সেই স্থান পূরণ করবে ধনতান্ত্রিক শিল্প, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাবৎ গণ্যমান্য শিল্পীদের সৃষ্টিতে ধনতন্ত্রের চাহিদা বা অভাব ইত্যাদি ছবির আকারে স্থান পেতে শুরু করবে—এই ধরনের ধারণা মার্কস রীতিমত হেসে উড়িয়ে দিতেন। তিনি এও ভাবতেন না যে, যেহেতু সামন্ত-তান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা উন্নততর, সেহেতু ধনতান্ত্রিক সমাজের শিল্পসৃষ্টি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শিল্পসৃষ্টির চাইতে অনেক বেশি উচ্চতর মানের হবে ; অথবা গ্রীস ও রোমের ক্রীতদাস রাজ্যগুলির বা পূর্বদেশীয় রাজতান্ত্রিক অবস্থার তুলনায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উন্নততর হওয়ায় সামন্ততান্ত্রিক শিল্প হবে উল্লিখিত সমাজব্যবস্থার শিল্পসৃষ্টির চাইতে উন্নত মানের। মার্কসবাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে এরকম ভোঁতা ও গ্রাম্য দৃষ্টিভঙ্গির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

মার্কস জোর দিয়ে ঠিকই বলেছিলেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখাগুলির মতোই একেবারে নির্ভুলভাবে একজন আর্থনীতিক ঐতিহাসিক সমাজের বস্তুগত ভিত্তির পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করতে পারেন (তার মানে এই নয় যে এইসব পরিবর্তন বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারিত)। জীবনের সামাজিক ও আত্মিক উপরিসৌধর মধ্যেকার এই অন্তিম পরিবর্তনের কোন যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিমাপ সম্ভব নয়। এইসব পরিবর্তন আসে, মানুষ ক্রমশঃ তার সম্বন্ধে সচেতন হয়, মানুষ তার মনের ভেতরকার পুরাতন ও নতুনের বিরোধকে লড়াই করে হটিয়ে দেয়। কিন্তু অতীতের উত্তরাধিকারভারে ভারাক্রান্ত মানুষের এই নীরব সংগ্রাম এত অনিয়মিত এবং এত অস্পষ্ট যে মানুষের মনের পরিবর্তনসমূহকে বুঝে ওঠা খুবই দুষ্কর।

যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একথা সত্যি যে, ফরাসী বিপ্লব

আনীত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহের আইনসম্মত বা বৈধ অভিব্যক্তি হল "Code Nepole'on".

কিন্তু শুধু এইটুকু জানলেই Code Nepole'on-এর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। ফরাসীদেশের প্রাচীন ইতিহাস কি, বিপ্লবপূর্বযুগে ফ্রান্সে বিভিন্ন শ্রেণীসম্পর্ক কিরকম ছিল এগুলোও আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে কোন পথে কি চরিত্র নিয়ে বিপ্লব এসেছিল, এবং বিভিন্ন শ্রেণীসম্পর্কে এই বিপ্লব কি ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। আর সব চাইতে বড় কথা হল, নেপোলিয়নের সামরিক একনায়কতন্ত্র আমাদের বুঝতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। অর্থাৎ এককথায় এতগুলো ব্যাপার আগের থেকে বুঝে নিতে পারলে তবেই নতুন বুর্জোয়া সমাজের বৈধ অভিব্যক্তি হিসেবে Codeটির সার্থকতা এবং নেপোলিয়নের সমসমায়িক ফরাসী শিল্পবিপ্লবের গোটা ব্যাপারটা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সম্ভবতঃ আদর্শ উপরি-সৌধ বা super-structure-এর সব চাইতে সংবেদনশীল অংশ হল আইন। কিন্তু শিল্পের মূল আরো গভীরে। ফলস্বরূপ সুপার-স্ট্রাকচারের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে অন্য ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে নিতে শিল্পের সময় লাগে অনেক বেশি।

* ১৮৯০ সালে জে ব্লকের কাছে লেখা এক চিঠিতে এঙ্গেলস এই ব্যাপারের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "ইতিহাসের বস্তুগত ধারণা অনুসারে বাস্তব জগতের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনই শেষ অব্দি ইতিহাসের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী উপাদান হিসেবে কাজ করে। এর চাইতে বেশি কিছু মার্কসও বলতে চাননি আমিও বলিনি। কাজেই, কেউ যদি অত্যুৎসাহী হয়ে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যান এবং গোটা বক্তব্যটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, অতএব অর্থনৈতিক উপাদানই সবকিছুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী বস্তু, তাহলে তাঁর বক্তব্য হবে অর্থহীন, বিমূর্ত এবং অযৌক্তিক। কথা হল, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা হল ভিত্তি। কিন্তু এছাড়াও সুপার-স্ট্রাকচারের একাধিক উপাদান আছে। শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক গঠন আছে। তারও পরে আছে তার ফলশ্রুতি হিসেবে আইনের গঠন, অর্থাৎ সফল সংগ্রামের পর বিজয়ীর প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র ইত্যাদি। এছাড়াও, শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মস্তিষ্কে যাবতীয় সংগ্রাম ও সংঘাতের প্রতিফলন: রাজনৈতিক, আইনগত, ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ, ধর্মীয় ধারণা এবং তার ক্রমপ্রকাশ ও বিকাশের অনিবার্য ফল হিসেবে ধর্মমতান্ধতা —এ সব কিছুই ইতিহাসের সংঘাত ও সংগ্রামের ধারার ওপর প্রভাব ফেলে; এবং, এমনকি, অনেকক্ষেত্রে তার গঠন বা আকৃতি নিরূপণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক-

ভাবে অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। উল্লিখিত যাবতীয় উপাদানসমূহের মধ্যে সবসময় একটা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কাজ করে। এই অসংখ্য দুর্ঘটনা বা অচিন্তিতপূর্ব ঘটনাবলির মধ্যে (অর্থাৎ, এমন কিছু বিষয় ও ঘটনা আছে যাদের মধ্যে সম্পর্ক এত দূরবর্তী এবং যা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব ; এদের প্রতি সমান তীক্ষ্ণ নজর না রাখলেও চলে) শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক আন্দোলনই নিজেকে সবচাইতে বেশি প্রয়োজনীয় বলে দাবী করতে পারে। তা নাহলে যে কেউ নিজের ইচ্ছেমত ইতিহাসের যে কোন গতিবিধি জরীপ করার জন্য এই তত্ত্ব প্রয়োগ করতে পারত, আর সেই ব্যাপারটাও প্রথম ধাপের সহজ সমীকরণের মত জলবৎ তরলং হয়ে উঠতে পারত।"

অতএব এর থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। তা হল, মার্কসবাদ স্বীকার করে যে, যে কোন ধরনের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কারণ হচ্ছে চূড়ান্ত এবং নিষ্পত্তিমূলক হেতু। আবার একই সঙ্গে মার্কসবাদ আদর্শগত উপাদানগুলিকেও অস্বীকার করেনা। কেননা তারাও ইতিহাসের গতিপথে প্রভাব ফেলতে পারে এবং পরিবর্তনসমূহের গঠন বা আকৃতি নিরূপণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে পারে (কেবলমাত্র গঠন বা আকৃতির ক্ষেত্রে, এ কথা খেয়াল রাখতে হবে)। অনেকের মতে মার্কসবাদ, মানব চেতনার অন্তর্গত আত্মিক উপাদান, যা কিনা শৈল্পিক সৃষ্টিরই অনুরূপ, তাকে ছোট করে দেখে। অনেকে আবার এরকম কিছু অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করেন যে মার্কসের মতে যে কোন শিল্পসৃষ্টিই বস্তুবাদী ও আর্থনীতিক কারণসমূহের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন।

এই ধরনের চিন্তাভাবনা মার্কসবাদের এক হাস্যকর অতিরঞ্জিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা মার্কস কোনওদিনই শিল্পভাবনাসম্পর্কিত বিষয়ে এরকম মত পোষণ করেননি। তিনি অবশ্যই উত্তমভাবে বুঝেছিলেন যে, ধর্ম, দর্শন বা ট্র্যাডিশন প্রভৃতিরও শিল্পসৃষ্টিতে অসাধারণ অবদান আছে। এমন কি অনেক সময় এরাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে, এই সকল শিল্পস্রষ্টা যাবতীয় উপাদানের মধ্যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক আন্দোলনকেই শেষ অব্দি একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে তুলে ধরতে পারে। কেননা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস যে সব উপাদানকে সত্যি বলে জানতেন, নান্দনিক সৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁরা সেইসব উপাদানেরই সত্যতা মেনে নিয়েছেন।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আরেকটি বিশাল অভিযোগ হল মার্কসবাদ ব্যক্তিকে অস্বীকার করে। ব্যক্তি হল বিমূর্ত অর্থনৈতিক শক্তির হাতে এক নিছক

অসহায় শিকার। ব্যক্তি এই শক্তি দ্বারা চালিত হয় তার নিয়তির দিকে, ঠিক যেরকম অলঙ্ঘনীয় ভাবে গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়ককে মেনে নিতে হত তার দৈব নির্দিষ্ট ভাগ্যকে। বহির্শক্তি চালিত মানুষ যে অবধারিত ও অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, এই ধারণা শিল্পসৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলতে পারেনা, সেই প্রশ্ন নিয়ে এখন কোন আলোচনা করব না। ক্যালভিনিজম বা পূর্ববিধানবাদ হয়তো কখনও মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেনি, কিন্তু নিয়তি বা ভাগ্যকেন্দ্রিক ধ্যানধারণা তা পেরেছে। তার দুটি অন্যতম উদাহরণ এখনই দেওয়া যেতে পারে —গ্রীক ট্র্যাজেডি এবং টমাস হার্ডির রচনা। তৎসত্ত্বেও যদি কোন আপত্তি ওঠে, এবং তা যদি যথার্থই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হয়, তবে তার অকাট্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকেনা। এই আপত্তিটি অন্তত মহান পাশ্চাত্য শিল্পের মানবতাবাদী ট্র্যাডিশন দ্বারা প্রণোদিত, অতএব শ্রদ্ধার যোগ্য, যদিও এমনকি এই আপত্তি একটা বিরাট ভুল বোঝাবুঝির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

কেননা মার্কসবাদ ব্যক্তিকে অস্বীকার করেনা। মার্কসবাদ কেবলমাত্র জনসাধারণকে অপ্রতিরোধনীয় অর্থনৈতিক শক্তির জালে আবদ্ধ কিছু জীব হিসেবে দেখে না। যদিও একথা সত্যি যে, কিছু কিছু মার্কসীয় সাহিত্যকর্ম, বিশেষতঃ কিছু প্রলেতারীয় উপন্যাস কতিপয় অজ্ঞ, নিরীহ সমালোচককে একথা বিশ্বাস করতে ব ধ্য করেছে। তবুও এখানে একটা কিন্তু থেকে যায়। প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার এবং নতুন অর্থনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে পাল্টে ফেলে, একথা অবধারিতভাবে সত্যি। এবং এখানেই সম্ভবতঃ আমাদের ঔপন্যাসিকদের দুর্বলতা সব চাইতে প্রকট। তাঁরা তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে এই মহৎ উত্তরণে এসে পৌছতে পারেননা প্রায়শই। মার্কসবাদ তার দর্শনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে উপস্থাপিত করে। কেননা মার্কসবাদ দাবী করে বস্তুগত পরিবর্তন মানুষকেও পরিবর্তিত করতে পারে ; এবং একই সঙ্গে মানুষও বস্তুগত শক্তিগুলিকে পরিবর্তিত করার মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারে।

মার্কসীয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষ ও তার ক্রমবিকাশ। মানুষ কি করে পরিবর্তিত হয়? বহির্জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। মার্কসীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করছি না, তা এর আগে বহুবার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে বিষয়ে আলোচনা করা একান্ত-ভাবেই যৌক্তিক, তা হল সক্রিয় ঐতিহাসিক প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের ক্রিয়া-

কলাপ ; মানুষ ও তার শ্রম, এবং তার জীবনসংগ্রাম। কেননা মানুষই যুগপৎ শিল্পস্রষ্টা এবং শিল্পের বিষয়বস্তু। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে এঙ্গেলসের বক্তব্য :

"জীবনের অসংখ্য, একাধিক পরিস্থিতিসমূহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একাধিক ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও মনন কাজ করে। ইতিহাস নিজেকে এমনভাবে তৈরী করেছে যে সবসময়ই চূড়ান্ত ফলাফল উঠে আসে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ইচ্ছাসমূহের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে। এইভাবে অগুন্তি পরস্পর প্রতিচ্ছেদী শক্তি আছে, শক্তির সামন্তরিক ক্ষেত্রসমূহের এক অশেষ পরম্পরা, যাদের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় একটি লব্ধি—ঐতিহাসিক ঘটনা। অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটাকে দেখা যেতে পারে এমন এক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট ফলাফল হিসেবে, যে শক্তি অচেতনভাবে এবং ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্বিচারে, কাজ করে চলে। কোন ঘটনাবিশেষে প্রত্যেকটি ব্যক্তি পৃথক ভাবে যা ইচ্ছা করে, তাতে প্রত্যেকেই বাধাদানের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, এবং শেষ অব্দি যার উদ্ভব হয় তা হয়তো আগে কেউই চায়নি। এইভাবে অতীত ইতিহাস এগিয়ে চলে খানিকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতই, এবং তা একান্তভাবেই আন্দোলনের একই বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক গঠনও বাহ্যিক, কিংবা শেষ অবধি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (হয় একান্তভাবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, বা গোটাসমাজেরই ক্ষেত্রে) ব্যক্তির বিবিধ ইচ্ছা গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়। অথচ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তি তার ইচ্ছানুসারে কিছু পায় না। একাধিক ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় গড় ফল, একটি সাধারণ লব্ধি। তার জন্য কিন্তু ব্যক্তিগত ইচ্ছাসমূহের যোগফল—•, একথা বলা যায় না। বরং এই সাধারণ লব্ধির জন্য প্রত্যেকেরই অবদান আছে, এবং সেইভাবেই তারা এর সঙ্গে জড়িত।"

এই সূত্র কেবলমাত্র ঐতিহাসিকের নয়, ঔপন্যাসিকেরও। জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য ইচ্ছাশক্তির সংগে ব্যক্তি-ইচ্ছার এই সংঘাত হচ্ছে বা হওয়া উচিত ঔপন্যাসিকের অন্যতম সংশ্লিষ্ট বিষয়। মানুষের ভাগ্যই এই যে, সে তার ঈপ্সীত বস্তু কখনই পায় না। আবার এ তার গর্বের ব্যাপারও বটে, কেননা মানুষ তার অভিপ্রেত লাভার্থে যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তার মধ্য দিয়েই আসে জীবনের পরিবর্তন ;তা সে যত অল্প পরিমাণেই হোক না কেন। মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে মার্কসীয় ফরমুলা কখনও বলে

না, X=০। বরং সে বলে উল্টোটাই,—সামগ্রিক যে ফল উদ্ভূত হয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে, তাতে কম ও বেশি, সবারই কিছু না কিছু অবদান থাকে।"

বিভিন্ন ইচ্ছা, অভীপ্সা ও আবেগের যে সংঘাত, তা বিমূর্ত মানবদের সংঘাত নয়। কেননা এঙ্গেলস স্পষ্টতঃই বলেছেন মানুষের ইচ্ছা এবং কার্যকলাপ তার দৈহিক গঠন এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর, সে তার একান্ত নিজস্বই হোক, বা সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজেরই হোক। তার সামাজিক ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত তার নিজের শ্রেণী, সেই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি প্রধান অংশ গ্রহণ করে থাকে। এতে প্রতিটি মানুষকেই এক দ্বৈত সত্তার অধিকারী বলে ধারণা হয়। কেননা একই সঙ্গে সে একজন প্রতিনিধি সামাজিক ইতিহাস সম্বলিত একটি মানুষ, এবং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি যার কিছু ব্যক্তিগত ইতিহাসও থাকতে বাধ্য। এই দুটি সত্তা আপাতদৃষ্টিতে গুরুতররূপে সংঘাতশালী, পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও মূলতঃ এরা এক, অন্ততপক্ষে যতক্ষণ মানুষের উপরি উল্লিখিত দ্বিতীয় পরিচয়টি প্রথমটির দ্বারাই নির্দেশিত হচ্ছে। অবশ্যই তার মানে এই নয় যে শিল্পে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ওপরে স্থান পাবে সামাজিক 'টাইপ'। ফলষ্টাফ, ডন কুইক্সোট, টম জোনস, জুলিয়েন সোরেল, মঁসিয়ে দ্য শার্ল্যু—এরা প্রত্যেকেই 'টাইপ'; কিন্তু এরা এমন ধরনের 'টাইপ' যাদের মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যসকল অনবরত ব্যক্তিকে প্রকাশ করে থাকে; এবং তাদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা, ক্ষুধা, প্রেম, ভালবাসা, ঈর্ষা, উচ্চাশা ইত্যাদিও আলোকিত করে তোলে তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকা।

সামগ্রিকতার ওপর এই রকম স্থির দৃষ্টি না থাকলে ঔপন্যাসিক ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য নিয়ে তাঁর গল্প লিখতে পারেন না। তাঁর চরিত্রাবলীর ব্যক্তিগত সংঘাত থেকে কি করে চূড়ান্ত ফল উদ্ভূত হচ্ছে তা তাঁকে অবশ্যই বুঝতে হবে। আবার তাঁকে এও বুঝতে হবে, জীবনের সেই বহুবিধ পরিস্থিতিগুলি কি, যেগুলি তাঁর ব্যক্তিচরিত্রগুলিকে যে-যেমন সে-তেমন করে গড়ে তুলেছে "শেষমেষ যা বেরিয়ে আসে তা হয়তো কেউই চায়নি"—এঙ্গেলসের এই কথাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে যে কোন মহৎ শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর কি অদ্ভুত-ভাবেই না কথাটি গোটা জীবনের প্যাটার্নটাকে (ধাঁচ) অভিব্যক্ত করে; কেননা কেউ না চাইলেও ঘটনাটির পেছনে একটা প্যাটার্ন কিন্তু আছেই। মার্কসবাদ স্রষ্টা ও শিল্পীকে এই প্যাটার্নটা চিনতে সাহায্য করে

এবং চিনিয়ে দিতে চেষ্টা করে সেই প্যাটার্নে প্রত্যেকটি ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা। সেইজন্যেই মার্কস্‌বাদ শিল্পী স্রষ্টার হাতে তুলে দেয় বাস্তবের ঘরের চাবিকাঠি। একই সঙ্গে মার্কসবাদ মানুষকে সচেতনভাবেই তার পূর্ণ মূল্য দিতে ভোলে না, এবং স্বভাবতই এদিক দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মার্কসবাদ সর্বাপেক্ষা মানবতাবাদী।

সত্য এবং বাস্তব

থিয়োফাইল গ্যাতিয়ের একবার গঁ্যকুর ভাইদের সঙ্গে আলোচনা করতে বসেছিলেন। বিষয় ছিল শিল্পী হিসেবে তাঁর সারবত্তা। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন একজন মানুষ যাঁর জন্য দৃশ্যমান জগৎ অস্তিত্বশীল।" তিনি যদি বলতেন, "আমি এমন একজন মানুষ যাঁর জন্য জগৎ অস্তিত্বশীল," তাহলে হয়তো লেখক হিসেবে তাঁর স্বকীয় গুণাবলী এবং সীমাবদ্ধতা তিনি এত ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না। কিন্তু তাহলে হয়তো লেখক এবং বাস্তবের মধ্যেকার সম্পর্ক বিচার করার, সত্যের প্রতি লেখকের মনোভাব বিচার করার একটা ভাল মুখবন্ধ তিনি তৈরি করে দিয়ে যেতে পারতেন। আমি কি বলতে চাইছি তা একটি উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। একবার এক সাহিত্য আলোচনায় জনৈক সমালোচক আঁদ্রে জিদকে বলেছিলেন যে, একমাত্র ১৯২৫ সালে ফরাসী কঙ্গোতে ভ্রমণের সময়েই নাকি জিদ সামাজিক ন্যায়হীনতা সম্বন্ধে সচেতন হন।

"ব্যাপারটা আদৌ তা নয়", বলেছিলেন জিদ। "কঙ্গো সফরের সময় আমি আমার সব টুকিটাকি নোট আর ডাইরি ছাপিয়েছিলাম। অ্যামিনটাস (১৮৯৩-৯৬) রচনার সময়কার সফরের দিনপঞ্জীও আমি কেবলমাত্র কঙ্গো সফরের কড়চার মতই ছাপাতে পারতাম। আরও কাটছাঁট করে বলা যেতে পারে, আমি ঠিক যখন যা ভাবছি বা দেখছি তা নিয়েই দারুণ স্বাধীনভাবে আমি আমার নোট লিখতে পারতাম। যদি তা হত, তবে সেই সব লেখার মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, (Gagsa Phosphates) গাফসা ফসফেট-এর শোষণের ইতিহাস, কিম্বা আরো বেশি করে, '— ' নামক একটি ব্যাঙ্ক কি করে ক্ষুদ্র আরব কৃষকদের ভয়াবহ এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দখলচ্যুত করল তার ইতিহাস, ইত্যাদি খুব বিশদভাবে বর্ণনা করা হত। কিন্তু মজাটা সেখানেই। আমার কাজ তা নয়। এই ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারস্যাপার নিয়ে যদি আমার কলমকে ব্যস্ত করে তুলতাম তাহলে আমার নিজের কাছেই সেটা অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াত। এই ধরনের ঘটনাবলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমার চাইতে অনেক পাকাপোক্ত ব্যক্তিই আছেন। কাজেই এইসব ব্যাপার তাঁদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল।"

বস্তুতঃ, সেই সময়ে আঁদ্রে জিদ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর কাছে পৃথিবীর ভাবগত অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোনরূপ অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ছিলনা। কিন্তু মহাযুদ্ধের পরে কঙ্গো ভ্রমণের সময় বাস্তবে পৃথিবীর ভূমিকা বা অবস্থানটা কি রকম, এবং তাঁর একান্ত আন্তরিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা ছাড়াও সেই পৃথিবীর যে একটা অন্য অস্তিত্ব আছে, সেকথা বুঝতে তাঁর খুব বেশি দেরী হয়নি। কিন্তু এমনকি এখানেও, কঙ্গোতে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভীষণভাবে আত্মবাদী। পৃথিবীকে তিনি তখনও দেখতেন এক ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে; ধীরস্থির দৃষ্টি নিয়ে গোটা ব্যবস্থার পর্যালোচনা তিনি করতেন না। এই ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা খুবই চমকপ্রদ।

নব্বইয়ের দশকে, যখন তিনি প্রথম আলজিরিয়াতে ঔপনিবেশিক শোষণের যথার্থ রূপ দেখতে পেলেন, তিনি লিখেছেন, তখনও অব্দি তিনি বিশ্বাস রাখতেন "সেই অবাস্তব ধারণাতে (cult), যা দক্ষ বা কুশলী লোকদের ভূমিকা মেনে নেয়। যা মেনে নেয় কুশলী শিক্ষিত লোকদের, অর্থনীতিবিদদের এবং শাসকদের (বা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিদের) আধিপত্য। এই 'কাল্ট অব দ্য এক্সপার্ট' এর ওপর আমার আস্থা ছিল, এবং এই কাল্টকে আমি যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে এসেছি। আমার ধারণা ছিল যেসকল ঘটনাবলি আমার ঘৃণার উদ্রেক করে, তা নিশ্চয়ই এইসব মহান ও দক্ষ ব্যক্তিদেরও ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্রেক করবে। এবং তাঁরা নিশ্চয়ই যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, বলপ্রয়োগ, ভুলভ্রান্তি ইত্যাদি দেখলেই সে সবের নিন্দায় সোচ্চার হবেন এবং তা শোধরানোর চেষ্টা করবেন। সেই সময়ে আমি শোচনীয় রকমের বিনয়ী ছিলাম। আর তখনও অব্দি আমি এটা বুঝিনি যে যখন একজন লোক, যে নিজেই শিকার হতে চলেছে, সে যদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে গলাবাজি করে, তাহলে তার গলা কারুর কান পর্যন্ত পৌঁছয় না; কঙ্গোতে ব্যাপারটা হয়েছিল অন্যরকম। যাদের ওপর সরাসরি অত্যাচার হচ্ছে তাদের চিৎকারে যে কেউ কান দেবেনা তা আমি জানতাম। কঙ্গো যাবার আগে আমার যাওয়া আটকানোর জন্য এই কথা আমাকে বারবার বলা হয়েছিল। তাবৎ শাসনকর্তারা এমন কি ধর্মযাজকরাও, এক কথায় ফরাসী দেশের একমাত্র প্রতিনিধিবর্গে যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছিলেন। মুখ বন্ধ রেখেছিলেন হয় কর্তব্যের খাতিরে, নয় নিজের নিজের স্বার্থে। কাজেই এখানে যখন আমি একাই কিছু বলতে সক্ষম, তখন আমাকে বলতেই হল। কঙ্গো যাবার সময় আমি কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলাম না। আর যে সব অবিচার অত্যাচারের নিন্দা আমি করেছি, তাও কোন সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করিনি। অতএব একটা ব্যাপার আমি খুব তাড়াতড়ি বুঝে গেলাম (এক অবধারিত যুক্তিবোধ আমাকে বুঝিয়ে দিল) এই সব অবিচার বস্তুতঃ কোন নিন্দনীয় সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত; এবং আরো বুঝতে পারলাম যে সিস্টেম বা প্রথা এইসব অবিচারকে সহ্য করে, রক্ষা করে এবং সমর্থন করে, এর থেকেই সেই প্রথা তার নীট লাভের অঙ্ক তুলে নেয়, যা আগা থেকে গোড়া অব্দি ঘুণধরা, পচনশীল।"

আঁদ্রে জিদের প্রাথমিক ভাববাদী বুদ্ধিবাদ প্রথম দিকে একমাত্র সেইসব সত্যকে স্বীকার করত যা তিনি তাঁর নিজস্ব সীমিত চেতনায় (কাল্ট অব দ্য এক্সপার্ট) সত্যি বলে জেনেছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত স্বীকারোক্তিতে স্পষ্টতঃ দেখা যায় তাঁর প্রগতি ও পরিবর্তন। আত্মকেন্দ্রিক চেতনা থেকে তিনি সরে এলেন এমন এক জায়গায় যেখানে আস্তে আস্তে ভাঙচুর হতে শুরু করল তাঁর আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এতদিন তিনি জেনেছিলেন যে বহির্জগৎ কেবলমাত্র নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান। এখন তিনি দেখলেন যে তার আরও একটা দিক আছে। একে বুঝতে হবে, এবং তাঁর ব্যক্তি চেতনা স্বাধীন হবার আগে একে আয়ত্তে আনতে হবে।

তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে চেতনা, যাকে তিনি অস্তিত্বের মূল হিসেবে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন জগৎসৃষ্টিকারী ক্রিয়াকাণ্ড হিসেবে, সেই চেতনা প্রকৃত অর্থে সামগ্রিক মানবিক ক্রিয়াকলাপেরই ভাববাদী ব্যাখ্যা মাত্র। বস্তুবাদ থেকেই তার উদ্ভব ও বিকাশ; বস্তুবাদ থেকে তা আলাদা কোন কিছু না। ব্যক্তি-বিশেষের মনমানসে বহির্বস্তুজগৎ যে ছাপ ফেলে, তা অনূদিত হয় তার চিন্তার ভাষায়। অর্থাৎ তাবৎ ভাববাদী চুলচেরা বিশ্লেষণ হল বস্তুবাদেরই ভাষান্তর।

এতে মনে হতে পারে যেন আধুনিক বিশ্বে সদাবর্ধমান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষী-করণ এবং শ্রমবিভাগের বিকাশ গলা চেপে ধরেছিল মুখর, ভাষাময় সাহিত্যিকের, বাস্তবজগতের আর তাঁর চোখের মধ্যে ফেলে রেখেছিল অন্ধকার পর্দা। তার সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তি "আমার কাজ হল স্রেফ লেখা"—যেন এই কাজ অন্য সব কাজকে যে আটকে রেখে দেবে, এ তো জানা কথা। ব্যাল্ডউইন একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, কবিতা হল সব চাইতে নিঝঞ্ঝাট বৃত্তি; অবশ্য ততক্ষণই, যতক্ষণ কবি তাঁর কবিতার নিরীহ চরিত্রকে 'কলুষিত' করতে পারে জীবনের এরকম সর্ববিধ অংশ থেকে তাঁর চোখ ফিরিয়ে রাখেন। শিল্পীর কার্যাবলির এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অতি আধুনিক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-

ভাগের আগেও পৃথিবীর লেখকগোষ্ঠির অধিকাংশের কাছেই এই মত গ্রহণযোগ্য হত না। মার্লো থেকে ফিল্ডিং পর্যন্ত, ইংরাজী সাহিত্যের এই মহান কালে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একান্তই অপরিচিত।

আজকের দিনের সাহিত্যের বিপ্লবী কাজ হল তার মহান ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা, ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের সব বন্ধন ভেঙে ফেলা, ভেঙে ফেলা সঙ্কীর্ণ বিশেষীকরণকে ; এবং সৃষ্টিশীল, প্রতিশ্রুতিময় লেখককে তাঁর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। সেই কাজ হল সত্যের জ্ঞানকে জানা ও জয় করা, সেই কাজ হল বাস্তবকে জানা। মানুষের পক্ষে বাস্তবকে উপলব্ধি করার ও অঙ্গীভূত করার যা যা উপায় আছে, শিল্প হল তার একটি। নাওমি মিচিসনের ভাষায় বলা যেতে পারে, লেখক তাঁর নিজস্ব অন্তর্লীন চেতনার কামারশালায় বাস্তবের উজ্জ্বল সাদা লোহাকে হাতুড়িপেটা করে নিজের কাজে লাগানোর মত আকৃতি দিয়ে নেন, গড়ে পিটে নেন নিজের চিন্তার ধার দিয়ে। অর্থাৎ পৃথিবীর একটা খাঁটি ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র গড়ে তুলতে লেখক বা শিল্পীকে বাস্তবের সঙ্গে দুর্ধর্ষ এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই সংঘাতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির গোটা রহস্য, শিল্পীর তাবৎ যন্ত্রণা ও উদ্বেগ।

বায়রণ ও শেলীকে আমরা অনেক প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে বিপ্লবী চেতনা-সম্পন্ন কবি বলে জানি। কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচক তাঁদের প্রতি কি ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করেছিলেন তাও আমরা জানি। কিন্তু তাঁদের ছাড়াও কীটসের ওপরেও এই অশুভ ছায়া কোন অংশে কম পড়েনি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক অসমাপ্ত কবিতায় কীটস মহান সৃষ্টিশীল শিল্পীর বিপ্লবী সংগ্রামের সারার্থ খুব বলিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন :

"Knowledge enormous makes a god of me.
Names, deeds, grey legends, dire events, rebellions
Majesties, sovran voices, agonies,
Creations and destroyings, all at once
Pour into the wide hollows of my brain,
And deify me, as if some blithe wine,
Or bright elixir peerless I had drunk,
And so become immortal."

বস্তুতঃই যিনি মহৎ সাহিত্যিক, তিনি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, সব সময়ই এক ভয়ঙ্কর ও বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। এই

সংগ্রাম বাস্তবের সঙ্গে। এই সংগ্রাম বৈপ্লবিক, কেননা তা বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট থাকে প্রতি নিয়ত।

মার্কসবাদ কি সাহিত্যিককে এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে? সম্প্রতি দি টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে আমেরিকার বিপ্লবী সাহিত্যের প্রকৃতি অনুধাবন করে একটি পর্যালোচনা বের হয়েছিল। তাতে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার একটা চেষ্টা করা হয়। দি টাইম্‌স্-এর সমালোচক প্রশ্ন রাখেন: এই নতুন সাহিত্যের পক্ষে কি মানুষের অভিজ্ঞতা সমূহের সম্পূর্ণ প্রাঙ্গণটি অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? অবশ্যই যতক্ষণ পর্যন্ত একগুঁয়ে এবং অন্ধবিশ্বাসীরা নিজেদের মত প্রকাশে ও প্রচারে সচেষ্ট, ততক্ষণ অব্দি নয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে শিল্পের, বা এককথায় একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত সব শিল্পেরই লক্ষ্য হল এমন এক বোধশক্তি জাগরূক করা, যা যাবতীয় প্রচলিত মত বা ধারণাকে উপলব্ধি করতে পারে। এবং যে বোধশক্তি, স্বপ্রকৃতিবশতই এমন কোন দর্শনের চৌহদ্দীতে নিজেকে স্থাপন করেনা বা করতে পারেনা, যা মার্কসবাদের চাইতেও মুক্তমানসিকতাসম্পন্ন এক সামাজিক দর্শন। শিল্প এবং ডগম্যাটিজম বা অন্ধবিশ্বাসবাদ হল দুই বিপরীতমুখী মেরুর মত…। একজন শিল্পীর পক্ষে একই সঙ্গে সং শিল্পী এবং মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী না হবার কোন কারণ নেই। অন্ততঃ যতক্ষণ তাঁর মার্কসবাদী রূপ তাঁর গভীরতম জ্ঞানের সঙ্গে সংঘাতে না লিপ্ত হচ্ছে। এ খুবই যৌক্তিক ব্যাপার। অজ্ঞানতা বা অজ্ঞতা মানুষকে অতি অবশ্যই অন্ধ বা অস্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন করে রাখে। মানুষ তখন বড় জোর নতুন কোন সমাধানের জন্য প্রয়াসী হতে পারে। ফর্ম যদি শুধু মাত্র মনমানসের কারিকুরি বা যন্ত্রপাতি হিসেবে পরিগণিত হয়, তবে কোন না কোন ধরনের ফর্ম অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এমন কোন কারণ নেই যাতে মার্কসবাদ এই গৌণ ভূমিকাটি পালন করতে পারে না। অবশ্যই পারে! অন্ততঃ যতক্ষণ এই ভূমিকাকে আমরা গৌণ বলে মনে করে থাকি ততক্ষণ তো বটেই। এবং অন্যান্য কোন তুলনীয় ধারণা এই কাজটি যতটা সন্তোষজনক ভাবে করে থাকে, মার্কসবাদ তার চাইতে কোন অংশেই কম সাফল্য নিয়ে এই কাজ করেনা।

সংক্ষেপে এই ছিল দি টাইম্‌স্ এর সমালোচকের বক্তব্য। সমালোচক মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু এই দর্শনের আসল বৈশিষ্ট্য তিনি বুঝতে পারেন নি সম্ভবতঃ। যেহেতু একজন সাহিত্যিকের অবশ্যই একটা বিশ্বাস রাখতে হবে, সে যে কোন ধরনের দর্শনেই হোকনা কেন, সেহেতু

মার্কসবাদ থিওজফি বা ফ্রয়েডিজম বা অন্য ইজমের মত কাজ সারতে পারবে কি না তাতে কিছুই এসে যায় না। সমালোচক বলেছেন যে ফর্ম একটা মানসিক যন্ত্রবিশেষ এবং মার্কসবাদ এই ভূমিকা ভালভাবেই পালন করতে পারে। এই যুক্তিটা আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার স্কুলের হেডমাস্টার মশাইএর কথা। তিনি প্রতিটি বক্তৃতা দিবসেই ক্ল্যাসিক্স শিক্ষণকে সমর্থন করতেন। বলতেন ক্ল্যাসিকস পাঠ নাকি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী "মানসিক জিমন্যাষ্টিকস।"

অবশ্য ক্ল্যাসিকস আমাদের যেভাবে পড়ানো হয়েছিল তা মানসিক জিমন্যাষ্টিকসেরই সামিল। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিনা তা অবশ্যই অন্য কথা। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল শিক্ষণের এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি ইরাসমাস সমর্থন করতেন কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

যাই হোক, আলোচনার মূল সূত্র হল, ইরাসমাস এমন একটা সময়ে বর্তমান ছিলেন যখন জীবনের সত্যকে অর্জন করার সংগ্রামে সৃষ্টিশীল শিল্পীর অন্যতম প্রয়োজনীয় অস্ত্র ছিল ক্ল্যাসিকস সম্বন্ধে যথাযথ, সম্যক জ্ঞান। মধ্যযুগীয় একগুঁয়ে ও একচোখো মতবাদ ও অবোধগম্যতাকে জয় করার জন্য প্রয়োজন ছিল গ্রীস ও রোমের কাব্য ও চিন্তাভাবনার। মানসিক জিমন্যাষ্টিকস নয়, মানবাত্মাকে আয়ত্বাধীন বা নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল একমাত্র প্রশ্ন। মার্কসবাদ এবং আমাদের বর্তমান কাল সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আমাদের সময়ে, এই যুগে, মানুষের অগ্রগতির দর্শন, মানুষের 'একবিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি' আমাদের সাহায্য করছে সেই সব অন্ধমতাদর্শ ও দুর্বোধ্যতাবাদের বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম চালাতে, যা এখনও আধুনিক জগতের বেশ কিছু লোকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মার্কসবাদ ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সেই প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে যাওয়া যায়না, যা লেখকের মুখ্য বিষয়বস্তু।

একজন শিল্পীর মানসিক যন্ত্রাবলীর নিয়ন্ত্রাণাধীন ভূমিকার পক্ষে উপযুক্ত বহু ধরণের আকর্ষণীয় দর্শন রয়েছে। এখানে এই একাধিক দর্শনের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেবার কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনা। ইরাসমাসের জগৎ যেমন এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল তেমনি আমাদের পৃথিবীও ঐতিহাসিক সংগ্রামে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। এই সংগ্রামে মার্কসবাদ হল সেই শ্রেণীর দর্শন, যা প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের ওপর এক নতুন জগৎ গড়ে তোলার জন্য ইতিহাসের কাছ থেকে ডাক পেয়েছে যা সামন্ততন্ত্রকে নির্মূল করে মানবতাবাদ যে কাজ সাধন করেছিল, তার সামিল।

দি টাইমস এর লেখক প্রস্তাব রেখেছেন, মানসিক যন্ত্রবিশেষ হিসেবে ফর্ম

হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু মার্কসবাদ এইখানেই জোর দেয় যে ফর্ম বা কনটেন্ট কেউই পরস্পর থেকে পৃথক এবং নিষ্ক্রিয় কোন সত্তা নয়। ফর্মকে তৈরী করে কনটেন্ট। ফর্ম কনটেন্টের নামান্তর এবং তারই অংশবিশেষ। এবং যদিও প্রথমে উদ্ভব কনটেন্টের তবুও ফর্ম কনটেন্টের ওপর প্রতিক্রিয়া ফেলে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় থাকে না। আধুনিক লেখকের পক্ষে মার্কসবাদ শুধু একটা কুচকাওয়াজের সৌখীন পোশাক হতে পারে না। মার্কসবাদ তাঁর জীবনদর্শন, বাস্তবকে পরখ করার মাপ কাঠি; মার্কসবাদ তাঁকে সক্ষম করে 'সেই গভীরতম' জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করতে ও আকৃতি দিতে, যে জ্ঞান খুঁজে বেড়ায় অভিব্যক্তি। অবশ্যই মার্কসবাদই হবে লেখকের পক্ষে বাস্তব জগতকে উপলব্ধি করার ও জানার এক মাধ্যম।

এ অবশ্যই সত্য যে "চূড়ান্ত পর্যায়ে শিল্পের লক্ষ্য হল……… এমন এক বোধশক্তি জাগরুক করা, যা যাবতীয় ফর্ম ও যাবতীয় প্রচলিত মত বা ধারণাকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তাবৎ বিদ্যমান ফর্ম ও প্রচলিত মত বা ধ্যান ধারণাকে বা তাদের অংশবিশেষকে আক্ষরিক অর্থে বা দার্শনিক অর্থে নির্বাচনী মনোভাব নিয়ে অন্ধভাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সেই 'উপলব্ধি' আসতে পারেনা।

বাস্তবকে বুঝতে গেলে, জানতে গেলে সত্যানুসারী জ্ঞানের এক তত্ত্ব প্রয়োজন। এবং সত্য তো কোন বিমূর্ত, স্থবির এক ধারণা নয়, যাকে আবিষ্কার করতে হবে এক নিয়মমাফিক যৌক্তিক ও বিমূর্ত চিন্তা-প্রণালীর সাহায্যে, বা এমনকি, কোন এক বিশেষ মতানুযায়ী, ইনটুইশন বা সংজ্ঞার সাহায্যে।

একমাত্র বাস্তব ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। কেননা সত্য হল কোন বস্তুর জন্য মানুষের যে নিজস্ব, প্রগাঢ় অনুসন্ধান, তারই প্রকাশ। আর এই অনুসন্ধান হল সর্বাগ্রে এক মানবিক ক্রিয়াকলাপ, বিশেষ করে এক সামাজিক ও উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড।

অবশ্যই শিল্পীকে একাত্ম হতে হবে সত্যের সঙ্গে। লেনিন বলেছিলেন, "বাস্তবের একটি ঘটনার সমুদয় বৈশিষ্ট্য সমূহের এবং তাদের (পারস্পরিক) সম্পর্কের সামগ্রিকতা থেকেই উদ্ভব হয় সত্যের। আরও একটি কথা বলেছিলেন তিনি, যা প্রত্যেক শিল্পীর পক্ষেই জেনে রাখা আবশ্যিক—

"জ্ঞান হল বস্তু সম্বন্ধে চিন্তার শাশ্বত, অসীম এক দৃষ্টিভঙ্গি। মানবচিন্তায়

প্রকৃতি সম্পর্কিত অভিব্যক্তি অবশ্যই কোন 'মৃত' বা 'বিমূর্ত' উপায়ে, কোন গতিবিধিহীন বৈপরীত্যহীন ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এটা বুঝতে হবে শাশ্বত এক প্রক্রিয়ার গতিবিধি, দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও তাদের সমাধানের মধ্যে দিয়ে।

যে শিল্প এই দর্শন গ্রহণ করে তার পক্ষে নিশ্চয়ই সমুদয় ফর্ম ও প্রচলিত মতকে অধিগ্রহণ করতে সক্ষম এমন এক বোধশক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব। এ হল বস্তুত এক মানব শিল্প। এই কারণেই মার্কসবাদী সাহিত্যিকরা দাবী করেন এক সমাজতান্ত্রিক শিল্প বা একমাত্র এক নতুন বস্তুবাদই আজকের দিনে সেই সুসম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা প্রদানে সক্ষম যা সৃষ্টিশীল শিল্পীকে বাস্তবের সঙ্গে তাঁর তীব্র সংগ্রামে সফলকাম হতে সাহায্য করে।

উপন্যাস ও বাস্তব

এপিক বা মহাকাব্য এবং উপন্যাস এই দুয়ের মধ্যে প্রায়ই তুলনা করা হয়ে থাকে। আমাদের আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের মহাকাব্যিক শিল্পরূপ হল উপন্যাস ; এই সমাজের যৌবনাবস্থায় উপন্যাস তার গোটা রক্তমাংসের চেহারাটা পায় এবং আমাদের সময়ের বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি বা অবক্ষয় অবধারিতভাবে তার ওপর প্রতিক্রিয়া ফেলে। ফিল্ডিং তাঁর মহান ঐতিহাসিক গদ্যময় কবিতা টম জোন্‌স্‌ এর মুখবন্ধ আলোচনায় আধুনিক উপন্যাসের এপিক উত্তরাধিকার ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে যদিও 'ইউলিসিস' বা 'সোয়ান্‌স্‌ ওয়ে' ইত্যাদি উপন্যাসে আমরা আমাদের 'হেনরিয়াডে' বা 'ইডিল্‌স্‌ অব দ্য কিং' এর মূল মূর্চ্ছনা শুনতে পাই, তবুও একথাও অনস্বীকার্য যে আজকালকার দিনে সমালোচকেরা কেউই উপন্যাসের এই ক্রমবর্দ্ধমান ভিড়ের মধ্যে কোন এপিক ট্র্যাডিশন খুঁজতে যাবেন না।

এমনকি আমরা অবশ্যই বলতে পারি উপন্যাস বস্তুটি শুধু বুর্জোয়া সাহিত্যের সব চাইতে টিপিক্যাল সৃষ্টিই নয়, উপন্যাস হল বুর্জোয়া সাহিত্যের মহত্তম সৃষ্টি। উপন্যাস একটি নতুন শিল্প আঙ্গিক। রেনেসাঁর সঙ্গে সঙ্গে যে আধুনিক সভ্যতার আবির্ভাব, তার আগে খুব বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন কিছু অংশ ছাড়া উপন্যাস কোন নিটোল রূপ বা অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান ছিল না। এবং প্রত্যেকটি নতুন শিল্প আঙ্গিকের মত উপন্যাসও মানব চেতনাকে প্রসারিত ও গভীরসঞ্চারী করার দায়িত্ব পালন করেছে। কথা হল, আমাদের সভ্যতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি উপন্যাসেরও মৃত্যু ঘটবে ? যেরকম ভাবে প্রাচীন সমাজ ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মহাকাব্য ? কিন্তু মহাকাব্যের জন্ম শাঁস দ্য জেস্ত্‌ থেকে। যে সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল শাঁস দ্য জেস্ত্‌ বা অমর বীরগাথা, সেই সমাজ ভেঙে গেলে এই লোকগাথাও বিলুপ্ত হয়। এবং তখনই উপন্যাসের আগমন ঘটে। উপন্যাসের চলাফেরা তখন মহাকাব্যের প্রদর্শিত অলিগলিতেই। কিন্তু প্রথম থেকেই তার উদ্দেশ্য ছিল নব্য মানুষের প্রয়োজন মেটানো, তার কামনাবাসনাকে অভিব্যক্তি দেওয়া, মনুষের বিক্ষুব্ধ জগৎকে চিত্রিত করা। এরকমটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের নান্দনিক প্রকৃতি মহাকাব্যিক আঙ্গিকেই

সন্তুষ্টিজনক প্রকাশ খুঁজে নিতে চায়, বা দাবী করে। কিন্তু তাহলে অবধারিত ভাবে এসে যায় আরেকটি নতুন ও আধুনিক শিল্প আঙ্গিকের কথা। শব্দ ও রঙের অস্ত্রে সজ্জিত, সজীব ও প্রাণবন্ত, নবাগত সিনেমা কি আমাদের এই নতুন যুগের মহাকাব্য তৈরী করতে পারে না? অনেক দূর অব্দি সিনেমা এই কাজ করার ব্যাপারে সফল হতে পারে, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সে কাজ করা সিনেমার পক্ষে বোধহয় আদৌ সম্ভব নয় কেননা উপন্যাসের পক্ষে কোন চরিত্রের অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব,জ্বালা, যন্ত্রণা, তার মানসিক বিক্ষিপ্ত ঘাত প্রতিঘাত ইত্যাদি যতটা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ততটা সিনেমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সিনেমা মূলতঃ মানুষের অ্যাকশান বা হাঁটাচলা, ক্রিয়াকলাপের ওপরেই জোর দেয় বেশি। মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই জটিলতর, দ্বান্দ্বিক ও অন্তর্মুখী হয়ে পড়ায় উপন্যাসও ক্রমেই অ্যাকশনের ওপর থেকে তার নজর নিচ্ছে সরিয়ে। সাধারণ পাঠকের কাছে পাঠ্য উপন্যাস বা গল্পে অ্যাকসনের বা ঘটনাবাহুল্যের ভূমিকা কম নয়। নিছক অপরাধ প্রেম বা নিষ্ঠুরতাপ্রীতি ডিটেকটিভ উপন্যাসকে এত জনপ্রিয় করে তোলে না। খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে সাধারণ মানুষ এত উৎসাহ নিয়ে এইসব লেখা এত বেশি পরিমাণে পড়ে ওই একটি কারণে - তা হল ঘটনাবহুলতা। বলা যায় না, ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার শিখরে আসীন সিনেমার পরোক্ষ চ্যালেঞ্জে হয়তো উপন্যাসও ধীরে সুস্থে আবার ঘটনার বা অ্যাকশনের গুরুত্ব স্বীকার করে নেবে। কেননা সাহিত্যে এরও দরকার আছে।

এখন মহাকাব্য যেভাবে একটা সমাজের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে, সেইভাবে বা সেই অর্থে উপন্যাস কোনদিন হয়ে ওঠেওনি, উঠতে পারেও না। মহাকাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে তারা যে সমাজে বাস করত তার একটা ভারসাম্য ছিল। তারা ছিল পরস্পরের খুব কাছাকাছি। সেই সমাজ ও সেই নৈকট্য আজ অবলুপ্ত। বস্তুত ইলিয়াড যতটা না কোন চরিত্রভিত্তিক রচনা তার চাইতে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে এক সমাজচিত্র। এই সমাজে ব্যক্তি কখনও সমষ্টির থেকে নিজেকে পৃথক বা সমষ্টির প্রতি নিজেকে বিরূপভাবে দেখতে পারে না। সে এই সমাজেরই অঙ্গ, এবং সময়ে সময়ে সে প্রায় প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ, প্রকৃতির বশবর্তী সে। প্রকৃতি দ্বারা শাসিত। কিন্তু কখনই প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক বৈরীতার ও শত্রুতার সম্পর্ক নয়। শাঁস দ্য রোলাঁও দুই সমাজের সংঘাতের কাহিনী—ক্রিশ্চিয়ান ও প্যাগান; এবং অধিকাংশ চরিত্র যেমন শার্লামেন, রোঁলা, অলিভার, গানেলোন, বিশ্বাসঘাতক নাইট ইত্যাদি—এর ব্যক্তি চরিত্রের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে টাইপ (প্রতিনিধিমূলক

চরিত্র ; এদের এক একজন জ্ঞান, সাহস, আনুগত্য বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি কিছু না কিছুর প্রতিভূ।

গ্রেকো-রোমান সভ্যতাকেন্দ্রিক প্রাচীন সমাজব্যবস্থার এবং কেল্‌টিক সম্প্রদায়ের ভাঙন চলার সময় গড়ে ওঠে এই কাহিনী। প্রধানত এর উপজীব্য বিষয় হল ব্যক্তিমানুষের সুখদুঃখের কাহিনী, ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত জীবনালেখ্য। সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ আজ নেই, সেই কাহিনী বা গল্পগাথা আজ বিশ্বজনীন, যেমন হয়েছে দাফঁ এবং ক্লো, বা ট্রিস্টান এবং ইসোল্ট-এর কাহিনী।

উপন্যাসের নাড়াচাড়া ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে। সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের যে সংগ্রাম, উপন্যাস তারই মহাকাব্যিক রূপ। আর স্বভাবতই তা গড়ে উঠতে পারে একমাত্র সেই সমাজে যেখানে মানুষের ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের ভারসাম্য লুপ্ত হয়েছে, যেখানে একজন মানুষ অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে বা প্রকৃতির সঙ্গে এক অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত। এই ধরনের সমাজ হল ধনতান্ত্রিক সমাজ। পৃথিবীর অন্যতম দুই মহান সৃষ্টি হল 'ওডিসি' এবং 'রবিনশন ক্রুশো'। কিন্তু তাদের দুয়ের মধ্যে কি বিরাট ফারাক! ওডিসিয়ুসের বাস এমন এক সমাজে যার কোন ইতিহাস নেই। এই সমাজে মিথ বা পুরাণ এবং বাস্তব প্রায়শই এক এবং অভিন্ন। সময় এখানে আতঙ্কহীন। সমুদ্রতাড়িত ওডিসিয়ুস জানে যে তার ভাগ্য সেইসব দেবতাদের হাতে যারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কেননা সমুদ্রঝড় হল গ্রীক সমুদ্রদেবতা পসাইডনের রোষের প্রকাশ, আর ইথাকায় প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ পথে জাহাজডুবি হল দেবতাদের অসংখ্য পরীক্ষার অন্যতম।

রবিনসন ক্রুশোর ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। মার্ক্সের ভাষায়, "অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ব্যক্তিটি দুই শক্তির যৌথ ফলাফল। প্রথমত সে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবলুপ্তির সাক্ষী। আবার একই সঙ্গে সে দেখেছে উৎপাদনের নতুন শক্তিগুলিকে যা ষোড়শ শতাব্দী থেকে গড়ে উঠেছে দ্রুতবেগে। এই চরিত্রটি যার অস্তিত্বের মূল সেই অতীতে, সে একটি আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা ইতিহাসের ফলশ্রুতি হিসেবে নয়, আরেক ইতিহাসের সূচনা হিসেবে।" ওডিসিয়ুসের কোন ইতিহাস ছিল না। ওডিসিয়ুস পৃথিবীর শৈশবের সাক্ষী এবং সব দেবতারাই ছিলেন ওডিসিয়ুসের পরিচিত। রবিনসন অস্বীকার করেছিল অতীতকে এবং সে প্রস্তুত হয়েছিল তার নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরি করে নিতে। প্রকৃতি তার শত্রু হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। এবং রবিনসন সেই নতুন মানুষ যে প্রকৃতিকে,

তার শত্রুকে শাসন করতে বদ্ধপরিকর ছিল। রবিনসনের জগৎ বাস্তব জগৎ, এই জগৎ বস্তুগত পদার্থগুলিকে মূল্য দিতে মর্মস্পর্শী ও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমুদ্রের ঝড় এসেছে মূর্তিমান বিভীষিকার রূপে। তা বিপন্ন করে তুলেছে জাহাজ আর জাহাজের রসদ ও মালপত্রগুলিকে। মানুষরা হয়েছে হয় জলদস্যু নয় বিদ্রোহী। সহযাত্রীদের প্রতি তাদের পারস্পরিক আচরণ হয়েছে নিষ্ঠুর ও নির্দয়। কিন্তু এসব কিছুকে ছাপিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে রবিনসনের নিজের ওপর বিশ্বাস, তার অকপট আশাবাদ। নিজের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটা রবিনসনের বোকামি ছিল—একথা সত্যি। কিন্তু এই আশাবাদই তাকে নিজের বোকামি, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, সহযাত্রীদের নির্দয় শত্রুতা ইত্যাদি জয় করতে সাহায্য করেছিল এবং তাকে সাহায্য করেছিল সমুদ্রের অপর পাড়ে তার আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করতে।

নির্বাসিত অভিজাত রুশ ভদ্রলোককে সে নিজের গল্প শোনাল, "দ্বীপে আমার বসবাসের গল্প; আমি কি করে আমার অধঃস্তন লোকদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে পুরো ঝামেলাটার সঙ্গে এঁটে উঠি, তার গল্প, সেইটাই আমি পরে হুবহু লিখে রেখেছি। এই গল্পে তারা খুবই চমৎকৃত হয়, বিশেষ করে রাজকুমার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন যে, জীবনের যথার্থ মহত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে নিজেই নিজের অধিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক হবার মধ্যে।" ক্রুশো নিজের অধিকর্তা হতে পেরেছিল। তাই তার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা ইথাকায় প্রত্যাবর্তন এবং মিথ্যা পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শেষ হয়নি। তা শেষ হয়নি ধৈর্যশীলা পেনেলোপি এবং জ্ঞানী টেলিম্যাকাসের সাদর অভ্যর্থনার মধ্যে। এই যাত্রা সমাপ্ত হয়েছে—সাইবেরিয়ায় শেষ যাত্রা এবং এলবিতে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে।

"এখানে আমি এবং আমার সঙ্গী আমাদের মালপত্রের দারুণ বাজার পেয়ে গেলাম—সে চীনামাটির জিনিসপত্রেরও যেমন, সাইবেরিয়ার সেবলের লোম ইত্যাদিরও তেমন। যার ভাগ বাঁটোয়ারার পর দেখা গেল আমার ভাগে পড়েছে তিন হাজার চারশো পঁচাত্তর পাউণ্ড সতের শিলিং তিনপেন্স, আর তাছাড়াও বাংলা থেকে কেনা হীরে, যার দাম প্রায় ছয়শো পাউণ্ড।" ওডিসিয়ুসের মতই রবিনসনের জীবনও হল এক অদ্ভুত যাত্রার কাহিনী। আর ওডিসিয়ুসের যাত্রার মতই এ যাত্রাও শেষ হয়েছে "এক প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে, শান্তির মধ্য দিয়ে, আমাদের দিন শেষ করার আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে।" কিন্তু ওডিসিয়ুসের একমাত্র লক্ষ্য যেখানে ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে কেবলমাত্র স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন, সেখানে রবিনসনের বহির্মুখে যাত্রা তার গৃহে যাত্রার চাইতে অনেক বেশী

গুরুত্বপূর্ণ। রবিনসন এক সাম্রাজ্য স্রষ্টা, যে প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং শেষ অব্দি জয়ী হয়। শেষ তিন পেন্স অবধি তার লভ্যাংশের হিসেব মিলে যায় এবং তা কষ্টার্জিত, অতএব প্রশংসার্হ।

গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে রাষ্ট্র অর্থনীতির যে কোন বক্তৃতার ভিত্তিভূমি রাখা হয়েছিল রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী। বস্তুতই এখনও অব্দি এর প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনার মধ্যে। নতুন বুর্জোয়া-শ্রেণী তার এক মুখপাত্রকে খুঁজে পেল যে অলস নয়, এবং সেই মুখপাত্র যে সময় বা কালের প্রতিনিধিত্ব করল সেই কালও ঘটনাবহুল।

মানবজীবনের এক নতুন যুগের সূচনার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েছিল রবিনসন। পৃথিবীর তখন দু শতাব্দী সমকালের মধ্যে তার গোটা খোল নলচে বদলে নেবার সময় হয়েছে। মানুষের তখন সময় এসেছে তার প্রাচীন পূর্বপুরুষদের আকাশে ওড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রমৈত্রী সংস্থা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মোটামুটি সাত ভাগে পৃথিবীকে ভাগ করে ফেলার এবং ওপরের আকাশ আর নীচের সমুদ্রের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার। এইসব স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে মানুষ নিজেকেও পাল্টে ফেলল; ধ্বংস করল সে প্রাচীন এবং অভিজাত বা মহান সংস্কৃতি সমূহ; মানুষ এবং মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ককে সে নিন্দা করল তীব্রভাবে; মন-জীবনকে সে টেনে নামাল অনেক নীচে, এবং অবশ্যই তার চাইতে কয়লা বা জুতো পালিশের জীবন পেল অনেক বেশি গুরুত্ব; মানুষের জীবনের যথার্থ চরিত্রের ওপর এক স্থূল আবরণ পড়ল ভণ্ডামির; যা এর আগে কোন দিন পড়েনি।

ধনতান্ত্রিক সমাজ তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীকে এক আলাদা আসনে বসিয়ে দিল। পূর্ববর্তী যাবতীয় সামাজিক ব্যবস্থার কোনটিতেই শিল্পীর এই অবস্থান ছিলনা। এর প্রাথমিক স্তরে রেনেশাঁ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি পর্যন্ত এই অবস্থান এমন কিছু অবধারিত ছিলনা। তখনও অব্দি মানুষ যা, মানুষকে ঠিক সেইভাবেই দেখার স্বাধীনতা সাহিত্যিকের ছিল। সাহিত্যিক স্বেচ্ছায় মানুষের পূর্ণাবয়ব চিত্র অঙ্কনে ক্ষমতাশালী ছিলেন, এবং মধ্যযুগীয় অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে নিন্দা ও সমালোচনা করার ক্ষমতা অবধি ভোগ করতেন সাহিত্যিকরা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ধনতন্ত্র বাস্তববাদকে সৃষ্টি করেছিল, রূপ দিয়েছিল এক প্রণালী হিসেবে এবং উপন্যাসে বাস্তববাদকে তার সর্বোৎকৃষ্ট আঙ্গিকের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। ধনতন্ত্র মানুষকে বসিয়েছিল শিল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। অথচ এই ধনতন্ত্রই শেষে ধ্বংস করেছিল সেইসব

অবস্থা যার মধ্যে বাস্তববাদ সুসম্পূর্ণভাবে গঠিত হতে পারে। আর এই ধনতন্ত্রই মানুষকে শিল্পে, বিশেষত উপন্যাসে শেষ অব্দি এমনভাবে উপস্থাপিত করল যাতে মানুষ উপস্থিত হল এক নপুংসক ও বিকৃত রূপ নিয়ে। আঠারশো সাতান্ন সালে অশ্লীলতার দায়ে ফ্লবেয়ারকে দাঁড়াতে হয় বিচারালয়ে। থিওফাইল গতিয়ের সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "আমি আমার কাজের জন্য সত্যিই লজ্জিত! যে সামান্য অঙ্কের টাকা আমায় উপার্জন করতে হয়, আর তা করতে হয় অবশ্যই অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য, সেই টাকার বদলে আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এবং প্রকৃতই যা চিন্তা করি তার অর্ধেক বা, অনেক সময়, একচতুর্থাংশমাত্র বলার স্বাধীনতা পাই।...প্রকৃত চিন্তাভাবনার এত সামান্য এক অংশ বলার জন্যও কিন্তু আমার ভয় থাকে, যে কোন সময় আমাকে এর জন্য আদালতের কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।" জোনাথান ওয়াইল্ড থেকে ফ্লবেয়ারের বিচার এবং গ্যতিয়ের-এর কটু মন্তব্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক শতাব্দীর চাইতে কয়েক বছর বেশি মাত্র। কিন্তু এর মধ্যেই কত কি না ঘটে গেছে।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে একাধিক বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথমেই এসেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শ্রমবিভাজন। মানুষের ওপর মানুষের শোষণ বেড়েছে আশাতিরিক্ত ভাবে। তা থেকে অবধারিতভাবে প্রতিষ্টিত হয়েছে যন্ত্রশিল্পের একচেটিয়া আধিপত্য। দখলচ্যুত হয়েছে ব্যক্তিগত উৎপাদনকারী—সে কৃষকই হোক বা শ্রমিকই হোক। ধনতন্ত্রের এই বিকাশ এক দিকে সার্বিকভাবে শিল্পে এনে দিল এক অবক্ষয়। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের জীবন সম্পর্কিত স্বাধীনতা যে রেনেশাঁর মূলমন্ত্র, সেই রেনেশাঁর সমসাময়িক মহান শিল্প সৃষ্টি পরবর্তীকালে আর পাওয়া গেলনা। আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ক্রীতদাস সমাজের কিংবা প্রাচ্য সামন্ততান্ত্রিক চীনের অসাধারণ মহান শিল্পকীর্তিসমূহ। আরেকদিকে ধনতন্ত্রের আগমনে স্বয়ং শিল্পীর সম্মানহানি ঘটল। ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যেকার, আপাতদৃষ্টিতে সমাধানের একেবারেই অযোগ্য, সংঘাতে পিষ্ট হয়ে গেলেন শিল্পী।

মার্কস এবং এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ইস্‌তাহারে সাংস্কৃতিক জীবনের এই ক্রমাবনতির মূল কারণ উদ্ঘাটন করতে পূর্বতন সামাজিক সম্পর্কগুলিকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক সক্রিয়তা সম্বন্ধে বলেছেন:

"বুর্জোয়াজি যেখানেই জয়লাভ করেছে সেখানেই সে নির্মমভাবে যাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক এবং সহজ সরল মৌল সম্পর্কাবলীর ওপর সমাপ্তি টেনে এনেছে। যে বহুবর্ণ জমকালো বন্ধন মানুষ এবং তার প্রাকৃতিক বয়োজ্যেষ্ঠদের এক করে রেখেছিল তাকে নির্দয়ভাবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে এই বুর্জোয়াজি। আর শেষ অব্দি মানুষ ও মানুষের মধ্যে নগ্ন আত্মস্বার্থ এবং অন্ধ টাকার সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক বুর্জোয়াজি রাখতে দেয় নি।

"আত্মশ্লাঘাপূর্ণ হিসেবনিকেশ ও গণনার বরফ ঠাণ্ডা জলে এই বুর্জোয়াজি নিক্ষেপ করেছে ধর্মীয় অণুপ্রেরণার চরম স্বর্গীয় উচ্ছ্বাস, মধ্যযুগীয় বীরব্রত বা শিভ্যালরীর প্রাচুর্য এবং যাবতীয় বিষয়ী ভাবপ্রবণতার আধিক্যকে। ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা উৎকর্ষকে বুর্জোয়াজি এনে ঢেলেছে বিনিময় মূল্যের ছাঁচে এবং অসংখ্য অকাট্য সংরক্ষিত ও সম্মানিত স্বাধীনতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়েছে একমাত্র বিবেকবুদ্ধিবর্জিত স্বাধীনতার এক বিশাল মূর্তিকে—অবাধ বাণিজ্য। এক কথায় বলতে গেলে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মুখোশের আড়ালে সুচতুর শোষণ-ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে বুর্জোয়াজি এক নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ ও পাশবিক শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

"অর্থাৎ এতাবৎকাল অবধি সম্মানিত ও যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধাসঞ্চারী যা কিছু ছিল বুর্জোয়াজি তার স্বর্গীয় দ্যুতিকে নিঃপ্রভ ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবি, পুরোহিত, কবি, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি সবাইকে সে রূপান্তরিত করেছে পয়সার বিনিময়ে কাজ করা শ্রমিকে।"

সুতরাং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উৎপাদককে তাদের সম্পত্তির থেকে বঞ্চিত করে ধনতন্ত্র এক অত্যাশ্চর্য সমীকরণমূলক প্রণালীর উদ্ভাবন করেছে। এই একই সরলীকরণের ঢেউ এসেছে সাংস্কৃতিক সম্পর্কাবলীর মধ্যেও। যে ব্যক্তির শ্রম পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত তার পক্ষে নিজস্ব উৎপাদন থেকে কোনরকম নৈতিক বা কাল্পনিক মূল্য খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এবং যেহেতু পণ্যদ্রব্য বিনিয়োগ প্রথা যে কোন জিনিসকেই এক চোখে দেখে, সেহেতু শিল্পও হয়ে দাঁড়িয়েছে এক পণ্য-দ্রব্য, এবং শুধু তাই নয়, শিল্পকে তার একেবারে বিরোধী ও বিপরীতধর্মী বিষয়ের সঙ্গেও এক করে দেখা হচ্ছে। শোষণের সঙ্গে আঙ্গিকস্বরূপ দাসপ্রথা বা সার্ফ-প্রথার ওপর ভিত্তিশীল প্রাচীন অথবা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। একের ওপর অন্যের নির্ভরতা ছিল অনেক বেশি সরাসরি ও ব্যক্তিগত। শ্রমবিভাগ ছিল সরলীকৃত। এবং ব্যক্তি তার হাতের হস্তশিল্পের মাধ্যমে নিজেকে অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে অভিব্যক্ত করতে পারত।

সেই সমাজে শিল্পের মধ্যে এমন একটা সজীবতা ও প্রাণময়তা ছিল যা আজ অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত।

রাসকিন ও উইলিয়াম মরিস এটা বুঝেছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁরা একটা ভুলও করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বনিয়াদের একটা বৈপ্লবিক ধ্বংস সাধনের বদলে তাঁরা কল্পনা করেছিলেন, অতীত শিল্পের সেই সজীবতা ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ হল আবার এক কৃত্রিম মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন। মরিস অবশ্য মার্ক্সের প্রভাবে তাঁর জীবনের শেষদিকে এই ভুল থেকে সরে আসতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে নতুন ও নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র দেখা দিয়েছিল সে কথা উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টিধর্মী শিল্পীরা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। একই রকম গভীরতার সঙ্গে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন ধনতান্ত্রিক বাজার কিভাবে তাঁদের সবাইকে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে একই জমিতে। টাকার কাছে প্রত্যেকটি বস্তুই সমান হয়ে দাঁড়াল। পার্থক্য রইল না একজন মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে একজন কোটিপতির খরিদ করা বেশ চমকপ্রদ পরিমাণের একগাদা তেল বা সাবানের। শেক্সপীয়রের একটা নাটক যে জমিতে এসে দাঁড়াল সেই জমিতে একবিশেষ পরিমাণের ফসল উৎপাদক সারের গুরুত্বও একই হয়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকরা এই সরলীকরণে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নব্য বুর্জোয়াজির প্রতি চূড়ান্ত ও এককাট্টা ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে। কিন্তু এই একপেশে ও অন্ধ ঘৃণায় তাঁরা নতুন সমাজের যে কতকগুলো ভাল দিকও আছে সেটা দেখতে পেলেন না।

নতুন যুগের কোটিপতির আবির্ভাব এবং যে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে সে বিরাজ করছে, সেই সমাজে তার ভাবমূর্তি—এ সবই সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য। নব্য কোটিপতি আবার নিজেও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে যেন তেন প্রকারেণ সহায়তা করতে প্রস্তুত; কেননা তার কাছে নতুন এই ব্যবস্থা লাভজনক। আমাদের যুগের যথার্থ কবিতা ও আমাদের সময়ের বাস্তব নায়করা লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি এবং মাইকেল ফ্যারাডে, লুই পাস্তর, মাদাম কুরী প্রভৃতি নতুন পৃথিবীর আবিষ্কারকদের উৎসর্গীকৃত জীবনের মধ্যে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক এইদিকে দৃষ্টিপাত করতে অক্ষম। কেননা তিনি রীতিমত আঘাত পেয়েছেন বুর্জোয়া পৃথিবীর কাছ থেকে। কেননা তিনি আশাহত হয়েছেন, আঠারশো চল্লিশ সালে ফরাসী বিপ্লবের মহান স্বপ্নসমূহের মৃত্যু দেখে। কেননা

শ্রমজীবী মানুষের জীবন তাঁকে করেছে আতঙ্কিত। আঠেরশো সাতান্নতে লেখা গ্যাঁকুর্‌ ভ্রাতৃদ্বয়ের ডাইরীতে এই মানসিকতা পরিস্ফুট :

"এর আগে কোন শতাব্দী এত বড় প্রবঞ্চনা নিয়ে আসেনি, এমনকি বিজ্ঞানের জগতেও না। বছরের পর বছর ধরে রসায়ণবিদ ও পদার্থবিদরা আমাদের প্রত্যেকটি সকালেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা দেখানর, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নতুন কোন উপাদানের, নতুন কোন ধাতুর, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আমাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার অথবা এক আঙুলের তুড়িতে গোটা দুনিয়ার লোককে মেরে ফেলার, কিম্বা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আমাদের শতায়ু করে রাখার। এসব বিরাট এক ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই না। যাবতীয় প্রতিশ্রুতির মোট ফলাফল হিসেবে আমরা যা পেয়েছি তা হল বিভিন্ন নামধারী কিছু ইনষ্টিটিউট, কিছু সাজসজ্জা, কিছু ব্যক্তির পেনসন এবং অবশ্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির গুরুত্ব। এবং এর মধ্যে বেঁচে থাকার হার বাড়ছে, দ্বিগুণ, তিনগুণ, এক লাফে দশগুণ। ভরণপোষণ ও পুষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলো হয় হ্রাস পাচ্ছে দ্রুতগতিতে অথবা তাদের মান দারুণভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহে রাশি রাশি মৃত্যুতেও কিছু হচ্ছে না (সে ঘটনা তো সেবাস্তোপলই পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে) এবং কেই বা না জানে যে একটা ভাল ধরনের লাভজনক দরাদরি সময় বিশেষে খুবই ক্ষতিকর এক সমঝোতায় পরিণত হতে পারে!"

তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে—বৈজ্ঞানিকরা আজ অব্দি যা যা গবেষণা চালিয়েছেন, তাতে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে মৃত্যুসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা অনেক দুর এগিয়ে যেতে পারেন। এবং বর্তমানে তাঁদের কর্মযজ্ঞের এই নেতিবাচক দিকটিই ঔপন্যাসিককে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান যে জীবনকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা সত্যিই রাখে, বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কাজের মধ্যে যে কতকগুলো অদ্ভুত বৈপরীত্য থাকে, এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ যে এইসব ব্যাপারগুলোকে সুকৌশলে নিজের কাজে লাগায়—এই সব বিষয়গুলোকে ঔপন্যাসিক তাঁর শিল্পসৃষ্টির উপাদান হিসেবে ভীষণভাবে তাচ্ছিল্য করেন, যেমনটি করেছিলেন গ্যাঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়।

গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আমরা দেখতে পাই বাস্তব জগৎ শিল্পীর ওপর এমন কিছু মানদণ্ড জীবনধারা ইত্যাদি সজোরে চাপিয়ে দিচ্ছে বা আরোপ করছে ; শিল্পীর পক্ষে সেইসব মানদণ্ড গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। তাই তিনি সেই জগৎকে অস্বীকার করার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সব সময় ব্যস্ত। কেউ কেউ তা

করেছেন এক গজদন্ত মিনার নির্মাণ করে এবং তার ওপর থেকে কলাকৈবল্য-বাদের বেনামী ধ্বজা উড়িয়ে। এই অভূতপূর্ব যুদ্ধঘোষণা আসলে একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ এমন এক সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সভ্যতা শিল্পকে কোন মূল্যই দিতে চায় না। সেই সভ্যতা একমাত্র একটি বস্তুকেই যাবতীয় মূল্য দিয়ে থাকে। তা হল টাকা। 'শিল্প শিল্পের জন্য' এই ধ্বনিটি 'শিল্প টাকার জন্য' এই ধ্বনিটির বিরুদ্ধে এক অসার ও দুর্বল উত্তর স্বরূপ। দুর্বল, কেননা গজদন্ত আর যাই হোক, কোনদিনই দুর্গনির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত সামগ্রী হতে পারে না।

Gerard de nerval এর মত কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। অন্যরা মরীয়া হয়ে নিজের সৃষ্টিকেই অস্বীকার করে বসেছেন। প্যারী কমিউনের এক তরুণ কবি রিমব (·imbaud) বুর্জোয়াজীকে ঘৃণা করতেন মনপ্রাণ দিয়ে এবং কবিতায় তিনি বৈপ্লবিক সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে-ছিলেন। এই রিমব আবিসিনিয়াতে নিজেকে স্বেচ্ছায় জীবন্ত কবরস্থ করেছেন। এক বর্বর মানববিদ্বেষ নিয়ে তিনি মানবদেহ ও অস্ত্রাদির এবং আফ্রিকায় উৎপন্ন যাবতীয় দ্রব্যাদির এমন এক ব্যবসায়ে নেমেছেন যেগুলি বর্তমানে তাঁরই ঘৃণার পাত্র বুর্জোয়াজির লোভের বস্তু। গগ্যাঁ নির্বাসন বেছে নিয়েছেন তাহিতিতে, পলিনেশীয় আদিম সাম্যবাদীদের সংসর্গে থাকার জন্য। নিজের লতাপাতার ছাউনী তিনি সজ্জিত করেছেন মহান শিল্পকর্মে। সেজ্যান তাঁর সমাপ্ত কাজকর্ম নিক্ষেপ করেছেন এক গহ্বরে। ভ্যানগগ উন্মাদাগারে স্থান পেয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

তবুও ঠিক এইসময়েই তাঁদের বন্ধু ও সমর্থক এমিল জোলা, যিনি কিছুটা বিশৃঙ্খল হলেও একনিষ্ঠ প্রতিভাধর, তিনি কিন্তু ধ্যানগম্ভীর একাগ্রতার সঙ্গে সমাধান খুঁজেছেন। যত তিনি শ্রমজীবী মানুষের রুক্ষ, তিক্ত, অথচ আবেগপ্রবণ জীবনের কাছাকাছি হয়েছেন ততই অনুভব করেছেন যে ক্রমেই তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়ে উঠছে এক আগুন। তবু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা তাঁর পূর্বসূরী-দের ভ্রান্ত তত্ত্বসকল তাঁকে পীড়িত করেছে। এই সব তত্ত্ব থেকে তিনি ন্যাচারা-লিজম বা প্রকৃতিবাদের এক ক্ষতিকর এবং যান্ত্রিক মতবাদ গঠন করেন। তবু এই ব্যর্থতা মহান, কেননা এই ব্যর্থতা আমাদের অনেক কিছু শিখতে সাহায্য করেছে।

গোপন রহস্যটা ওখানেই ছিল, হাতের খুব কাছে। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, মহৎ শিল্পসৃষ্টি হবার মতো অবস্থাগুলিকে ধনতন্ত্র ধ্বংস করে ফেললেও কিভাবে ধনতন্ত্র একই সঙ্গে সেইসব অবস্থা তৈরি করে দেয়, যেখানে

শিল্প এমন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে যা মানব ইতিহাসে এর আগে লক্ষ্য করা যায় নি। তবু কিন্তু ধনতন্ত্র সেইসব অবস্থাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না, জন্ম দিতে পারে না নতুন শিল্পের। ইতিহাসে ধনতন্ত্রই প্রথম এক বিশ্বশিল্প বা বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হবার মত পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। ধনতন্ত্র গোটা দুনিয়াটাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ছাঁচে এনে ঢেলে ফেলেছে। তাবৎ কলাকৌশল এবং উৎপাদনব্যবস্থাকে ধনতন্ত্র এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে যেখানে সেই অর্থে প্রাচীনপন্থী এবং প্রগতিশীলদের অস্তিত্বের কোন কারণ নেই। কমিউ-নিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে আবার উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"উৎপাদনের ক্রমান্বয়ে বৈপ্লবীকরণ এবং সমস্ত রকম সামাজিক পরিবেশে যতিহীন গোলযোগসৃষ্টি, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অন্যান্য যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগকে পৃথক করেছে। ঝড়ের মুখে পাতার মত ভেসে গিয়েছে প্রাচীন ও শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কার ও মতামত সমেত যাবতীয় দৃঢ়বদ্ধ ও আন্ত-রিক সম্পর্কাবলী। নবগঠিত সংস্কার ও মতামত শিকড় গাড়বার আগেই পুরনো ও অকেজো হয়ে গেছে। যা কিছু দৃঢ় বা বলিষ্ঠ তা উবে গিয়েছে হাওয়ায়; যা কিছু পবিত্র তা হয়েছে কলুষিত। এবং মানুষ প্রগাঢ় ধৈর্য্য ও একনিষ্ঠতা সহকারে শেষ অব্দি বাধ্য হয়েছে তার জীবনের বাস্তব অবস্থা ও মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের মুখোমুখি দাঁড়াতে।

"উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য সদাপ্রসারণশীল বাজারের চাহিদা বুর্জোয়াজীকে গোটা পৃথিবী জুড়ে দৌড় করিয়েছে। নিজের আবাস তৈরি করতে বুর্জোয়াজীর দরকার পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জমি, প্রতি ইঞ্চি জমি দরকার তার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।

"বিশ্ববাজার শোষণের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াজি প্রত্যেক দেশেই উৎপাদন ও ভোগের ওপর এক বিশ্বজনীন চরিত্র আরোপ করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের চরম বিরক্তি উৎপাদন করে বুর্জোয়াজি শিল্পকে সরিয়ে এনেছে শিল্পের পায়ের নীচেকার জাতীয় ভিত্তিভূমি থেকে। সমস্ত প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে। সেই জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে এমন সব নতুন শিল্প যাদের উদ্ভব যাবতীয় সভ্য জাতির পক্ষে জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইসব শিল্প স্বদেশী কাঁচা মাল উৎপাদনে উৎসাহ দেয় না। কাঁচা মাল আনা হয় দূরদূরান্তের অঞ্চল ও এলাকা থেকে। এই সব শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যাদি কেবল মাত্র গৃহেই ভোগ করা হয়না। এর ব্যবহার গোটা পৃথিবী জুড়ে। পুরনো দিনে অভাব বা চাহিদা মেটানো হত স্বদেশজাত দ্রব্য দিয়ে। অধুনা তার পরিবর্তে

নিত্যনতুন চাহিদা মেটানর জন্য দূরদূরান্তের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন, আঞ্চলিক ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মনির্ভরতার স্থানে এখন প্রয়োজন প্রতিনিয়ত আদানপ্রদান, পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এই কথা বস্তুগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, বুদ্ধিগত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তেমন সত্য। পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দেশের বুদ্ধিগত সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াচ্ছে সর্বসাধারণের সম্পত্তি। জাতীয় এক-পাক্ষিকতা এবং সঙ্কীর্ণতা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে, এবং অসংখ্য জাতীয় ও আঞ্চলিক সাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক বিশ্বসাহিত্য।"

কিন্তু এই বিশ্বসাহিত্য অপুষ্টিরোগাক্রান্ত শিশুর মতো। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা এই সাহিত্যের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিলেও জন্মের প্রথম ক্ষণটি থেকেই ধনতন্ত্র সর্বোতোভাবে চেষ্টা করে এই সাহিত্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করতে। জাতিগত এবং জাতীয় ঘৃণাবিদ্বেষ, শ্রেণীশত্রুতা, শক্তিশালী দেশ কর্তৃক দুর্বলতর দেশের জাতীয় বিকাশে বলপূর্ব্বক বাধাপ্রদান, এমন কি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যৌন সম্পর্কজাত তিক্ততা, শহর ও গ্রামের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ, মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব যা হল দ্রব্যের ব্যাপক ও সার্বিক উৎপাদনের ফল—এই সমস্ত ব্যাপারের উদ্ভব ঘটেছে ধনতান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য থেকে। এবং বিশ্বসাহিত্যের সুষ্ঠু ও সুস্থ বিকাশকে এরাই করে রেখেছে শৃঙ্খলিত। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে ঔপন্যাসিকের যাবতীয় অসুবিধা ও প্রতিকূলতার সমাধান হচ্ছে এক বৈপ্লবিক সমাধান, যে সমাধান তাঁর শিল্প-মাধ্যমের মধ্যে বাস্তবের মহাকাব্যিক চরিত্রটি জাগ্রত করতে পারে। একমাত্র এই বৈপ্লবিক সমাধানই পারে আমাদের আধুনিক সমাজের খাঁটি চরিত্রটি অনুধাবন করতে।

মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাস

এই আলোচনার মূল বক্তব্য হল এই যে, উপন্যাস হল বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সভ্যতার তরফ থেকে পৃথিবীর কল্পনাভিত্তিক সংস্কৃতিকে প্রদত্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপহার। উপন্যাস হল এই সভ্যতার সব চাইতে আকর্ষণীয় অভিযান ; মানুষকে আবিষ্কার। প্রশ্ন উঠতে পারে, ধনতন্ত্র তো আমাদের চলচ্চিত্রও দিয়েছে। একথা সত্যি, কিন্তু সত্যি কেবলমাত্র এক কারিগরী অর্থে। কেননা চলচ্চিত্রকে একটা সার্থক শিল্প হিসেবে বিকশিত করতে ধনতন্ত্র আজ অব্দি সফল হয়নি। নাটক, সঙ্গীত, অঙ্কন, ভাস্কর্য—এই সবকিছুর বিকাশের মূলেই আছে আমাদের আধুনিক সমাজ, সে বিকাশ ভালর দিকেই হোক বা খারাপের দিকেই হোক। কিন্তু শিল্পের এই সব কয়টি শাখাই এক সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে বিকাশলাভ করছে বহুদিন ধরে, প্রায় সভ্যতার বিকাশের সময় থেকেই শিল্পের এই সব শাখার প্রধান সমস্যাগুলিরও তাই সমাধান হয়ে গেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি সমস্যা, সম্ভবতঃ সবচাইতে সহজ সমস্যাটির অর্থাৎ গল্প বলার সমস্যাটির সমাধান হয়েছে এতদিনে।

এসত্ত্বেও ঔপন্যাসিকরা যখন শুরু করেন তখন যে কিছুই ছিল না তা তো নয়। তাঁদের কিছু সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ছিল, যে অভিজ্ঞতা এমনকি আজও আমরা কাজে লাগাতে পারি। মধ্যযুগের শেষদিকে ইটালী ও ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলি প্রথম আধুনিক ধারার গল্প বলিয়েদের সৃষ্টি করেছিল। এতে নরনারীর চরিত্রগুলির বাস্তব আচার আচরণ চলাফেরা ইত্যাদির সঙ্গে গল্পে কথিত চরিত্রের খুব একটা ফারাক থাকত না। চসার এবং বোক্কাচিও প্রথম দেখালেন ঔপন্যাসিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল নরনারী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য। ম্যালরির মধ্যেও এই ব্যাপারটা কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনি লিখতে শুরু করেছেন চসারের প্রায় এক শতাব্দী পরে। এবং যদিও তাঁর লেখার মাধ্যম ছিল গদ্য, কিন্তু তাঁর লেখা পড়লে অনেকেরই মনে হয় তাঁর স্থান কবিদের সারিরও শেষ প্রান্তে। একথা সত্যি যে তিনি যদিও অবক্ষয়ের নৈরাজ্যে পরিপূর্ণ এক সমাজে লিখেছেন, তবুও প্যাস্টনের চিঠিপত্রে ম্যালরির চাইতে অনেক বেশি বাস্তব এবং সত্যানুগ চরিত্রচিত্রণ, এবং অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ভাল গদ্যও পাওয়া যায়।

ম্যালরি অঙ্কিত নাইট এবং লেডীদের চরিত্রে, তাঁর রাউণ্ড টেবিল এবং রহস্যময় গ্রেল-এ, তাঁর অঙ্কিত যাবতীয় যুদ্ধসংঘর্ষ রক্তপাত, এবং খিস্তিখেউড়ে পাওয়া যায় বুর্জোয়া সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকর রূপ, রোম্যানটিসিজমের যাবতীয় উপাদানসমূহ। স্কট বা শাঁতোব্রা অপেক্ষা ম্যালরি কোনমতেই বেশিমাত্রায় মধ্যযুগীয় নন। তিনি স্কটের চাইতে কোন অংশে নিম্নমানের গল্প বলিয়ে নন। তাঁর আবেগপ্রবণতা অতি ক্বচিৎ শাঁতোব্রার আবেগপ্রবণতার মত একঘেয়ে হয়। কিন্তু ম্যালরিই হলেন প্রথম এবং অন্যতম এক পলায়নপর মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রতিভা। ভয়াবহ এবং বিরক্তিকর বর্তমান থেকে তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছেন অতীতে, যে অতীত মহান আদর্শময়। বাস্তবতাকে তিনি পরিহার করেছেন, অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে তার কাছে বাস্তবতা বিষয়টির কোন দিনই গুরুত্ব ছিল না। চসার আদৌ নাও থাকতে পারতেন, আর ম্যালরি যদি আদৌ কোনদিন ক্যান্টারবেরি টেলস পড়ে থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তাকে গ্রাম্য ও অশ্লীল আখ্যা দিয়েছেন। এক অর্থে ইউফিউইস আর আর্কাডিয়া তাঁর রোম্যান্টিক ট্র্যাডিশনেরই অংশ, যা ছিল ফেয়ারী কুইন। কবিতার যাবতীয় গুণাবলী এই লেখাগুলিতে বর্তমান, এমনকি কল্পনানির্ভর গদ্যেরও। কিন্তু ইংরেজ কল্পনাকে উপন্যাসে গড়ে ওঠার পথে এরা বাধাদান করেছে। সম্ভবত এতে তেমন কিছু এসে যায়নি। তদানীন্তনকালে নাট্যকাব্য ইংরেজ প্রতিভার বৃহৎ অংশকে আকৃষ্ট করেছিল। আর এলিজাবেথীয় যুগে ইউফিউইস ট্র্যাডিশনকে অস্বীকার করে বেশ কিছু গৌরবময় শুঁড়িখানাকেন্দ্রিক ও দুর্বৃত্তজীবনকেন্দ্রিক গল্প জন্ম নিলেও তারা উল্লেখযোগ্যভাবে কোনদিনই উপন্যাসকে ত্বরান্বিত করেনি।

সপ্তদশ শতাব্দীও জন্ম দিতে পারেনি সার্থক উপন্যাসের। কিন্তু এখানে একটা বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়োজন আছে মনে করি। এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর আত্মজীবনীতে এক জায়গায় অভূতপূর্ব গভীরতার সঙ্গে আত্মসমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সর্বাঙ্গীন চরিত্রাধ্যয়ণ একটি প্রাপ্তবয়স্ক কাজ, দার্শনিকও বটে। সুদীর্ঘ স্ফীত বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে এবং সাধারণভাবে গোটা পৃথিবীটাকে দেখতে দেখতে আমার জীবনের এত সময় চলে গিয়েছে যে এই গোটা নিয়মটার মধ্যে চরিত্র পর্যবেক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে অনেক সময় নিয়েছে—তা শুরু হয়েছে আমার জীবনের প্রায় শেষদিকে। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এরকম একটা কাঠামো তখন আমার তৈরি করা দরকার হয়ে পড়েছিল। এবং তা হয়েছিল ব্যক্তির সমস্যাবলী সেই কাঠামোতে আদৌ খাপ খাবে কিনা সেটা বুঝতে পারার আগেই।

একথা সত্যি যে উপন্যাস লেখাটা একটা দর্শনসম্মত কাজ। পৃথিবীর সব কয়টি মহান উপন্যাস, 'ডনকুইক্সোট', 'গারগান্টুয়া অ্যাণ্ড প্যান্টাগ্রুয়েল', 'রবিনসন ক্রুশো', 'জোনাথান ওয়াইল্ড', 'জ্যাকুয়েস লা ফাতালিস্ত', 'লা রোগ অলা ন্যর', 'ওয়র অ্যাণ্ড পিস', 'লা এডুকেশন সেঁতিমেঁতল', 'উদারিং হাইট্‌স্', 'দি ওয়ে অব অল ফ্লেশ'—এই সব কয়টি উপন্যাসই মহান, আর তার কারণ একটাই—চিন্তার সেই উৎকর্ষ কাজ করেছে এদের সবার মধ্যে। এর মধ্যে প্রত্যেকটি রচনাই প্রমাণ করেছে দৃঢ়সংহত কল্পনা কতদূর যেতে পারে। এই উপন্যাসগুলি জীবনের ওপর স্থাপন করেছে অসম্ভব রকম অনুপ্রাণিত মতামত। এখানেই উপন্যাসের জগতে প্রথম সারির রচনা থেকে দ্বিতীয় সারির রচনার তফাৎ। এ কথা অবশ্যই সত্য যে অনেক দার্শনিকই উপন্যাস লিখতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

কিন্তু সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে সাধারণীকরণ করার (generalization) ক্ষমতা না থাকলে, আজ অব্দি কোন ঔপন্যাসিক কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি এবং এই সাধারণীকরণ করার ক্ষমতা জীবন সম্বন্ধে একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জন্মায়।

সপ্তদশ শতাব্দী কোন মহৎ উপন্যাসের জন্ম দেয়নি। কিন্তু এই শতাব্দী জন্ম দিয়েছে এমন কিছু দার্শনিকের যাঁরা পরবর্তী শতাব্দীর একাধিক জয়যাত্রা ত্বরান্বিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরাজী উপন্যাসের উৎকর্ষের চূড়ান্ত পর্যায় একথা না স্বীকার করে উপায় নেই, কেননা ইংরেজী দর্শনের চূড়ান্ত উৎকর্ষর পর্যায়ের অব্যবহিত পরেই এর আগমন। ইংরেজী দর্শন ছিল আমাদের দেশে বুর্জোয়া বিপ্লবের সৃষ্টি, এবং তা ছিল গভীরভাবে বস্তুতান্ত্রিক। মার্কসের কথায় —"বস্তুবাদ একান্ত ভাবেই গ্রেট ব্রিটেনের সন্তান। ইংরেজ দার্শনিক ডানস স্কোটাস জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বস্তু চিন্তা করতে পারি কি না'।" প্রথম ইংরেজ ভাববাদী বার্কলি লকের অনুভূতিনির্ভর দর্শন সেনস্যুয়ালিজমেরই বিপরীত দিকটি দেখিয়েছিলেন। আর স্টার্ন কেবলমাত্র রাবেলাঁর বস্তুবাদ এবং সার্ভান্তেঁর কল্পনাশক্তিকে জারিয়ে নিয়েছিলেন অনুভূতিপ্রবণতার রসে।

উপন্যাসের আসল প্রতিষ্ঠাতা রাবেলাঁ ও সার্ভান্তে তাঁদের উত্তরসূরীদের থেকে অনেক বেশি সৌভাগ্যবান ছিলেন। কেননা যে নতুন যুগের অগ্রদূত হয়ে তাঁরা এসেছিলেন, সেই যুগে তাঁদের বেঁচে থাকতে হয়নি। তাঁরা ছিলেন এক যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ ; তাঁরা ছিলেন এক বৈপ্লবিক ঝড়ের সন্তান, যে ঝড় ভেঙে ফেলেছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র। তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একাধিক নতুন

ধারণা ও মননের দ্বারা ; অর্থাৎ তাঁরা এসেছিলেন মানবেতিহাসের সম্ভবতঃ সব চাইতে উত্তেজনাকর পুনর্জন্মের সময়।

জীবনের অদম্য শক্তি, কল্পনার গতি এবং ভাষার স্বচ্ছলতার জন্য তাঁদের দুটি উপন্যাস আজ অব্দি উৎকৃষ্টতার তর্কাতীত স্তরে। তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন দুই পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে। পুরোন পৃথিবীর যাবতীয় দোষগুলোকে তাঁরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নগ্ন আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কোনমতেই তাঁরা বিনা সমালোচনায় নতুনকে গ্রহণ করেননি। একই কথা শেক্সপীয়র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। প্রযোজ্য রেনেশাঁর তাবৎ মহান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই। নতুন পৃথিবীর উন্মীলন মানুষকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু মানুষ সেই নতুন জগতের সমালোচনা করতেও বিরত থাকেনি। এই পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করতে গিয়ে মানুষ যে উচ্চতায় বিরাজ করেছিল, রেনেশাঁর পর থেকে সেই উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে। রাবেলাঁ জীবনের সেই মর্মন্তুদ, অনুসন্ধিৎসু এবং তা সত্ত্বেও আনন্দদায়ক যন্ত্র, মানবদেহের স্বাধীনতা দাবী করেছেন। এবং সেই দেহাভ্যন্তরস্থিত মনকে যুদ্ধংদেহি মনোভাবে আহ্বান করেছেন। জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করেছে তখন মানব মন। সেই মনকে বলেছেন তিনি, "তোমার যা ইচ্ছে হয় তুমি তাই করো!" চিন্তার জগতে তিনি যে বিপ্লব এনেছিলেন, তার চাইতে কোন অংশে কম বিস্ময়কর নয় সেই বিপ্লব, যা তিনি এনেছিলেন ভাষার জগতে। ফরাসী ভাষার যে কোন ইতিহাসনির্ভর ব্যাকরণ একথা প্রমাণ করবে। এখানেও একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত—তা হল, ভাষায় বৈপ্লবীকরণে লেখকের বিশাল গুরুত্ব। রেনেশাঁর পর ফরাসী ভাষায় আবার একবার জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ এনেছিল মহান বিপ্লবের মানসপুত্র রোম্যাণ্টিক আন্দোলন। ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধেও মোটামুটিভাবে এই একই কথা প্রযোজ্য।

সার্ভান্তেঁর কাজের মধ্যে বৈপ্লবিক চরিত্র যতটা না উচ্চারিত তার চাইতে অনেক বেশি অন্তর্নিহিত। বহির্জগতের সঙ্গে কুইক্সোট এবং সাঙ্কো পাঞ্জার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর জীবনদর্শনের নাটক। এদিক দিয়ে রাবেলাঁর থেকে তাঁর উপন্যাস একপা এগিয়ে। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সম্ভাব্য অস্ত্র শানিয়ে তৈরি করে রেখে গিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন উত্তরসূরীদের। রাবেলাঁ ঔপন্যাসিককে দিয়ে গিয়েছেন রসবোধ এবং ভাষার কাব্যময়তা ; সার্ভান্তেঁ দিয়েছেন বিদ্রূপ, ব্যাজস্তুতি এবং অনুভূতির কাব্যময়তা। এই দুজন ছিলেন বিশ্বজনীন প্রতিভা।

তাঁদের পর আর কোন উপন্যাসই তুলনীয় বলিষ্ঠতা ও বর্ণাঢ্যতা নিয়ে হাজির হয়নি।

একথা মনে রাখা উচিত, তাঁরা দুজনেই ছিলেন কর্মঠ ঔপন্যাসিক, তাঁরা দুজনেই ভোগ করেছেন নির্যাতন। এবং মিস্টার ডেভিট গার্নেট যদি তাঁদের কাছে "খাঁটি শিল্পী" সম্বন্ধে কিছু বলতে পারতেন তাহলে তাঁরা বক্তব্য বিষয় কতটা বুঝতে পারতেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। শেষ অব্দি যদি তাঁরা এই অদ্ভুত এবং স্ববিরোধী মতবাদের অর্থ বুঝতেনও, তাহলে তাঁবা নিঃসন্দেহে এইমত গ্রহণ করতেন নিজেদের মত করে। এবং অবধারিত ভাবে এই অদ্ভুত বিকৃত ধারণার বোঝা থেকে নিজেদের মুক্ত করতেন। একজন করতেন রীতিমত অশালীনভাবে ও আনন্দের সঙ্গে। আরেকজন করতেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাহায্যে।

নতুন সমাজের মহাকাব্য রচয়িতাদের বা ঔপন্যাসিকদের, অতএব, এ মহান উত্তরাধিকার ছিল, যার সাহায্য তাঁরা নিতে পারতেন। তাঁদের কর্তব্যের থেকে তাঁরা কি করে খালাস পেয়েছিলেন? আমাদের নিজেদের দেশে, অর্ধশতাব্দী বা তারও বেশি কাল ধরে তাঁরা কিন্তু যেতে পারেন নি সেই উচ্চতায় যে উচ্চতায় বিরাজ করেছেন ফরাসী এবং স্পেনদেশীয় মহারথীরা। উপন্যাস ছিল এক অস্ত্রের মত। অস্ত্র মানে রাজনৈতিক প্রচারপত্রের কথা বলা হচ্ছেনা। কিন্তু উপন্যাস তার জন্মক্ষণে এবং দ্রুতগতিতে নবকলেবর লাভ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সময়ে এই অস্ত্রটির সাহায্যেই বুর্জোয়াজির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম কল্পনাশক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মাপজোক করেছিলেন নতুন মানুষকে নতুন নারীকে এবং সেই নতুন সমাজকে যে সমাজে এই নতুন নরনারীর অবস্থান। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদের সম্বন্ধে এইটি হল সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষের কাছ থেকে তাঁরা সঙ্কুচিত হয়ে সরে যাননি, তাঁরা আস্থা রেখেছিলেন মানুষের ওপর। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মানুষই পৃথিবীর অধীশ্বর হবার ক্ষমতা রাখে। আবার একই সঙ্গে যে পৃথিবী সময় বিশেষে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর এবং অন্যায় নীতি সম্পন্ন, সেই পৃথিবীর সম্বন্ধেও তাঁরা ছিলেন সচেতন।

ফিল্ডিং তাঁর উপন্যাসে নৈতিক উপদেশাবলি যোগ করেছিলেন বলে তাঁকে দোষ দেওয়া হয়। কিন্তু উপদেশগুলি বাদ দেওয়া হলে, তাঁর লেখাতে অন্তর্নিহিত থাকত সমাজ সমালোচনা; আর শুধু তাই নয়, তাহলে ইংরেজী ভাষায় লিখিত বেশ কিছু ভাল প্রবন্ধ আমরা হারাতাম। প্রবন্ধর কথা বাদ দেওয়াই ভাল। দুঃখজনক সত্যি কথাটা হল এই যে ফ্লবেয়ার এবং গ্যঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের আগে থেকেও, হেনরী জেমসের কথা না হয় নাই বলা হল, ফিল্ডিং

সত্যই জানতেন না যে মার্জিত সংস্কৃত সমাজে উপন্যাস লিখতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। তিনি ছিলেন প্রথম ইংরেজ যিনি বুঝেছিলেন ঔপন্যাসিকের কাজ হল জীবনকে বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত করা। এই কথাই তিনি নিজের মত করে বলেছিলেন। এই কথা তিনি "জোনাথান ওয়াইল্ডে" বলেছিলেন, এবং এর আগে এই কথা কখনো এরকমভাবে বলা হয়নি। এমনকি সুইফটও একথা বলতে চেষ্টা করে সফল হননি। তাঁর ছিল দুর্ধর্ষ এবং বন্য রাগ। এই রাগ ছিল মানবোচিত এবং তা এসেছিল মানব জীবনের ক্রমাবনতি দেখে।

"দি ইংলিশ নভেলিস্টস" নামে একটি প্রবন্ধে মিস্টার ডেভিড গার্নেট ফিল্ডিংকে সমালোচনা করেছেন। দুঃখদুর্দশা সহ্য করার ব্যাপারে ফিল্ডিং-এর যে নিষ্ঠুর মনোভাব, তার মধ্যে কল্পনাশক্তির কিছুটা অভাব বোধ করা যায়, মুখ্যতঃ এই ছিল গার্নেটের বক্তব্য। মানব হৃদয়ের কিছু একান্ত গভীরতার কথা তাঁর লেখায় অনেক সময়ই পাওয়া যায়না, একথা সত্যি। তিনি লেখক হিসেবে যতটা না ভাববাদী ছিলেন তার চাইতে বেশি বস্তুবাদী। তবে এই সীমাবদ্ধতা যদি তাঁর পর্যবেক্ষণের পথে কোন বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে একথাও অত্যন্ত বিনীতভাবে বলা চলে যে রিচার্ডসন, স্টার্ণ বা রুশোর মত ভাববাদীরা বাস্তব-জগত পরিহার করে সম্ভবত তার চাইতেও বেশি কিছু হারিয়েছেন। এবং হয়তো বেশি আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন তাঁদের দৃষ্টি।

তবে ফিল্ডিং এর সমালোচনা করতে গিয়ে বর্বরতার প্রসঙ্গ এনে ফেলাটা অন্যায় এবং অবাস্তবও বটে। যে পৃথিবীতে তাঁর বাস, সেই পৃথিবী ছিল নিষ্ঠুর সর্বজয়ী ধনতন্ত্রের পৃথিবী। সেই সময়টা ছিল ইংরেজ স্কোয়ারের হাতে ইংরেজ কৃষকদের নিষ্পিষ্ট হবার সময়। তখন ইংরেজ অ্যাডভেঞ্চারারদের ইণ্ডিজের ধনসম্পদ অপহরণের সময়। সেই অপহরণের কৌশল যেমন ভয়াবহ ঠিক তেমনই অসৎ। ফিল্ডিংয়ের আগমন এমন এক সময়ে যখন ক্রমাগত চলেছে সেই অপহৃত সম্পদ সঞ্চয়, যখন সেই সঞ্চয়কারী দেশ এগিয়ে চলেছে শিল্প বিপ্লবের পথে। প্রাচ্যের চেঙ্গিজ খানের ইংরেজ প্রতিমূর্তি, এক অদ্ভুত প্রতিভা ওয়ারেন হেস্টিংসের আবির্ভাব ফিল্ডিংয়ের সময়ে। ওয়ালপোল তখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন। জোনাথান ওয়াইল্ডের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তৎকালীন ঘুণধরা, দস্যুসুলভমনোবৃত্তিসম্পন্ন সময়ের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি। তা সত্ত্বেও ফিল্ডিংকে বর্বরোচিত বলা মানে "লেডি ইনটু ফক্সের" লেখককে তাঁর সময়কার বাস্তব জীবনের প্রতি অনুভবহীন বলার সামিল।

বরং স্মরণীয় যে, "বর্বর" ফিল্ডিং তৎকালীন ইংলণ্ডের বর্বরোচিত বিচার ব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনিই সম্ভবত প্রথম একটা পরিকল্পনা ছকেছিলেন সুসভ্য পুলিশী শক্তির জন্য, জনসাধারণ যাদের ভীতি এবং ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে প্রায়ই এক দ্বৈতভাব কাজ করেছে যা কেবল আশ্চর্যের ব্যাপারই নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে। ডিফো, ফিল্ডিং আর স্মলেটকে জুড়ে দেওয়া হয় পৃথিবীর পুরোপুরি বস্তুগত এক চিত্রের সঙ্গে। 'অন্তর্মুখী জীবন' বলতে আমরা যা বুঝি, তা এঁদের সৃষ্ট চরিত্রে প্রায় একেবারেই নেই, কিংবা থাকলেও খুবই যৎসামান্য। এবং এইসব লেখকরা অনুভূতি বা উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে সময় নষ্ট করেননি, কেননা 'কেন'র চাইতে 'কি করে' এই প্রশ্নই তাঁদের বেশি আলোড়িত করেছিল। তার মানে অবশ্য বিশ্লেষণ একেবারেই নেই তা নয়। এই ধারণা অনেক সুদূর প্রসারী। এক একটা চরিত্র কেন এক এক রকম ভাবে ক্রিয়া করছে তা পাঠকের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার থাকে, যেহেতু যে সব চরিত্র আচার আচরণ করছে তারা আমাদের পরিচিত। যেমন, মলফ্ল্যাণ্ডার্স যখন চুরি করে আনা শিশুটিকে হত্যা করল না, তখন পরিষ্কার বুঝে নেওয়া যায় কেন সে হত্যা করলনা। কেননা তার আগের থেকেই মলের চরিত্রকে আমরা জানতে শুরু করেছি। ডিফোকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা হল মলের এই চৌর্যবৃত্তিপ্রীতি এবং একই সাথে শিশু হত্যায় অনীহা। নিছক "কেন" নামক প্রশ্নের চাইতে এই গোটা ব্যাপারটাই তো অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণকারী। অবশ্য দস্তয়েভস্কি এই তুচ্ছ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের একটি উপন্যাস দিতে পারতেন—একটি বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস, যার গোটা অংশ জুড়ে থাকত একটিই প্রশ্ন—"কেন"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উপন্যাস জন্ম নেয়। যার মধ্যে একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্য ও অনুভূতিই প্রাধান্য পায়। সাধারণ সমাজ চিত্রণ এককরম পুরোপুরিভাবেই অবহেলিত হতে শুরু করে! ব্যক্তিমানুষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সদর্থক ঘোষণা রবিসন ক্রুশো। কিন্তু সে এমন ব্যক্তি যার অবস্থান তার নিজের বাইরে। এক অর্থে সে নতুন পৃথিবীর অধিবাসীর প্রতীক। কিন্তু আরেক অর্থে সে তা নয়। ক্রুশো আবিষ্কার করেছিল যে কেবলমাত্র সেই পারে দুনিয়া জয় করতে। স্টার্ণ এবং রুশো আবিষ্কার করেছিলেন ব্যক্তি মানুষই হল পৃথিবী। বার্কলি যখন লকের অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) ভ্রান্ত প্রমাণ করে নিজস্ব ভাববাদী আদর্শের দর্শন এনে উপস্থিত করলেন, যা আমাদের নিজস্ব সচেতনতার

বাইরে অন্য কোন বাস্তবকে স্বীকার করেনা, তখন দর্শনের জগতেও এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটল। যে কোন চরিত্রই যে নিজস্ব সচেতনতার কেন্দ্র-বিন্দু থেকে শুরু করে বাইরের পথে পা বাড়াচ্ছে, উপন্যাসে এটা ছিল খুবই বৈপ্লবিক ও সুদূর প্রসারী এক ধারণাবিশেষ। এই ধারণার অব্যবহিত যৌক্তিক উপসংহার খুঁজে পাওয়া যায় যখন Restif de Bretonne তাঁর আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস "মঁসিয়ে নিকোলাস" উৎসর্গ করেন নিজেকেই। কিন্তু সময়ে সময়ে এই নব্য ধারণা হাস্যকর এবং শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটির পক্ষেই ক্ষতিকর হলেও নতুন এই ধারারও মাহাত্ম্য ছিল।

বস্তুত বাস্তব সম্পর্কে ফিল্ডিং বা রিচার্ডসন এবং স্টার্ণ, কারুরই দৃষ্টিভঙ্গি সুসম্পূর্ণ ছিল না। যাবতীয় সেন্টিমেণ্ট এবং তৎসংক্রান্ত বিশ্লেষণ পরিহার করে, ব্যক্তি বিশেষের ভাবগত দিকটি দেখতে অসফল হয়ে উপন্যাসকে যেমন কল্পনা ও ফ্যা‌ণ্টাসি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, ঠিক সেরকম তাবৎ অ্যাকশনকে ব্যক্তিচেতনায় এনে কেন্দ্রীভূত করার ফলে উপন্যাসকে বঞ্চিত করা হয়েছিল তার মহাকাব্যিক গুণ থেকে। সার্ভান্তেঁর মধ্যে এই ধরনের বিভাজনের প্রবণতা অচিন্ত্যনীয়। এই বিভাজন প্রবণতা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সৃষ্টি। পূর্ণ বিকশিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই সমাজ থেকে পৃথক করে ফেলেছিল, এবং পরবর্তী দুই জেনারেশানের মধ্যে ব্যক্তি মানুষকে, পুর্ণর্বিভাজন করেছিল তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও জটিল শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে।

যাই হোক, এই নতুন ধারার মুখ্য চরিত্ররা উপন্যাসের জগতে এক নতুন বিপ্লবের পুরোধা। কিছুটা অশ্রুসজল হলেও রিচার্ডসন সততার সঙ্গে মানব হৃদয়ের আন্তরিকতম অনুভূতিগুলিকে অনাবৃত করেছেন। ফিল্ডিং-এর বলিষ্ঠ জীবনদর্শন এবং দৃঢ় বাস্তবমুখীনতা যদি তাঁর মধ্যে থাকত তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিকদের একজন হতে পারতেন। অবশ্য একজন লেখকের মধ্যে আদৌ যা ছিল না তা তাঁর মধ্যে থাকলে কি হত এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা মূর্খামি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে হয়তো এই মূর্খের মতো অরণ্যে রোদনও কিছুটা যুক্তিসঙ্গত। কেননা রিচার্ডসনের ব্যর্থতা তাঁকে অবধারিত, এবং হয়তো কিছুটা অন্যায় ভাবেও, একটি মিউজিয়াম-সামগ্রী করে রেখেছে। প্রায়ই দেখা যায় তিনি একজন জীবন্ত লেখক হিসাবে উপস্থাপিত না হয়ে তার চাইতে অনেক বেশি একটি ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক প্রভাব হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছেন। বাস্তব থেকে স্টার্ণ সরে গিয়েছিলেন আরো দূরে। রিচার্ডসন ব্যস্ত ছিলেন কেবলমাত্র তাঁর চরিত্রগুলির অনুভূতিমালা নিয়ে।

এমনকি তাঁর ব্যবহৃত 'কারেসপণ্ডেন্স ফর্ম' বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে উপন্যাস গড়ে তোলার কায়দা ফ্রান্স এবং তাঁর ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য অভিজ্ঞতা থেকে ধার করা হলেও, রিচার্ডাসন বিশেষ কিছু সময়ের গণ্ডীর মধ্যে গল্প বলার ঐতিহ্যটা রেখেছিলেন। স্টার্ণ এসেছিলেন এক ঝড়ের মত, এই সব ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করে। ট্রিস্টাম শ্যাণ্ডির নায়কের ভাগ্যের মূলবিন্দুতে একটি প্রশ্ন বারবার ধ্বনিত হয়, "টু বি অর নট টু বি।" আক্ষরিক অর্থেই এই প্রশ্ন ছিল হ্যামলেটেরও স্বপ্নাতীত। ট্রিস্টাম শ্যাণ্ডির জন্মকালে তাবৎ জটিলতা সত্ত্বেও পাঠক বুঝে উঠতে পারেন না এই সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান আদৌ হয়েছে কিনা। উপন্যাস কি একটি গল্প বলার জন্য? রিলেটিভিস্টদের মতে হ্যাঁ। উপন্যাস গল্প বলতেই পারে, বিশেষত কোন ডিটেকটিভ গল্প হলে তো কথাই নেই, যেখানে পাঠক সবসময় একটা আরম্ভ, মধ্যাংশ এবং একটি পরিচ্ছন্ন উপসংহারের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে এবং লেখক গল্পের শেসে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এনে হাজির করে সব সমস্যার সুরাহা করে না-দেওয়া অব্দি পাঠক স্বয়ং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে যখন-তখন বোকা বনবে।

মহান ঔপন্যাসিক হতে গেলে যা যা দরকার তার সব কটি গুণই স্টার্ণের ছিল। তাঁর ছিল ব্যঞ্জনা, কল্পনার জোর, অশ্লীলতার প্রতি এক অদ্ভুত আসক্তি, মানুষের প্রতি ভালবাসা, অর্থাৎ জন্মক্ষণে একজন প্রতিভাধর যে-যে গুণে ভূষিত হতে পারেন তার সবকটিই। সবই ছিল, কেবল একটি উপহার ছাড়া। খুব কম সময়ই তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে এক বাস্তব জগতে উপস্থাপিত করতেন। তিনি নিজেকে ইংল্যাণ্ডের রাবেলঁ। ভাবতে ভালবাসতেন। আঙ্কল টোবি এবং ট্রিমের চরিত্রচিত্রণে তিনি স্বেচ্ছায় অনুকরণ করেছেন সার্ভাতেঁকে। কিন্তু তিনি রাবেলঁা ছিলেন না, সার্ভাতেঁ তো নয়ই। এই দুজন ছিলেন এক নতুন পৃথিবীর স্রষ্টিকর্তা। এই দুজন জীবনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলেন, এবং জীবনকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু স্টার্ণ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একমাত্র অতি কথনপ্রিয় ব্যক্তি যিনি অভিজাত সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রায় সবসময়েই ছিলেন উন্মুখ। তাঁর বহুদিন পরের উত্তরসূরী সোয়ানের থেকে তিনি অনেক বেশি মজার লোক ছিলেন, ছিলেন অনেক বড় প্রতিভা। কিন্তু ঐ দুটি বই লেখার পেছনে কাজ করছিল একই প্রবৃত্তি। স্টার্ণই ছিলেন প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি সময়কে ভেঙে ফেলেছিলেন, যিনি উপন্যাসে এনেছিলেন রিলেটিভিজ্‌ম্। কিন্তু কোন মহত্তর বাস্তবের জন্য তিনি তা করেননি, তিনি এটা করেছিলেন, কেননা তাঁর পক্ষে ঐভাবে আত্মকথন ছিল সহজতর।

একজন আদর্শবাদী প্রশ্ন করতে পারেন, একজনের পক্ষে তার নিজের চাইতে আর মহত্তর কি বাস্তবতা থাকতে পারে? এখানে অবশ্যই পাল্টা প্রশ্ন রাখা যেতে পারে, কেন নয়? যাঁরা এইসব ঔপন্যাসিকদের পছন্দ করেন না, যাঁরা এইসব আদর্শবাদীদের এক চতুষ্পদ জীব ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না, যাঁরা স্টার্ণকে আত্মপ্রচারে ব্যস্ত এক অশ্লীলতার প্রতিমূর্তি বা প্রুস্তকে ভড়ংবাজ ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না, তাঁদেরও এক নিজস্ব বাস্তবতা থাকতে পারে, এবং এমন কোন কথা নেই যে তাঁদের এই বাস্তবতা সবসময়ই এই আদর্শবাদীদের বাস্তবতা থেকে অনেক নিম্ন স্তরের হবে। আদর্শবাদীদের একমাত্র যুক্তি থাকতে পারে তাঁরা ভুল চিন্তা করেন। হ্যাঁ, তা তাঁরা করতেই পারেন, যদিও স্টার্ণ বা প্রুস্ত মরিয়া হয়ে তাঁদের সবসময়ই ভুল প্রমাণিত করতে গিয়ে নিজেদের সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিক সুলভ যাবতীয় মূল্যবোধ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছেন।

খুব নগ্ন ভাবে বলতে গেলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সত্যিই যথার্থ বিপ্লবী কোন ঔপন্যাসিক ছিলেন না যদিও তিনি সর্বযুগের মহত্তম কল্পনাশীল গদ্যলেখকদের অন্যতম। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় সঞ্জাত হয়েছিল রুশোর এই ভ্রান্ত ধারণা—শিক্ষা মানুষকে পরিবর্তিত করতে পারে। অবশ্যই এর পুরোটাই ভ্রান্ত ধারণা বা ইলিউশন নয়, বরং মানুষ যদি নিজেকে পরিবর্তিত করতে সক্রিয় ভাবে সচেষ্ট হয় তাহলে মানুষের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা অনুকূল থাকলে এই ধারণা সত্যিও হতে পারে। রুশোর নিজস্ব বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির প্রভাব মানুষের চরিত্রোন্নয়ন করার পক্ষে সব চাইতে শক্তিশালী প্রভাবগুলির অন্যতম। এ এক দুঃখজনক ইলিউশন, কিন্তু এই ধারণা পোষণ করতে গিয়ে রুশো সাহিত্যজগৎকে পুষ্ট করে গিয়েছেন। কেননা শিল্পে তিনি প্রকৃতিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁকে ছাড়া আমরা হয়ত এগডন হীথ, টলস্টয়ের চাষী বা কনরাডের প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে কিছু জানতেই পারতাম না।

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল উপন্যাসের স্বর্ণ যুগ। এই যুগের উপন্যাসে সার্ভাতেঁ বা রাবেলাঁর দুরন্ত কল্পনা ছিল না। কিন্তু এই যুগ মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেনি বরং কোন রকম কম্প্রোমাইজ ছাড়াই দারুণ সাহস নিয়ে এই যুগ জীবন সম্পর্কে যাবতীয় সত্যি কথা বলতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই যুগের উপন্যাসে ছিল ব্যঙ্গ এবং রসবোধ, এবং মানুষকে সে বুঝতে বাধ্য করেছিল যে প্রতিটি ব্যক্তির একান্তভাবে নিজস্ব অন্তর্মুখী জীবনও যেমন সত্যি, ঠিক তেমনই সত্যি তার বাইরের বাস্তব জগৎটিও। এই যুগের উপন্যাস উদ্ঘাটিত করল নতুন প্রকৃতিকে,

পাঠককে চেনাল ফিল্ডিং, সুইফট, ভলটেয়ার, দিদেরো এবং রুশোকে, পাঠক বুঝল সব ভালোই ভালো নয়। সময় হবার আগে সে পাঠককে জাগায় নি, কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী ইতিহাসের বৃহত্তম বৈপ্লবিক স্পন্দনে তখন প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এই শতাব্দী একটা কাজ করে উঠতে পারেনি। তখন এমন কোন উপন্যাস গড়ে ওঠেনি যা ফিল্ডিংয়ের মানবিক বাস্তবতার সঙ্গে রিচার্ডসনের সংবেদনশীলতাকে একসূত্রে বাঁধতে পারে যা একসূত্রে বাঁধতে পারে স্টার্নের ব্যঙ্গাত্মক সরসতার সঙ্গে রুশোর প্রগাঢ় প্রকৃতি প্রেমকে। উনবিংশ শতাব্দীও এর চাইতে ভালো কিছু দিতে পারেনি, যদিও বালজাক বা টলস্টয় উৎকর্ষের যে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন তা এতদিনের মধ্যে কেউই পারেননি।

সামগ্রিকভাবে বিচার করে একথা বলতেই হবে যে উনবিংশ শতাব্দী এক পশ্চাদপসরণের শতাব্দী, যে পশ্চাদপসরণ এসে শেষ হয়েছে আমাদের আজকের এই আতঙ্কগ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল আর্তনাদে।

॥ ভিক্টোরিয়ান পশ্চাদপসরণ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জায়গায় এসে ইংল্যাণ্ডে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ আকস্মিক একটা হোঁচট খায়। মনে হয় যেন, যে সাহিত্যপ্রতিভা এতদিন নব মহাকাব্যের ফর্মে নিজেকে অতুলনীয়ভাবে মানিয়ে নিয়েছিল, তা আজ অন্য কোথাও অন্য কোন ভাবে নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজছে। স্মলেট, ফিল্ডিং ও স্টার্নের কৃতিত্বের পরে গোল্ডস্মিথের ভাবসর্বস্বতা এবং ওয়ালপোলের কৃত্রিম রোম্যান্টিসিজম যেন অনেক ধাপ নীচে নেমে আসে। নব বুর্জোয়াজির মধ্যে যে জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তা জন ওয়েসলি চালিত ধর্মীয় আন্দোলনে ভাষা পাবার চেষ্টা করল। এবং অভিজাত বণিকরা তাদের বুদ্ধিজীবী ক্ষিধে মেটানর জন্য মুখ ফেরাল ফ্রান্সের দিকে, কিংবা fin de siecle কবিদের দিকে। মার্কিন বিপ্লব এবং তার পরবর্তী জটিল সমস্যাবলীর কালে ইংল্যাণ্ডের বেশির ভাগ জাতীয় প্রতিভাই জড়িয়ে পড়েছিল রাজনীতির মধ্যে; অবশ্য তা দেশের পক্ষে ভালই হয়েছিল বলতে হবে।

তাহলে কি হল? শতাব্দীর প্রথমার্ধ জন্ম দিল এমন এক সাহিত্য আন্দোলনের যাকে কেবলমাত্র এলিজাবেথীয় যুগই উৎকর্ষের দিক থেকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল; আর শতাব্দীর শেষার্ধ জন্ম দিল এক স্থাবর স্থিতাবস্থা এবং ক্রমাবনতির। নব্য বুর্জোয়া সমাজ মানুষকে যে ভাবে তৈরি করেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মানুষকে সে ভাবেই দেখার সাহস রেখেছিল। তৎকালীন কবি, ব্যঙ্গকার বা ঔপন্যাসিকরা যে সব সময় নতুন যুগের মানুষের চরিত্রে তৃপ্ত ছিলেন তা নয়। তবে তা সত্ত্বেও তাঁরা মানুষকে যেভাবে দেখেছিলেন ঠিক সে ভাবেই তার বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তৈরি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু এখন জন্ম নিল মানুষের সম্বন্ধে ভীতি, এবং এমনকি ঘৃণাও। মানুষ আর কোন নিষ্ঠুর, উজ্জ্বল কামুক বা সংগ্রামী, অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষ রইল না। সে হয়ে দাঁড়াল এক পাপী যার পরিত্রাণের প্রয়োজন। প্রাক্তন সৌষ্ঠব থেকে এই অবনতির মূলে কোন রহস্য রয়েছে?

তা খুঁজে বের করতে গেলে গোটা দেশের বিকাশ জানতে হবে। জানতে হবে টাকার ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা যা মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ককে বিষিয়ে দেয়, দূরে সরিয়ে নেয় পুরুষকে নারীর কাছ থেকে, সৃষ্টি করে বিত্তশালী ও বিত্ত-

হীনকে। জানতে হবে কৃষক সম্প্রদায়ের নির্দয় দখলচ্যুতি এবং আরো জানতে হবে পুরনো বাজারকেন্দ্র বা পল্লীগ্রামকে সরিয়ে দিয়ে যে নতুন শহরগুলি গড়ে উঠছিল সেই শহরের জীবনযাত্রার ক্লেদ ও অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার কথা। আমেরিকা সংগ্রামে লড়েছিল এবং সেই লড়াইয়ে পরাজয় স্বীকার করেছিল এক পচনশীল অলি-গার্কি, যারা জার্মান রাজার নামে দেশ শাসন করত। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ করার জন্য লুণ্ঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষ। এবং তখন কেউ পরিষ্কারভাবে জানতেই পারেনি যে অ্যাটলান্টিকের ওপারে পাঁচ হাজার মাইল দূরে প্রথম এক গণ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দিয়েছে। একমাত্র কিছু অজ্ঞাত প্যাম্ফলেট প্রকাশক এবং দু'য়েকজন ইতর রাজনীতিক ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানতে পারেনি।

যখন ইংরেজ ঔপন্যাসিকরা আবার মানুষের দিকে ফিরে তাকালেন এবং ইংরেজ জনজীবনের মহাকাব্য কথনে ব্রতী হলেন, তখন গোটা পৃথিবীতে এত অদল বদল হয়ে গিয়েছে যে উপন্যাস আর আগের সেই উপন্যাস নেই। শিল্পীর দৃষ্টি ভঙ্গির মতই শিল্পীর অস্ত্রও তখন ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। এই নতুন শিল্প যুগের প্রথম মহান ঔপন্যাসিক স্কট সরে গিয়েছেন বাস্তব থেকে এক অদ্ভুত আদর্শ-বাদী রোম্যান্টিক অতীতে। এক অর্থে তিনি ছিলেন এক বৈপ্লবিক স্রষ্টিকর্তা, কেননা তিনিই প্রথম বুঝিয়েছিলেন যে কেবলমাত্র মানুষকে দেখলেই চলবে না, তাকে ঐতিহাসিক সত্যতা অসত্যতার মাপকাঠিতে যাচাইও করতে হবে। তিনি জানতেন মানুষের বর্তমানের মত একটা অতীতও আছে। তাঁর বিস্ময়-কর এবং উর্বর প্রতিভা এক সংশ্লেষণের চেষ্টা করেছিল, যা অষ্টাদশ শতাব্দী করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। এই সংশ্লেষণে উপন্যাসে একত্রিত হল জীবনের কাব্য-ধর্মিতা এবং গদ্যময়তা ; এই সংশ্লেষণে রুশোর প্রকৃতিপ্রেম মিশ্রিত হল স্টার্নের সংবেদনশীলতা এবং ফিল্ডিংয়ের বলিষ্ঠতা ও বিশালতার সঙ্গে।

স্কট ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এ এক গৌরবময় ব্যর্থতা। এবং তার কারণ খুঁটিয়ে দেখার মত। স্কটকে আজকাল কৌশলী গল্পবলিয়ে এবং অসহ্য সেন্টি-মেন্টাল কাহিনীর কথক বলাটা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ই. এম ফর্স্টার স্কটকে তাই ভাবেন। কিন্তু বালজাকের মতামত ছিল অন্য। স্কট হলেন একমাত্র ঔপন্যাসিক যাঁর কাছে বালজাক নিজেকে ঋণী ভেবেছেন, এবং আমাদের একমাত্র সম্মানীয় সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিক হিসেবে ই. এম. ফর্স্টারকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই আমি বালজাকের পক্ষ অবলম্বন করছি।

স্কট কেন তাঁর এই সুবিশাল কাজে ব্যর্থ হলেন ? কেননা তাঁর চোখে পরান

ছিল অচ্ছেদ্য ঠুলি। আধুনিক সমালোচক যদি বলেন যে তাঁরও তো এই একই মত, তাহলে তাঁকে জানাই সেই ঠুলি, আর আধুনিক সমালোচকের চোখে পরান যে ঠুলি এই দুইয়ে বস্তুত কোন তফাৎ নেই। এক মাত্র তফাৎ এইখানেই যে, ঠুলি পরান সত্ত্বেও স্কট ছিলেন এক বিরাট প্রতিভা। মানুষ যা তাকে ঠিক সেইভাবে দেখতে স্কট ছিলেন অপারগ। তাঁর চরিত্ররা ইতিহাসের সত্যিকার নরনারী নয়, তাঁর চরিত্ররা হল প্রাক উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত বণিক সম্প্রদায়ের আদর্শকরণ। স্কটের চরিত্র এবং ফিল্ডিং-এর চবিত্রদের মধ্যে তফাৎ হল এই যে স্কটের নরনারীরা আদর্শকৃত, ফিল্ডিং-এর চরিত্রসমূহ টাইপ।

ঔপন্যাসিকের পক্ষে তাঁর চরিত্রকে সত্যতার আলোকে দেখা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এমন কি জেন অস্টিনও প্রায়-সাফল্যলাভ করা সত্ত্বেও, প্রতিটি চরিত্রের কাছেই তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি সমালোচনায় মুখরা, ব্যঙ্গস্তুতিতে তীক্ষ্ণা, সত্যতার আলোকে চবিত্র বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্তা; তিনি বার বার দেখিয়েছেন তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় তাঁর চরিত্ররা এবং তাদের সমস্যাবলী সমাধানের বাইরে। কিন্তু শেষ অব্দি তিনি যে ভঙ্গিতে দাঁড়ান, তা আত্মসমর্পণের ভঙ্গি। এই পৃথিবী তাদের নিরাপদ আশ্রয়প্রাপ্ত সৌজন্যের ও ভদ্রতার পৃথিবী। এর বাইরেও আবেক পৃথিবী আছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব কখনই কোন মতে জানতে দেওয়া হবে না। বর্তমানে তাবৎ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে যেন নপুংসক করে ফেলা হয়েছে, অবশ্যই শারীরিক অর্থে নয়, তাঁরা নপুংসক চিন্তা ভাবনার জগতে। নতুন পৃথিবীর, বিশেষত ভিক্টোরীয় পৃথিবীর গোঁড়ামি দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়। কেননা তা যদি আদৌ সম্ভব হত তাহলে কোন মহান লেখক সেই গোঁড়ামিকে ভাঙতে পারতেন (কবিতায় বায়রন যা এক পুরুষ আগে করে গিয়েছেন)। অসুবিধে হল এই যে লেখক নিজেই জীবনকে ঐভাবে দেখতে শুরু করেছিলেন। মানুষ যা তাকে সেইভাবে দেখতে লেখক অক্ষম ছিলেন, তিনি মানুষকে দেখেছিলেন শিল্পশাসিত সমাজে স্থানপ্রাপ্ত এক জীব হিসেবে।

নব্য বুর্জোয়াজির প্রতি থ্যাকারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর এই অসন্তুষ্টি অতি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন। অনেক ছোটখাট লেখকও তাই করেছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী যেভাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের পূর্ণাবয়বকে তুলে ধরেছিল তাঁরা তা করেন নি। ভিক্টোরিয়ররা যে যৌনতা সম্বন্ধে ভীত ছিলেন তা নয়। বরং তার উল্টোটাই

হয়েছে অনেক সময়। তাঁরা যৌনতা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী তুলতে পারতেন খুব নিঃসঙ্কোচে। একান্তভাবে তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতি অনেক সময়ই খুব মনোরম ছিল না, বেকি শার্প কথাবার্তায় অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ও ভদ্র হলেও, শেষ বিচারে তার সঙ্গে রেস্টোরেশন যুগের নায়িকাদের খুব একটা পার্থক্য থাকে না।

সমস্যাটা অন্যখানে। সমাজে একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যথার্থ সম্পর্কের মুখোশ আগে ছিন্ন না করে ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যিক নরনারীর প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন না। এই যুগটা ছিল কারখানার যুগ, ক্ষুধার্ত চল্লিশের দশকের যুগ চার্টিস্ট স্ট্রাইকের যুগ, নিউপোর্ট অভ্যুত্থানের যুগ। এই যুগ ছিল ১৬৮৮ সালের পরবর্তী ইংরেজ ইতিহাসের একমাত্র সময় যখন দেশের মৌলিক আইন চলতে বাধ্য হয়েছিল সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শিত পথে। এই যুগ ছিল ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য্যকে মরুভূমি করে দিয়ে হাজার হাজার কলকারখানার আবির্ভাবের যুগ। এই যুগ ছিল আদর্শবাদের ভণ্ড অসুস্থতম আবরণে আবৃত ব্যক্তি ও জনজীবনে দুর্দম ও গভীরসঞ্চারী বস্তুতান্ত্রিকতার যুগ। কাজেই ভিক্টোরীয় সমাজের একটি পরিবারের চিত্র আঁকতে গেলে এই ব্যাপারগুলো আসবেই, যেরকম আসবে সামগ্রিক অর্থে তৎকালীন মহানুভবতা ও চারিত্রিক সততার প্রসঙ্গ। শতাব্দীর শেষদিকে একাধিক মহত্তম ভিক্টোরীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি উপন্যাসে স্যামুয়েল বাটলার এই সত্যি কথা বলেছিলেন। তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে এবং তা স্বীকৃতি পেয়েছে আজ, আমাদের যুগে।

ভিক্টোরীয়রা যা দেখার তা সততার সঙ্গে যে দেখতেন না তা নয়। তাঁদের যথার্থ সাফল্যগুলিকে অবহেলা করা যে রকম মূর্খতা, তদানীন্তন কাল তাঁদের ওপর যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল তার জন্য তাঁদেরকে অভিযুক্ত করাটাও সেরকম মূর্খতা। যে ইংরাজী উপন্যাস বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে তার প্রথম গৌরবময় বিজয় অভিযানের শেষে মৃতপ্রায় হয়েছিল, সেই ইংরেজী উপন্যাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন ভিক্টোরিয় ঔপন্যাসিকরাই। তাঁরা ডিকেন্সের মধ্যে এমন এক প্রতিভা পেয়েছিলেন যা উপন্যাসকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল তার পূর্ণ মহাকাব্যিক চরিত্র, যাঁর সৃষ্টিশীল মন এমন সব গল্প, কবিতা ও চরিত্রের জন্ম দিয়েছিল যারা ইংরেজ ভাষাভাষী পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। তাঁর কিছু কিছু চরিত্র প্রায় একরকম প্রবাদোচিত সত্ত্বা পেয়ে গিয়েছে, তারা আমাদের আধুনিক লোককথার অংশ হয়ে গিয়েছে। একজন লেখকের পক্ষে এটাই হল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম, কাম্য সাফল্য। তিনি এই

কাজ সমাধা করতে পারেন একমাত্র প্রতিভা, মানবতাবাদ এবং জীবনের কাব্যময়তার প্রতি এক গভীর অনুভূতির মাধ্যমে।

কিন্তু এই সব সত্বেও ডিকেন্স ছিলেন একান্তভাবেই তাঁর নিজের সময়ের জ্যোতিষ্ক। তাঁকে পাঠকের নিকটে এনে দিয়েছিল তাঁর কল্পনাময়তা, তাঁর অজস্র ঘটনাবলি তৈরি করার ক্ষমতা, অতি সাধারণ এবং খুবই কাছের অতি সাধারণ মানুষজনের চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতা ইত্যাদি। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের লোক, যদিও তিনি কখনই তাঁর যুগের উপর কর্তৃত্ব করেন নি। তিনি 'শিল্পী' হতে পারেন নি বলে অভিযুক্ত হয়েছেন (জানিনা এই প্রসঙ্গে এই কথাটির অর্থ কি), অভিযুক্ত হয়েছেন তিনি লেখকের লেখক না হয়ে পাঠকের লেখক হবার জন্য। স্কটের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে এই একই কথা। স্কট বালজাকের ওপর সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেন এবং বালজাক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। বিদেশীদের মধ্যে সম্ভবতঃ ডিকেন্স ছিলেন টলস্টয়ের ওপর সর্বাপেক্ষা বড় প্রভাব। এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ জুড়ে একচ্ছত্র অধিপতি হলেন টলস্টয়।

তাহলে স্কট বালজাকের মত বা ডিকেন্স টলস্টয়ের মত কর্তৃত্ব সম্পন্ন চরিত্র হয়ে উঠলেন না কেন? কেন তাহলে আমরা সব সময় ডিকেন্স বা স্কটের নায়কের মধ্যে কোন কিছুর ঘাটতি অনুভব করি? তার কারণ হল তাঁরা তাঁদের সমাজের আপাতদৃষ্ট বহিরঙ্গ থেকে ক্রমশই নিম্নাভিমুখী মানুষের অধঃগমন ঠিকমত পর্যবেক্ষণ করতে পারেননি। কারণ তাঁরা এই নিয়মটা দেখতে পাননি; তাঁদের সমসাময়িকদের প্রকৃত গৌরব, তাঁদের যুগের প্রকৃত নায়কদের তাঁরা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। বিজয়ী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানের অসাড়তা তাঁরা খুব ভালভাবেই জানতেন। সেই অসাড় শূন্যতাকে তাঁরা নির্দয়ভাবে আক্রমণ করতেও কসুর করেন নি। কিন্তু তাঁরা নৈতিক অধঃপতনের গভীর অর্থবহ প্রক্রিয়াটি দেখতে পাননি। তাঁরা দেখতে পাননি ধনতান্ত্রিক সমাজের দীনতা।

এই দিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী বাস্তববাদীরা ব্রিটিশদের চাইতে কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন স্বচ্ছদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু বাস্তবকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বালজাক। কৃত্রিম মূল্যবোধ সম্পন্ন রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফরাসী ঔপন্যাসিকরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিলেন যা বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ও এককাট্টা প্রতিবাদে ছিল সোচ্চার। এই অবস্থা ত্বরান্বিত করেছিল ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা। এই তীব্রতা কোন ইলিউশন বা ভ্রান্ত ধারণা রাখতে দেয়নি কোন সচেতন মানুষকে। দুর্ভাগ্য বশত এই সঙ্কটজনক অবস্থা এক

নেতিবাচক অবস্থায় পর্যবসিত হয়, এবং তা কেবল সামাজিক অর্থেই নয়, নান্দনিক অর্থেও। শেষপর্যন্ত এই অবস্থা আরো গভীরভাবে বাস্তবের দিকে চালিত করে উপন্যাসকে মুক্তির পথ দেখানর পরিবর্তে উপন্যাসকে অধিকতর সংহতিহীনতা ও বাস্তববিমুখতার পথে নিয়ে যায়।

ইংরেজ বাস্তববাদীরা সমাজ সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত দৃষ্টি ত্যাগ করেন নি। তাঁরা তা করেছিলেন কৃত্রিম বিনয় ও তির্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্টোরীয় দেহোপজিবিনী রোম্যান্টিসিজমের সঙ্গে একটা কম্প্রোমাইজ করে। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকের ভাগ্যে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়; তাঁর পূর্বসূরীরা লিখে গিয়েছিলেন নিঃসঙ্কোচে। নিঃসঙ্কোচে তাঁরা লিখেছিলেন জীবনের জৈবিক বিষয় সম্পর্কে, লিখেছিলেন নিয়ম, নীতি, সম্পত্তি, ভালবাসা, যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে। প্রধানত তাঁরা লিখতেন খুব সীমিত আয়তনের উচ্চশিক্ষিত কিছু পাঠকের জন্য। এই সব পাঠকরা উপন্যাসের মাধ্যমে মানব অস্তিত্বের বাস্তবতার এক আলোকিত ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাকে একান্তভাবেই তাঁদের শ্রেণীর এক বিশেষ সুবিধা বা বিলাস বলে মনে করতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর লেখকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। তাঁর ওপরে চাপ এসেছে অনেক দিক থেকে; এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকে, এসেছে বিশাল সংখ্যক অর্ধ শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে, এসেছে আত্মশিক্ষিত শ্রমজীবীদের কাছ থেকে। খুব সৌজন্যপূর্ণ ভদ্র মধ্যবিত্ত হলে ব্যাপক জনসাধারণকে অনেক কথাই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। গত বছর একজন বিচারক যৌনতার ওপর লিখিত একটি বই নিয়ে মামলা চলাকালীন রায় দেন, যৌনতার আনন্দ বা তৃপ্তি ইত্যাদি নিয়ে সীমিত সংখ্যক কিছু পাঠকের জন্য কিছু লেখা যেতেই পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে তা ছাপার অক্ষরে জনসাধারণের কাছে পৌঁছচ্ছে এবং সেই বই শ্রমজীবী শ্রেণীর মেয়েদের হাতে গিয়ে পড়লে তা অবশ্যই সেন্সর এবং শাস্তি এই দুইয়েরই যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ এই অসুবিধে অতিক্রম করেছিলেন তাঁদের স্বেচ্ছারোপিত রোমান্সের আচ্ছাদনের আড়ালে থেকে। ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মনে হয়েছিল জনসাধারণ তাঁদের যুগপৎ লেখক হিসেবে বেঁচে থাকতে অথচ শিল্পী হিসেবে নিহত হতে সাহায্য করছে। তাই তাঁদের সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া ছিল এই জনসাধারণের প্রতি এক মৌন, বিষণ্ণ ঘৃণা ও অনীহা। রুশীয়দের অবস্থা ছিল অদ্ভুত ধরনের, কিছুটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীদের মত। চলার পথে তাঁদের পেছনেই তাঁরা পেয়েছিলেন দু-দুটো দেশকে, যারা উপন্যাসের উৎকর্ষের জন্য ইতিমধ্যেই বহুদূর অগ্রণী হয়েছিল। তাই

রুশীয়দের অবদানও সাফল্যজনক, তাঁরা কোন কম্প্রোমাইজের মধ্যেও যাননি, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণও করেননি।

মানুষের অন্তর্নিহিত চরিত্রচিত্রণে ঔপন্যাসিক যে-যে বাধার সম্মুখীন হন তার ওপর আলোকসম্পাত করা এই প্রবন্ধের একাধিক উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম। আমার বিশ্বাস এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় একমাত্র মহাকাব্যিক ঢংয়ে বা এপিক স্টাইলের সাহায্যে, যা কিনা শিল্পমাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের সাফল্যের একমাত্র রহস্য। রাবেলাঁ ও সার্ভাতেঁর পর থেকে এই এপিক স্টাইল অনেক পরিমার্জন ইত্যাদির পর খুবই ক্ষীণাকারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে উপস্থিত হয়। যেদিন থেকে রঙ্গমঞ্চে পাঠকের আবির্ভাব হল এবং দেখা গেল যে পাঠকের গুরুত্ব লেখকের গুরুত্বের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, সেদিন থেকে এই ক্রিয়া সমাপ্তির পথে। অবশ্যই এপিক স্টাইল উপন্যাসকে বাঁচাতে পারত। দুঃসাহসী স্বপ্নদ্রষ্টা এবং তার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এ একটা পূর্ণ মিলন স্বরূপ ছিল। আর এও খুব পরিষ্কার যে, লেখক ও জনসাধারণের মধ্যে সমজাতীয় কোন মিলনসূত্র প্রতিষ্ঠা করা গেলে পতনের বদলে উপন্যাসের বিকাশই ত্বরান্বিত হত।

লিটল নেল-এর জীবন বাঁচিয়ে দেবার জন্য অজস্র চিঠি বোমার মত নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ডিকেন্সের ওপর। আবার তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে সাহিত্যিক সংহতি এবং শৈল্পিক সাহস থাকা সত্ত্বেও হার্ডি পেয়েছিলেন অশেষ দুর্ব্যবহার, এমনকি প্রাণের ভয়ও দেখান হয় তাঁকে। ফ্লবেয়ার, গ্যঁক্যুর ভ্রাতৃদ্বয় এবং জোলা—এঁরা সবাই মুখোমুখি হয়েছিলেন আদালতের। এই দুই চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যে উপন্যাসের নৌকাডুবি ছিল অবধারিত। সমাজ, যাকে আমরা সাধারণত শাসকশ্রেণীর সমার্থক বলেই মনে করি, 'জনগণের' নৈতিক বিকৃতি অনুমোদন করতে পারেনি, যদিও সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই সমাজই এনে দিচ্ছিল জনসাধারণের ব্যাপক নৈতিক ও আত্মিক বিকৃতি। ইংরেজি উপন্যাসের মহান ট্র্যাডিশন যে ঔপন্যাসিকের ওপর ন্যস্ত, সেই ঔপন্যাসিক আর সক্ষম ছিলেন না স্বতন্ত্র ভাবে এক জায়গায় অবস্থান করে গোটা দেশকে পর্যবেক্ষণ করতে, সক্ষম ছিলেন না তাঁর স্বাভাবিক রাগ, ব্যঙ্গ, করুণা কিংবা সময়বিশেষে নিষ্ঠুরতার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে। এইখানেই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদের সুবিধা। পাঠকসংখ্যা ছিল তাঁদের সীমিত এবং পাঠকরা ছিলেন সুবিধাভোগী বিত্তশালী শ্রেণীভুক্ত। লেখক নিজের ইচ্ছেমত লিখতে পারতেন বা মতপ্রকাশ করতে পারতেন কেন না পাঠকদের ছিল সামাজিক নিরাপত্তা।

কিন্তু ডিকেন্সের সময়ে অবস্থাটা কি ছিল? তাঁর বইপত্র পড়েছিল তাঁরই শহর

লণ্ডন। তিনি এবং তাঁর লণ্ডন একই সত্তা। সেভেন ডায়ালস্-এর সত্যিকার জীবন যদি তিনি দেখতে পেতেন তাহলে সেই ছবি তাঁর কাছে অতিমাত্রায় ভয়াবহ বলে মনে হত, তাঁকে তাহলে সরাসরি এসে দাঁড়াতে হত এক রণক্ষেত্রে। হয়তো সেই চিত্রনির্মান তাঁর পক্ষে যথেষ্ট শক্ত কাজ বলেও মনে হত। এবং তাঁর পক্ষে ঘৃণা ও অনীহা নিয়ে নিজের প্রিয় শহর ছেড়ে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া হয়তো আর উপায় থাকতনা। তিনি সহজতর পথটি বেছে নিয়েছিলেন। বাস্তবকে ভাবপ্রবণতার রসে জারিত করেছিলেন ডিকেন্স। ফ্রান্সে বাস্তববাদ ও রোম্যান্টিসিজমের দ্বন্দ্ব ভিন্ন উপায়ে সমাধা হয়েছিল, আপাত দৃষ্টিতে আরো অনেক সৎ উপায়েই তা হয়েছিল, যদিও শেষ অব্দি তা ফলপ্রসূ হয়নি। সুতরাং মহান স্টাইলের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সম্ভবত শেষ লেখক ডিকেন্সকে তাঁর কলাকুশলতার মানদণ্ডে বিচার করলে মনে হয় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর কল্পনা ছিল, কবিতা ছিল না; তিনি তাঁর সময়ের ছবি আমাদের উপহার দেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তাঁর যুগকে অভিব্যক্ত করেননা। তিনি বাস্তবের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করেন, কিন্তু নতুন কোন রোম্যান্টিসিজম সৃষ্টি করেন না।

বিশ্বজনীন প্রতিভার কিয়দাংশ যাঁর মধ্যে ছিল, সেই ডিকেন্স ছাড়া ভিক্টোরিয়ান যুগের উপন্যাস অসংহত এবং অনেক বেশি বিশেষিকৃত। টম জোনসের স্থানে আমরা পাই হাসির উপন্যাস, অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস, অপরাধ উপন্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি। সার্ভান্তেঁ যেখানে কল্পনা ও কাব্যকে রসবোধ এবং কল্পনাপ্রবণতার সঙ্গে একাত্ম করে দিতে পেরেছিলেন, সেখানে আজ আমরা পাই হয় নিছক কল্পনাশ্রয়ী ও কাব্যধর্মী উপন্যাস, কিংবা নিছক হাস্যরসময় এবং কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাববাদী জীবনদর্শনকে বস্তুবাদী জীবনদর্শন থেকে আলাদা করে ফেলার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, অবশ্যই তা আজ, এই ব্যক্তিমানুষের সঙ্কটের কালে মুলতুবি রাখা হয়েছে। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে, ঊনবিংশ শতাব্দী হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ফর্মকে ভেঙে ফেলার সময়। মিস্টার ফর্স্টার-এর উপন্যাস সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা অ্যাসপেক্টস অফ দ্য নভেল-এ তার প্রতিফলন পাই। তিনি উপন্যাসকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে— গল্প ভিত্তিক উপন্যাস, কল্পনাভিত্তিক উপন্যাস এবং ভবিষ্যদ্বক্তা উপন্যাস। এই বিভাজন সর্বতোভাবে সচেতন নয়, এসত্ত্বেও তা অবশ্যই আছে।

এই বিভাজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসের মৌলচরিত্রের কোন সম্পর্ক না থাকলেও আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রের শর্তাবলীই এই কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করেছে এবং জোরদার করেছে। বিরোধী মন্তব্য উঠতেই পারে যে, এমিলি

ব্রন্টির উদারিং হাইট্‌স্‌-এর মত পরিপূর্ণভাবে ভবিষ্যদ্বক্তা একটি উপন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রের শর্তাবলী কোথায়? 'উদারিং হাইট্‌স্‌' সময় বা স্পেস-এর উর্দ্ধে, এই উপন্যাস অমর, আদিম এবং মৌল, কেননা এক মৌল আবেগ এই বই-র প্রাণদাতা। 'উদারিং হাইট্‌স্‌'এ উপন্যাস বিশুদ্ধ কবিতায় রূপান্তরিত।

উপন্যাস এখানে কবিতায় রূপান্তরিত অবশ্যই। আজ অব্দি মানব প্রতিভা যত উপন্যাস সৃষ্টি করেছে, নিঃসন্দেহে এটি তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তবুও আমার বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না, যেহেতু গোটা উপন্যাসটি জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিষণ্ণ এক আর্ত চিৎকার। এই আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে এমিলির মনমানসের অন্তঃস্থল ছিঁড়ে খুড়ে। এবং স্বয়ং জীবন এই আর্তনাদ নিংড়ে বের করে এনেছে। এই লেখাকে জন্ম দিয়েছে মধ্য-ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রা। এই লেখাকে জন্ম দিয়েছে ওয়েস্ট রাইডিং এর বিস্তীর্ণ অনাবাদী জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাত্যাবিক্ষুব্ধ এক পার্সোনেজে একটি মেয়ের কিছু বন্দী আবেগ ও কল্পনার তীব্রতা। রচেস্টার-এর মহৎ সুউচ্চ প্রেমে শার্লট, এবং 'ভিলেৎ'এ লুসি স্নো'র জ্বালাময়ী কাহিনীতে জেন আয়ার এই সব মেয়েদের সর্বদা বাধাপ্রাপ্ত নিঃসঙ্গ জীবনকে অভিব্যক্ত করে গিয়েছেন। এমিলি এতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁর প্রেমকে জয়ী হতেই হবে। এবং সেই বিস্তীর্ণ জমির ওপরে পাথুরে ফার্ম হাউসটির ভয়ঙ্কর, আতঙ্কজনক পরিবেশেও তাঁর প্রেম জয়ী হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে ক্যাথারাইন এবং হিথক্লিফ ভালবাসার প্রতিশোধ নিয়েছে।

"আমার আঙুল এসে আটকে গেল আর একটি ছোট, বরফের মত ঠাণ্ডা আঙুলে। রাতের দুঃস্বপ্নের বিমূঢ় আতঙ্ক এসে চেপে ধরল আমাকে: আমি আমার হাত টেনে নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, আমার হাত সেই আঙুলেই আটকে রইল। আর দারুণ বিষণ্ণ কণ্ঠে কে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাকে আসতে দাও, আমাকে আসতে দাও'। আমি ভীষণ ভাবে চেষ্টা করছিলাম নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। 'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম। কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর এল, 'ক্যাথারাইন লিনটন।...আমি বাড়িতে এসেছি। বাইরের ঐ ফাঁকা জমিতে আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।' সে কথা বলার সময় আমি খুব আবছা ভাবে তার মুখ দেখতে পেলাম জানলা দিয়ে। একটি শিশুর মুখ। আতঙ্ক আমাকে নিষ্ঠুর করে দিয়েছিল। তার শক্ত করে আঁকড়ে থাকা হাত থেকে ছাড়া পাওয়া কষ্টকর দেখে শেষ অব্দি আমি তার কব্জি টেনে আনলাম জানলার ভাঙা শার্সির ওপর, আর এদিক ওদিক তা ঘষতে লাগলাম।

তার হাত থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। বিছানার চাদরটা ভিজে উঠল অল্প ক্ষণের মধ্যেই। তখনও তার মুঠি আলগা হয়নি। তখনও আমাকে আতঙ্কে বিমূঢ় করে সে আর্তনাদ করে চলেছে: 'আমাকে আসতে দাও!' আমি বললাম, 'আমি কি করে তা পারি? তোমাকে যদি আসতে দিতেই হয়, তাহলে আমাকে প্রথমে বাইরে বের হতে দাও। হাত ছাড়ো!' আঙুলগুলো সঙ্গে সঙ্গে আলগা হয়ে এল। আমি ঝটিতে হাত টেনে নিলাম। জানলার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় বইগুলো সাজিয়ে একটা পিরামিডের মত করে ফেললাম। তারপর দ্রুত কান চেপে ধরলাম ঐ আর্তচিৎকার আর শুনতে চাইনা। কম করে মিনিট পনেরো আমি কান চেপে রেখে ছিলাম। কিন্তু কান খুলতেই আবার সেই একটানা অস্পষ্ট কান্না শুনতে পেলাম। 'ভাগো এখান থেকে!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'আমি কক্ষণো তোমাকে ঢুকতে দেবোনা, 'কুড়ি বছর ধরে চেঁচালেও না।' অস্পষ্ট হয়ে ভেঙে পড়েছিল তার স্বর—'কুড়ি বছর! ঠিক কুড়ি। এখন কুড়ি বছর আমি তাহলে নিঃসহায়। আমার কোন আশ্রয় নেই।'

এই উদ্ধৃতি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে ভয়ঙ্কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও সময় বা স্পেস্-এর বাইরে নয়, এমন কি এর আবেগের তীব্রতাতেও নয়। কেননা এমিলির এই যন্ত্রণামথিত চিৎকারের উৎস তার সময়। অন্য কোন সময়ই তাকে এইভাবে অত্যাচার করতে পারতনা। অন্য কোন যুগ তার অন্তরস্থল থেকে ব্যথাচ্ছন্ন, আতঙ্কগ্রস্ত অসহায়তার শ্বাস বের করে আনতে পারত না। গোটা উপন্যাসটিতে এক অদ্ভুত ও ভয়াবহ কোরাসের প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয় ক্ষেত-মজুর যোশেফ এর অভিযোগ; সে তার যুগের অশালীন নৈতিকতার ধর্মের ভানে পূর্ণ, নিরানন্দ, ঘৃণাশীল এবং ঘৃণ্য প্রতীক। মনে হয় কয়েদখানার দেয়ালগুলিও যেন বন্দীর প্রতি তীক্ষ্ণ কটুক্তি, ব্যঙ্গ ও শ্লেষে সরব হয়ে উঠেছে।

এই প্রবন্ধের লেখক জন্মেছেন ও প্রতিপালিত হয়েছেন হ্যাওয়ার্থ পার্সোনেজের বারো মাইলের মধ্যে এমন এক সমাজে যা সেই তিন বোনের সময়কার সমাজ থেকে খুব একটা পাল্টায়নি, যেখানে ব্র্যামওয়েলের খেয়ালিপনা তখনও মাঝে মধ্যে মনে পড়ে যায়। এবং প্রাবন্ধিক এমিলির লেখাতে এমন কিছু খুজে পাননি যাকে 'বিশুদ্ধ কবিতা' বলা যায়। 'বিশুদ্ধ কবিতা' বলতে সেই কথাই বোঝাতে চাইছি যে অর্থে এই অদ্ভুত বাগধারাকে এর উদ্গাতা প্রেমিকরা ব্যবহার করেন। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ড ব্যক্তি মানুষের সত্তাকে যেভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছে এই উপন্যাস সেই নৃশংসতার ও মানুষের দুর্দশারই প্রতিধ্বনি।

তৎকালীন মহত্তম তিনটি উপন্যাসই মানুষের কষ্টের প্রতিফলন 'উদারিং—'হাইট্‌স্,' 'জুড দ্য অব্‌স্‌কিওর' এবং 'দি ওয়ে অব অল ফ্লেশ'। এই তিনটি লেখাই তিনজন ইংরেজ প্রতিভাধরের ইশতেহার, যার বক্তব্য হল—ধনতান্ত্রিক সমাজে পূর্ণাঙ্গ মানবজীবন পাবার জন্য অভিলাষী হওয়া অসম্ভব। এখানে পুরুষের জন্য নারীর ভালবাসা নিঃসহায় হয়ে শীতার্ত, অনাবাদী জমির ওপরে কান্নায় ডুবে থাকে, এখানে নিজের সন্ততির প্রতি পুরুষের ভালবাসা তাদের নিয়ে আসে অক্সফোর্ড লজিং হাউসে, কৃষক তার ফসলের অবশিষ্টাংশ তুলে দেয় তার পালিত শূওরদের মুখে, আর সততা, সরলতা এবং বুদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীর নায়ককে নিয়ে আসে জেলখানায় যেখানে সে বড় জোর অপেক্ষা করতে পারে মুক্তিপণের জন্য কিংবা কোন আণ্ট এলথিব জন্য যিনি নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে শেয়ারের সত্তর হাজার পাউণ্ড নিয়ে এগিয়ে আসেন অপ্রত্যাশিত ভাবে নায়কের স্বাধীনতার জন্য। এই তিনটি বই ডিকেন্স থেকে অনেক দূরে। আর এক অর্থে তারা বিচ্ছিন্ন কিছু প্রতিমূর্তি। যাই হোক, এদের মধ্যে উপন্যাসের মূল ট্রাডিশন বেঁচে আছে, এবং ভবিষ্যতের ঔপন্যাসিক যখন বাস্তবকে জয় করতে এগিয়ে আসবেন তখন তিনি এঁদের মেনে নেবেন তাঁব অনুপ্রেরণা হিসেবে। বাস্তবকে জয় করাব এই নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিশীল সংগ্রামে শেষ অব্দি ডিকেন্স তাঁব যুদ্ধ পতাকা নামিয়ে নিয়ে সেই জায়গায় তুলেছেন এক নির্দোষ সাদা পতাকা। আবেগ প্রবণ কম্প্রোমাইজের পতাকা।

দি প্রমিথিয়ানস্

১৮৫৪ সালে নিউ ইয়র্ক ট্রাইবিউন-এ মার্ক্স তাঁর একটি আলোচনায় ভিক্টোরীয় বাস্তববাদীদের উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত টানেন: "ইংল্যাণ্ডের বর্তমান উজ্জ্বল ঔপন্যাসিকদের গ্র্যাফিক এবং মুখর বর্ণনা আমাদের সামনে অনেক অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য উদ্ঘাটিত করে দেয়। তাবৎ রাজনীতিজ্ঞ, নীতি বিশেষজ্ঞ এবং আইনবিশেষজ্ঞরাও একসঙ্গে জড়ো হয়ে এত সত্য উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। এই ঔপন্যাসিকরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিটি বিভাগকেই চিত্রিত করেছেন। সব রকম ব্যবসাকেই যাঁরা স্থূল ও অশালীন বলে মনে করেন, সেই 'সম্মানীয়' সরকারী লগ্নীপত্রে অর্থবিনিয়োগকারী এবং সরকারী মজুত দ্রব্য মালিকদের থেকে আরম্ভ করে ছোট দোকানদার এবং আইন-জীবীর করণিক অব্দি—কাউকেই তাঁরা বাদ দেননি। ডিকেন্স, থ্যাকারে, শার্লট ব্রন্টি এবং মিসেস গাসকেল-প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের হাতে তাঁরা কি ভাবে বর্ণিত হয়েছেন? তাঁদের দেখান হয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনা, শালীনতার ভান, ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচার এবং অজ্ঞানতায় পূর্ণ একদল লোক হিসেবে। এবং সভ্য জগৎ তাদের দৃঢ় রায় দান করে চিহ্নিত করেছে এই বিশেষ শ্রেণীকে। ঘৃণাময় এক শ্লেষোক্তিতে তা প্রকাশ পেয়েছে—এই শ্রেণী সামাজিক অবস্থানে তাদের উচ্চতর মানুষের প্রতি ক্রীতদাসের মত মনোবৃত্তি সম্পন্ন, অথচ তার নিজের চাইতে নিম্নতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত মানুষজনের কাছে সে উৎপীড়ক ও শাসক। ন্যু ইয়র্ক পেপারে এই কথাগুলি প্রকাশিত হবার সময় প্রায় একই সঙ্গে ফ্লবেয়ার এক শারীরিক অস্থিরতার মধ্যে তাঁর বন্ধু লুই ব্যুলেৎ কে লিখেছিলেন: "হজমের ওষুধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, একটা নিষ্পত্তির উপায় সন্ধান, চুঁইয়ে পড়া এক অস্থিরতা, জ্বর, ডায়েরিয়া, তিন তিনটি বিনিদ্র রজনী, বুর্জোয়াদের প্রতি এক বিশাল বিরক্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি—ডিয়ার স্যার, এই হল আমার এক সপ্তাহ"।" ইংরেজ ও ফরাসী ঔপন্যাসিকরা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন একই সমস্যার। সমস্যাটা হল যে সমাজকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারছেন না সেই সমাজকে শৈল্পিক আঙ্গিক এবং অভিব্যক্তি দান করা। ইংল্যাণ্ডে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হয়েছিলেন বাস্তবের সঙ্গে একটা কম্প্রোমইজ করে। কিন্তু ফ্রান্সের ইতিহাস সেই ধরনের

কোন কম্প্রোমাইজ করতে দেয়নি। তা ছিল অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বের অন্য কোন দেশ ফ্রান্সের মত ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেনি। ফ্রান্স দেখেছে ফরাসী বিপ্লব। ফ্রান্স দেখেছে একটানা কুড়ি বছরের সংঘর্ষ, যেখানে ফরাসী সৈন্যরা অভিযান এবং পাল্টা অভিযান চালিয়েছে ইওরোপের সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলির ওপর দিয়ে, যত দিন না এসেছে ১৮১৪ সালের চূড়ান্ত সঙ্কট।

নেপোলিয়ন ছিলেন শেষ বিশাল বিশ্ববিজয়ী, কিন্তু তাছাড়াও তিনি ছিলেন প্রথম বুর্জোয়া সম্রাট। ফ্রান্স সেই বিরাট যুদ্ধযন্ত্রকে সমর্থন করতে সক্ষম হয়েছিল একটি মাত্র কারণে। সেই সময়ে ফ্রান্স তার শত্রু ইংল্যাণ্ডের নাগাল পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ফ্রান্স শুরু করেছিল তার শিল্প উন্নয়নের কাজ, শুরু করেছিল ব্যাপক হারে যন্ত্র শিল্প উন্নয়নের কাজ এবং তার স্বাধীন কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য এক বিশাল, নতুন অন্তর্দেশীয় বাজার তৈরির কাজ। এবং এই প্রক্রিয়া যখন সম্পূর্ণ হল তখন নেপোলীয়নের পতনের পরও এক পুরুষ পেরিয়ে গিয়েছে। এটা এক অদ্ভুত হেঁয়ালি যে, তখন এক সম্পূর্ণ রূপে নতুন ফ্রান্স জন্ম নিল। সেই ফ্রান্সে সব কথার শেষ কথা বলে টাকা, সেই ফ্রান্স ব্যাঙ্ক মালিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ফ্রান্স। আপাতদৃষ্টিতে যে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায়কে বিপ্লব চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল, দেখা গেল তারাই নতুন ফ্রান্সের শাসক। তবুও এই নতুন ফ্রান্সের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য তার প্রাচীন শাসনকর্তাদের সঙ্গেই একান্তভাবে বৈপ্লবিক ছিল। একদিকে ৯৩ এর জ্যাকবিন, আরেকদিকে নেপোলিয়নের সৈন্য।

শতাব্দীর অন্যতম মহান প্রতিভা বালজাক খুব সচেতন ভাবেই এই সমাজের প্রাকৃতিক 'ইতিহাস' লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এবং বালজাক নিজে ছিলেন রাজতন্ত্রবাদী, উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ্বাসী এবং ক্যাথলিক। তাঁর 'কোমেদি হিউমেইঁ' মানবজীবনের বিশ্বকোষ স্বরূপ। এই রচনা তাঁর কালের এক বৈপ্লবিক চিত্র। চিত্রটি এর রচয়িতার উদ্দেশ্যের জন্য বৈপ্লবিক নয়। তৎকালীন মানুষের আন্তর্জীবন সংক্রান্ত যে সততা নিয়ে এটি লেখা, সেই সততাই একে দিয়েছে এর বৈপ্লবিক চরিত্র। ইংরেজ ঔপন্যাসিক মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বালজাকের লেখার বাস্তববাদী নিয়মের ওপর জোর দিয়েছেন:
"যে কোন এমিল জোলার চাইতে যাঁকে আমি বাস্তববাদের অনেক বড় পণ্ডিত বলে জানি, সেই বালজাক তাঁর 'কোমেদি হিউমেইঁ'তে আমাদের ফরাসী সমাজের সবচাইতে বিস্ময়কর, বাস্তব ও ঐতিহাসিক এক চিত্র উপহার

দিয়েছেন। এই বর্ণনা কিছুটা ধারাবিবরণী মূলক কায়দায়, প্রায় বছরের পর বছর-১৮১৬ থেকে ১৮৪৮ সাল অব্দি' অভিজাতদের সমাজের ওপর উদীয়মান বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল আগ্রাসন ও আক্রমণের বর্ণনা। তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে পূর্বতম সমাজের শেষ ভগ্নাংশটুকুও আত্মসমর্পণ করেছে এই অশালীন, অর্থবান নতুন গজিয়ে ওঠা বড়লোকদের কাছে, কিংবা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের হাতে। তিনি বর্ণনা করেছেন সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাকে যাঁর দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা নিজেকে জাহির করারই একটা উপায়। তিনি বর্ণনা দেন কিভাবে সেই মহিলা আত্মসমর্পণ করেন বুর্জোয়ার কাছে, যে তাঁর স্বামীকে নগদ মূল্য বা ক্রেতার পরিবর্তে জিতে নেয় এবং এই মূল চিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি ফরাসী সমাজের এক পূর্ণ ইতিহাস সৃষ্টি করেন। অত্যন্ত বিশ্লেষণ ধর্মী এবং বিস্তারিত বিবরণের ইতিহাস ; এত বিস্তারিত যে, এমন কি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিপ্লবোত্তর সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তির পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধেও আমরা তাঁর লেখাতে একটা স্পষ্ট আভাস পাই। তাঁর লেখা থেকে বস্তুতঃ, আমি অনেক বড় ঐতিহাসিক অর্থনীতিজ্ঞ বা পরিসংখ্যানবিদের লেখার চাইতেও অনেক বেশি কিছু জানতে পেরেছি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বালজাক ছিলেন উত্তরাধিকারবাদী, তাঁর মহৎ সৃষ্টি আসলে সুস্থ সমাজের অবক্ষয়ের দুঃখে শোক সঙ্গীত যে শ্রেণী বিলুপ্তির পথে, তাঁর সহানুভূতি তাদের প্রতি। কিন্তু তার চাইতেও তাঁর ব্যঙ্গ আরো অনেক বেশী ধারালো, তাঁর ব্যাজস্তুতি আরো তীক্ষ্ণ, যখন তিনি তাঁর সবচাইতে বেশি সহানুভূতির লোক, অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। এবং একমাত্র যাদের সম্বন্ধে তিনি অপকট প্রশংসায় সরব তারা তাঁর তিক্ততম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী—তারা হল ক্লয়ৎর্-সেইণ্ট মেরীর রিপাবলিকান নায়কের দল, যারা সেই সময়ে (১৮৩০-৩৬) সত্যিই জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিল। বালজাক যে এভাবে নিজের শ্রেণীসহানুভূতির এবং নিজস্ব রাজনৈতিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি যে এভাবে তাঁর প্রিয় অভিজাতদের পতনের প্রয়োজনীয়তা দেখেছিলেন এবং এদের পক্ষে আরো ভাল কোন ভবিষ্যৎ আসার দরকার নেই বলে ঘোষণা করেছিলেন—এখানেই বাস্তববাদের অন্যতম মহান জয়যাত্রা ; এখানেই পুরনো বালজাকের অন্যতম মহান বৈশিষ্ট।"

বালজাক নিজেই "কোমেদি"র মুখবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষকে তিনি দেখেছিলেন সমাজের এক সৃষ্টি হিসেবে, মানুষকে তিনি দেখেছিলেন তার প্রাকৃতিক পরিবেশে, এবং একজন বড় প্রকৃতিবিদ্ যে ভাবে গভীর মনোনিবেশ-

সহকারে প্রাণীজগৎ অধ্যয়ন করেন, মানুষকে সেই গভীরতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করা তাঁরও ইচ্ছে ছিল।

তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু মেয়েদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি, মানবজীবনের কয়েকটির এই ধারণা—এসবই বিপ্লবের ফলপ্রসূত; এ সব সেই জেকোবীয়নদের সৃষ্টি যারা নির্দয়ভাবে ফরাসী সমাজের সামাজিক বন্ধনগুলোকে তছনছ করে দিয়েছিল; এ সব সেই কুচকাওয়াজের সৈন্যদের সৃষ্টি যারা ইওরোপের রাজারাজড়াদের নেপোলিয়নের সামনে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল। বস্তুতঃই বালজাক ছিলেন ফ্রান্সের সাহিত্যে নেপোলিয়ন কেননা নেপোলিয়ন যেভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করেছিলেন, তিনিও সেভাবে সাহিত্যে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করেছিলেন। রেস্টোরেশন ফ্রান্সে ধনতান্ত্রিক সমাজিক সম্পর্কাবলীর সমালোচনা রোম্যান্টিসিজমের এক মধ্যযুগীয় ছদ্মবেশের আড়ালে ছিল। রোম্যান্টিকদের ব্যক্তিগত জীবন এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অসংযমিতা, আতিশয্য ইত্যাদি ছিল বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বাস্তব থেকে পলায়নের এক লক্ষণ। বালজাক প্রতিবাদও করেননি, পলায়নও করেননি। তাঁর মধ্যে রোম্যান্টিকদের সকল কল্পনা, কাব্যময়তা এবং এমনকি রহস্যময়তাও বর্তমান ছিল। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত সেসবের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেছেন এবং বর্তমানের ওপর তাঁর বাস্তববাদী আক্রমণের মধ্য দিয়ে তিনি পথ দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন এক সাহিত্যের। সমসাময়িক জীবনকে তিনি কাল্পনিক উপায়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রায় রাবেলাঁ এবং সার্ভান্তেঁর মতই প্রকাশ করেছিলেন। শতাব্দীর প্রথমভাগে অধিষ্ঠান করেছিলেন বালজাক, এ তাঁর সৌভাগ্য। কেননা, যে জাতীয় শক্তির উৎসাহ ও আগুন, ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের মহাকাব্য সম্ভব করেছিল, তা তিরিশ ও চল্লিশের দশকের প্রথমভাগে তখনও অনুভূত হত খুব জোরালো ভাবেই।

বালজাক থেকে ফ্লবেয়ারের পথ অনেক দূর। ফ্লবেয়ারের মধ্যে একমাত্র ক্রিয়াশীল ছিল বুর্জোয়াজির ওপর একচেটিয়া ঘৃণা ও বিরক্তি। এবং এই শ্রেণীর ওপর তাঁর এমন একটা শারীরিক ও মানসিক দুশ্চিন্তা কাজ করেছিল যে এই ঘৃণিত শ্রেণীর ওপরেই সম্পূর্ণভাবে একটি উপন্যাস লিখে গিয়েছিলেন তিনি। বালজাক তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজতন্ত্রবাদ এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বিতার জন্য সচেতনভাবে গর্বিত ছিলেন। গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের ডায়রিতে লিখে গিয়েছিলেন, যে কোন ধরনের রাজনীতিজ্ঞের ওপরে আস্থা রাখার ব্যাপারে

তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ বা মোহমুক্তি শেষপর্যন্ত তাঁদের এমন একটা জায়গায় এনে দিয়েছিল যে, যেকোন বিশ্বাস বা মতবাদের ওপর তাঁদের একটা অনীহা এসে গিয়েছিল, যে কোন ধরনের শাসক শক্তির ব্যাপারে এসেছিল তাঁদের সহনশীলতা এবং রাজনৈতিক আবেগের ক্ষেত্রে তাঁদের এসেছিল এক সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতা। যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই একজন মারা যেতে পারত, যে কোন ধরনের সরকারেরই শাসনব্যবস্থার আওতায় থাকতে পারত যে কেউ, তা সে সরকারের প্রতি যত বিরূপতাই থাকুক না কেন। নিছক শিল্প ছাড়া আর কোন কিছু ছিল না যাতে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, সাহিত্য ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাস সম্বন্ধে স্বীকারোক্তির একমাত্র প্রশস্ত স্থান।"

গ্যকুঁর ভ্রাতৃদ্বয়ের থেকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাবান অনেক লেখক, যাঁদের নাম ফ্লবেয়ারের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায় না, তাঁরাও এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন এবং এখনও করেন যে, এখন আমাদের উচিত এই আপাতদৃষ্ট দৃষ্টিবিভ্রম এবং জীবনবিচ্ছিন্নতার মূল উৎসের সন্ধান করা। 'আপাত দৃষ্ট', বলা হচ্ছে কেননা, সেই মহান লেখক হচ্ছেন ফ্লবেয়ার যিনি কোন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তো যানই নি, বরং যে বুর্জোয়া সমাজকে তিনি ভয়ঙ্কর ঘৃণা করতেন তার বিরুদ্ধে আমৃত্যু চলেছিল তাঁর সংগ্রাম।

গ্যকুঁর ভ্রাতৃদ্বয় বালজাককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। র‍্যাবেলীয় এই প্রতিভাধর সম্বন্ধে তাঁর ডায়রিতে অনেক কিছুই লিখে গিয়েছেন। তাঁদের মত ফ্লবেয়ারও তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে তাঁকে চিরদিন স্মরণ করেছিলেন। কিন্তু গুরু এবং শিষ্যদের মধ্যে সময়ের না হলেও, দৃষ্টিভঙ্গির এই বিরাট দূরত্ব আসে কোথা থেকে? ফ্লবেয়ারের জেনারেশনের আবির্ভাবের আগেই মহান বিপ্লব ও তৎসংক্রান্ত ফলাফলপ্রসূত উৎসাহ ও শক্তি ঝিমিয়ে পড়েছিল। শ্রেণীসংগ্রামের তিক্ততা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের লুণ্ঠনজীবী মনোবৃত্তি এতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে শেষ অব্দি তা এক বিরক্তি ও ক্লান্তিকর ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছুর উদ্রেক করছিল না। অথচ বালজাক তখনও অনুপ্রাণিত সেই সৃষ্টিধর্মী শক্তির দ্বারা, যে শক্তি এই সমাজের সৃষ্টিকর্তা। এবং তিনি তখনও আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন তা বোঝার।

উনবিংশ শতাব্দীর লিবারাল রাজনীতিজ্ঞদের মুখনিঃসৃত তিরানব্বইয়ের দশকের গণতান্ত্রিক এবং জ্যাকোবিন আদর্শসংক্রান্ত কথাবার্তা ক্রমেই অসহনীয় কিছু নীরস মামুলি মন্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ধনতন্ত্রের সব কিছুকে একই জমির ওপরে এনে দাঁড় করানোর স্পৃহা, যাবতীয় মানবিক ও স্বর্গীয় বিষয়কে টাকা-

পয়সায় মাপজোক করার প্রবণতা ইত্যাদি ক্রমেই আরো প্রতীয়মান হয়ে উঠছিল। বালজাক এক অনবদ্য ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রাচীন অভিজাত তন্ত্রের অবক্ষয়। এই অবক্ষয় কিন্তু সেই সমাজের পুরনো রূপটিরই এক অবক্ষয়িত রূপ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এই প্রচ্ছায়া এক ক্লেদাক্ত প্রেতাত্মার মত আঞ্চলিক পল্লীভবনের বিস্মৃত ড্রইংরুমে অস্পষ্ট গোঙানী হয়ে কাঁপছিল, অথবা স্থূল অর্থের পরিমাপে আবদ্ধ নব্য অভিজাততন্ত্রের থেকে তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাচ্ছিল না। কেবলমাত্র ফ্লবেয়ার এবং তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর পরিচিত ইউটোপীয় রূপের সমাজতন্ত্র তাঁদের কাছে লিবারাল রাজনীতিজ্ঞদের জঘন্যতম আতিশয্যের মতই মূর্খসুলভ এবং অবান্তর ছিল। কেননা প্রতিনিয়তই এই লিবারাল রাজনীতিজ্ঞরা কথায় বা কাজে তাঁদের মহান পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেন। সমস্ত মূল্যবোধকে একস্তরে নামিয়ে আনারই অন্যতম রূপ ছিল সমাজতন্ত্র, যা তাঁদের এতটা বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত করেছিল। সমাজতন্ত্রের পক্ষে অশিক্ষিত জনতার ভাবাবেগপূর্ণ আদর্শীকরণ ছিল আরো বিরক্তিজনক।

১৮৪৮ সাল অনেক ভ্রান্ত ধারণার সমাপ্তি দেখেছিল। পূর্বতন তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আর কেই বা বিশ্বাস করতে পারত যে মিষ্টি কথায় ফুলকে ভোলান যায়? যখন প্যারীর শ্রমিকরা স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বর জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছিল, জুন মাসের সেই দিনগুলি ছিল আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বাভাস। ফ্লবেয়ার সামাজিক ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না বা মানবজাতির অর্থনীতিক চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যেরও ছাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক। তাঁর কাছে জুন মাসের সেই দিনগুলি কেবল প্রমাণ করে দিয়েছিল যে অন্তঃসারশূন্য শ্লোগানের সঙ্গে বজ্জাতি করলে শুধু সেইসব অসৎ শক্তিগুলিকেই জাগিয়ে তোলা হবে যারা সুসভ্য সমাজের অস্তিত্বের সামনে একটা বিরাট ভীতিপ্রদর্শক বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। লুই নেপোলিয়ন নামক অসৎ শক্তিটির একনায়কতন্ত্র ছিল বুর্জোয়াজির পুজো, এবং তা একমাত্র পূর্বতন বৎসরগুলিতে কৃত ভুলেরই ফল। অতএব উদারনৈতিক বুর্জোয়াজির যাবতীয় মধুর ইলিউশনের পরিসমাপ্তির এক তিক্ত এবং ব্যজস্তুতিপূর্ণ চিত্র হল "Education Sentimentale," যে ইলিউশন ১৮৪৮ সালের লাল পতাকা এবং জুন মাসের রাইফেলের অগ্ন্যুদ্গার পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। এরপর আসে সাম্রাজ্যের চরিত্র-হীনতার প্রসঙ্গ। কোন কিছুই আর পূর্বাবস্থায় আসতে পারবে না এরকম একটা ধারণা চলে আসে এবং মানুষ খুব সহজেই আত্মসমর্পণ করে সামাজিক

অবক্ষয়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার কাছে। যুদ্ধ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও পাশবিক ক্ষুধা নিয়ে তখন অশালীন বুর্জোয়ারা সভ্যতার ধ্বংসসাধনে তৎপর।

অনেক সময় মনে করা হয় শিল্পীর ঈশ্বরতুল্য বস্তুবাদিতা সম্পর্কিত ফ্লবেয়ারের যে তত্ত্ব, তার সঙ্গে বালজাকের সামাজিক মানুষের প্রাকৃতিক ইতিহাসের তত্ত্বের কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ পার্থক্য কিন্তু আছে যথেষ্ট পরিমাণে। বালজাকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে, সরল, মৌল ও ভ্রান্ত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাস্তববাদী। মানবসমাজকে তিনি দেখেছিলেন ইতিহাসোচিত ভঙ্গিতে। মানব সমাজকে তাঁর মনে হয়েছিল অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াকু এবং ক্রমবিকাশের দিকে ধাবমান এক সমাজ। ফ্লবেয়ারের কাছে জীবন মৃত এবং গতিহীন এক জড় পদার্থ। ১৮৪৮ এর পরে জীবনকে তার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে দেখা বা অভিব্যক্ত করা যেত না। কেননা সেই ক্রমবিকাশ ছিল খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং অত্যন্ত তীব্র ছিল বৈপরীত্য। সুতরাং ফ্লবেয়ারের কাছে জীবন ছিল জমে যাওয়া এক জলাশয়ের মত। নিজের স্ত্রীর কাছে তিনি লিখেছিলেন, "আমার খুব ইচ্ছে করে একটা বই লিখতে যার কোনও বিষয়-বস্তু থাকবে না, বহির্জগতের সঙ্গে যার কোন সংযোগ থাকবে না, যা সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে থাকবে লেখার স্টাইলের অন্তর্নিহিত জোরের ওপর, ঠিক যেভাবে দৃশ্য গোচর কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেই পৃথিবীটা ঝুলে থাকে শূন্যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে। লিখতে ইচ্ছে করে এমন এক বই যার কোন বক্তব্য থাকবে না, কিংবা থাকলেও পুরোপুরি অদৃশ্যভাবে তা থাকবে, যদি অবশ্য তা সম্ভব হয়। সব চাইতে ভাল বই সেগুলিই, যাদের মধ্যে বক্তব্য বিষয় খুবই কম। অভিব্যক্তি যতই চিন্তাভাবনার কাছাকাছি আসে, শব্দ যত বেশি আসক্তি দেখিয়ে তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়, একটা লেখা ততই সুন্দর হয়ে ওঠে।"

যেই একবার এই দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হল, নব্য বাস্তবতাবাদের পথও সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল। নব্য বাস্তববাদ জীবনকে টুকরো টুকরো করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও বাস্তবসম্মতভাবে তার অধ্যয়নে রত হল। কিন্তু জীবন বস্তুটি এতই অবাধ্য যে তাকে কোনমতেই শৈল্পিক উপায়ে অঙ্গব্যবচ্ছেদ করে বাস্তবোচিত অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়ে উঠলনা। স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের কোন্ অংশটিকে আলোকিত করতে হবে সেই ব্যাপারে ঔপন্যাসিকরা অত্যন্ত খুঁত-খুঁতে হয়ে উঠলেন যদিও অধিকাংশ সময়ই এই পরিশ্রমের সমাপ্তি ঘটত খুবই নগণ্য ও তুচ্ছ কোন লেখার মধ্য দিয়ে। অন্যান্যরা এই তত্ত্ব তাঁদের

দৃষ্টি ভঙ্গির ওপর যে সঙ্কীর্ণতা আরোপ করতে এসেছিল, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফ্রয়েড ও দস্তয়েভস্কির কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের নিজস্ব চৈতন্যপ্রবাহের একটি কাব্যিক চিত্র উপহার দেওয়া। সুতরাং শেষ অব্দি উপন্যাস দ্বিমুখী ধারায় এসে পড়েছিল।

যাইহোক, ফ্লবেয়ার ছিলেন সৎ এবং মহান শিল্পী। তাঁর উত্তরাধিকারীরা জীবনের সামগ্রিক বাস্তবতাকে ধরার চেষ্টা না করে, জীবনকে দুভাকে ভাগ করে দেখতে পারলেও ফ্লবেয়ার সেরকম সহজ আত্মসমর্পণের মধ্যে যাননি। তাঁর চিঠি-গুলিই তাঁর জীবনের সঙ্গে সংগ্রামের, বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামের এক স্বীকারোক্তি। এই বাস্তব তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। কিন্তু তা সত্বেও তিনি এই বাস্তবকে ধরতে এবং তাকে শৈল্পিক অভিব্যক্তি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ফ্লবেয়ারের মত ক্রোধ ও ঘৃণা নিয়ে বুর্জোয়াজির বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার হয়নি। "আমি মানব সমাজকে আমার বমির মধ্যে ঢেউ ডুবিয়ে দিতে চাই", লিখেছিলেন তিনি। এবং মানবসমাজ কথাটি তিনি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেননি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে মানবসমাজ হল ১৮৭১ এর পারী কমিউনের অব্যবহিত পরে, উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সমাজ।

তাঁর প্রতিটি চিঠিতে ধরা পড়ে তাঁর অভিব্যক্তির ভাষা সন্ধানের যন্ত্রণা। মাদাম বোভারির শুঁড়িখানার দৃশ্যাঙ্কনে তিনি সময় নেন দু'মাস, যদিও উপন্যাসে দৃশ্যটির স্থায়িত্বকাল মাত্র তিনঘণ্টা। বারবার তিনি উল্লেখ করেছেন যে গত মাসে তিনি লিখেছেন পাতা বিশেক মাত্র। আমরা জানি ফ্লবেয়ার সঠিকতম বাগধারাটির জন্য, সঠিকতম শব্দটির জন্য থাকতেন সদা সচেষ্ট। কিন্তু তাই কি সব? একজন শিল্পীর সত্তা কি কেবলমাত্র স্টাইলের উৎকর্ষেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে? কোনমতেই নয়। স্টাইল এবং আঙ্গিকের দিকে খুব বেশি পরিমাণে নজর দিলে সেই লেখা খুব উৎকৃষ্ট মানের হতে পারেনা, একথা তিনি নিজেই বলেছেন। আরেক জায়গায় তিনি সরাসরি ঘোষণা করেছেন, স্টাইলের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ নির্ণয়ের কোন মানদণ্ড আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে তিনি নিজেও খুব একটা নিশ্চিত নন। বিশ্বের মহান লেখকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়েছেন, "তাঁদের স্টাইলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। তাঁদের যাবতীয় দোষত্রুটি সত্বেও, বরং সেইসব দোষত্রুটির জন্যই, তাঁরা কত শক্তিশালী! কিন্তু আমরা, যারা অনেক ছোট লেখক, কেবলমাত্র আমাদের কার্যসম্পাদনের উৎকর্ষটাই দেখে থাকি।...এখানে আমি একটা প্রস্তাব দেব, যা অন্য কোথাও দিতে

সাহস পাবোনা জানি; তা হল, অনেক সময়ই মহৎ লেখকদের হাত দিয়ে খারাপ লেখা বেরিয়েছে, অথচ যা তাঁদের নিজেদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল। তাঁদের মধ্যে আমরা আঙ্গিকভিত্তিক শিল্প খুঁজতে যাব না! বরং আঙ্গিক খুঁজতে যাব হোরেস বা ল্য ব্রুয়্যের-এর কাছে।"

তা সত্ত্বেও ফ্লবেয়ার যে সকল লোকেদের মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে আবদ্ধ থেকে, শারীরিক ও মানসিক উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিন কাটাননি। কেননা তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সারির লেখক, আঙ্গিকগত উৎকর্ষের সন্ধানে সদাব্যস্ত। তবুও তা সব নয়। তিনি এক মহান এবং সৎ শিল্পী। যে পৃথিবী এবং যে জীবনকে তিনি ঘৃণা করতেন তাকে প্রকাশ করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক। এবং সেই সংগ্রামে তাঁর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কম্প্রোমাইজ, তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে তাঁর পূর্ণ শিল্পতত্ত্ব। "শিল্পের সঙ্গে শিল্পীকে কোনমতেই গুলিয়ে ফেললে চলবে না। লাল সবুজ বা হলুদ রং তিনি যদি ভাল না বাসেন, তবে কোন কথাই নেই। যে কোন রংই সুন্দর, এবং তার কাজ হল সেই রংকে তুলে ধরা।... গাছের পত্রালীর দিকে আমরা চোখ মেলে তাকাই না কেন? প্রকৃতিকে বুঝতে গেলে মানুষকে প্রকৃতির মতই শান্ত হতে হবে।" কিংবা যে চিঠিতে তিনি উপসংহার টেনেছেন তাঁর যাবতীয় চিন্তাভাবনার—"শিল্পী তাঁর কাজের মধ্যে থাকবেন, ঈশ্বর যেরকম আছেন এই বিশ্বসংসারে, সেরকম। তিনি সর্বস্থানেই উপস্থিত কিন্তু কোনোখানেই দৃষ্টিগোচর নন; শিল্প হল দ্বিতীয় প্রকৃতি, এই প্রকৃতির স্রষ্টাও একই রকম প্রণালীতে কাজ করে যাবেন! প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি বৈশিষ্টে, সব সময় অনুভূত হবে এক প্রচ্ছন্ন এবং অসীম অনতিক্রম্যতা।"

ফ্লবেয়ার নিজে তাঁর অনুশাসনানুযায়ী চলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এরূপ ঈশ্বর আসক্তি বা ঘৃণা কোনোটাই অনুভব করতে পারেননি। ফ্লবেয়ারের গোটা জীবনে স্পন্দিত ছিল ঘৃণা, তাঁর সমকালের প্রতি এক পবিত্র ঘৃণা, যা প্রকারান্তরে ছিল সমকালের মানুষের প্রতি আসক্তি বা ভালবাসা। সেই মানুষ এমন এক সমাজ দ্বারা বঞ্চিত, যন্ত্রণা দগ্ধ এবং কলঙ্কিত যে সমাজে মূল্যবোধের একমাত্র মানদণ্ড ছিল সম্পত্তি। Bouvard and Pe´cuchet উপন্যাসের ব্যঙ্গস্তুতি-ময়তায় অবশেষে সেই সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়। "গৃহীত ধারণাবলীর অভিধান" নামক একটি গ্রন্থ সম্পর্কিত তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে এই উপন্যাস উদ্ভূত। উক্ত গ্রন্থে সমাজে 'শ্রদ্ধাভাজন বা মান্যগণ্য

লোক হতে গেলে যে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন, তার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে।"

ডিকেন্সের মতই ফ্লবেয়ারও ছিলেন একজন মহৎ ঔপন্যাসিক। তাঁকে এক বিশাল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। সেই সমস্যা তৎকালীন সমাজের বাস্তবযুগ চিত্রণের সমস্যা। মানবতাবাদের যে মানদণ্ডগুলিকে আমরা সাধারণ উত্তরাধিকার বলে মেনে নিয়ে থাকি, সেই সমাজের ভিত্তিভূমিতেই প্রোথিত ছিল সেই মানদণ্ডগুলিকে অস্বীকার ও অপমান করার এক ঘৃণ্য প্রবণতা। ভাববাদী রোমান্টিসিজমের মধ্য দিয়ে কম্প্রোমাইজ করে ডিকেন্স তাঁর সমস্যার সমাধান করেছিলেন। ইংরেজ পারিপার্শ্বিকতায় তাঁর পক্ষে এ ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না। ফ্লবেয়ারের সময় ছিল ১৮৭৮ এর জুন মাসের ফ্রান্স, তাঁর সময় ছিল, তৃতীয় সাম্রাজ্যের সময়, ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধ ও কমিউন এর সময়। অতএব তাঁকে অন্য রাস্তা বেছে নিতে হয়েছিল। তাঁর নিজের মানসিকতা এবং আপোষবিরোধী সততাই যে কেবলমাত্র তাঁকে ভাবময়তাব পথে যেতে বাধা দিয়েছিল তাই নয় (আর অপেক্ষাকৃত পেছনের সাবির লেখকদের কাছে সেই পথ বেছে নেওয়া কত সহজ ছিল, দোদে-ই তা দেখিয়ে গিয়েছেন), এমনকি ফরাসী জীবনযাত্রার রুক্ষ বাস্তবতাও তাঁর পশ্চাদপসাবণের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সংঘাত থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। অসীম যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জন্য তৈবি করে নিয়েছিলেন এক অবাস্তব বস্তুবাদিতা। সম্পূর্ণভাবে লৌকিক এক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে চেষ্টা করেছিলেন জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিককে আলাদা করে নিতে। ফ্লবেয়ার তৎকালীন জীবনকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে তাঁর সময়কার অন্য যে কোন লেখকের চাইতে বেশি কষ্ট সহ্য করেছিলেন, সমসাময়িক অন্যান্যদের চাইতে তিনি তাঁর সময়ের সঠিক হৃদস্পন্দন ধরতে পেরেছিলেন অনেক বেশী গভীরভাবে। তা সত্ত্বেও তিনি তা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারেননি। গভীর আবেগ এবং প্রগাঢ় ঘৃণায় অসহায় ফ্লবেয়ার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বর্ণহীন বস্তুতে পরিণত হয়েছেন, পাণ্ডিত্যাভিমানীদের প্রস্তাবিত সেই "বিশুদ্ধ শিল্পী"র এক উদাহরণ হতে হয়েছে তাঁকে। "বিশুদ্ধ এক রমনী" অপেক্ষা একজন "বিশুদ্ধ শিল্পীকে" কেন আমরা অধিক পরিমাণে প্রশংসা করব তা তৎকালের একাধিক রহস্যের অন্যতম। কেন কেবল একজন শিল্পী বা নিছক একজন রমনী নয়? উভয়েই চমকপ্রদ এবং উভয়েই কষ্ট সহ্য করেন, যদিও তা সুন্দর হবার জন্য নয়।

ফ্লবেয়ারের সমসাময়িকদের একজন তাঁর মতই সৃষ্টির যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করেছেন, যিনি তাঁর মনের গভীরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বাস্তবের উপর কর্তৃত্ব করতে এবং তাকে ঢেলে সাজাতে। এবং যিনি সেই কর্মসাধনের জন্য দিনের পর দিন নিজেকে যন্ত্রণা দিয়েছেন, কষ্ট দিয়েছেন সেই বাস্তবকে প্রকাশ করার মত সংক্ষিপ্ত আয়তন ও সঠিক শব্দটি খুঁজে বের করতে সেই শিল্পীর সমূহ লেখন ও পুনর্লিখন, বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস, ভালবাসা ও ধারণা অনেক বেশি গভীর এবং শেষ অবধি তিনি পৃথিবীকে তাঁর প্রতিভার কিছু খণ্ডাংশমাত্র দিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর নাম কার্ল মার্ক্স। যে সমস্যা তাঁর সমকালীন অনেককেই চিন্তিত করেছিল তার যথাযথ সমাধান করেছেন তিনি—তা হল উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী ধনতান্ত্রিকসমাজের ঐতিহাসিক বৃদ্ধিকে বোঝার সমস্যা।

গ্যাতিয়েরকে ফ্লবেয়ার বলেছিলেন, "আঙ্গিকের থেকেই ধারণার উৎপত্তি"। গ্যাতিয়ের এই কথা কয়টিকে বস্তুবাদী ভাবনাচিন্তার চূড়ান্ত সঙ্কেত জ্ঞাপক বলে মনে করতেন। মার্ক্সের মতে বিষয়বস্তুই আঙ্গিক নিরূপণ করে দেয়, কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে এক গভীর সম্পর্ক, ঐক্য, এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। ফ্লবেয়ারের আদর্শ ছিল 'কোন বক্তব্য ছাড়াই' একটি বই লেখা; বিশুদ্ধ আঙ্গিক সর্বস্বতার কাজ, যেখানে ইতিহাস এবং বাস্তবতথ্য থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে যৌক্তিকতাকে। এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে তখন যখন এই ধারণা পুরোপুরি ভাববাদে রূপান্তরিত হয়। ভাবের হাতে বস্তু হয়ে ওঠে এক নিষ্ক্রিয় উপাদান। ঔপন্যাসিক পর্যবসিত হন নিছক এক আলোকচিত্রশিল্পীতে।

ফরাসী বাস্তববাদীদের এক কঠোর সমালোচক ছিলেন মার্ক্সের জামাতা ল্যাফার্গ। দুইটি প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন "মার্ক্স কেবলমাত্র উপরিভাগে দৃষ্টিপাতই করেননি, তিনি অনুসন্ধানী হয়েছেন আরও গভীরে, বিভিন্ন উপাদানগুলিকে এবং তাদের পারস্পরিক প্রক্রিয়াগুলিকে পরীক্ষা করেছেন তীক্ষ্ণভাবে। প্রতিটি অংশকে আলাদা আলাদা করে তার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন তিনি। তারপর তিনি অগ্রসর হয়েছেন আলোচ্য বিষয় এবং তার সংলগ্ন পরিবেশের প্রতি; দেখেছেন বস্তুর ওপর, পরিবেশের ওপর বস্তুর কি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তারপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন বস্তুতে, বস্তুর পরিবর্তন এবং আন্দোলনে এবং নিজেকে প্রথিত করেছেন বস্তুর চূড়ান্ততম ক্রিয়াকলাপের গভীরে। তাঁর চোখে কোন বস্তুরই সংলগ্ন পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন পুরোপুরি স্বতন্ত্র একটি অস্তিত্ব ছিলনা। বরং উল্টোটা। তাঁর চোখে প্রতিটি বস্তুই ছিল জটিল এবং সতত গতিশীল একটি

সম্পূর্ণ জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মার্ক্স চেষ্টা করেছিলেন সেই জাগতিক জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরতে, বিশ্লেষণ করতে। চোখের সামনে যা দেখা যায় তারই পুনর্গঠন করতে গেলে লেখককে যে যে অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয় সেই সম্বন্ধে বলে গেছেন গ্যঁকুর পন্থী ও ফ্লবেয়ার পন্থীরা। কিন্তু তাঁরা কেবল সারফেস বা উপরিভাগটির চিত্রই অঙ্কিত করতে চান, কেবলমাত্র যে অনুভূতি তাঁরা লাভ করেন তারই ছবি আঁকতে চান। মার্ক্সের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁদের সাহিত্যকর্মকে ছেলেখেলা বলে মনে হয়। বাস্তবের ধ্যানধারণা অতটা ব্যাপক ও গূঢ়ভাবে উপলব্ধি করাব জন্য প্রয়োজন ছিল অসাধারণ মানসিক জোর, এবং যা দেখা হচ্ছে বা যা বলার ইচ্ছে হচ্ছে তা যে কোন অংশে কম নয় একথা বলার প্রয়োজন বোধ করেছিল শিল্প"।

মার্ক্সের সৃজনশীল প্রক্রিয়ার সঠিক পর্যালোচনা করেছেন ল্যাফার্গ। ফ্লবেয়ারের প্রক্রিয়ার ত্রুটিও তিনি দেখিয়েছেন। যদিও তিনি জানতেন না যে ফ্লবেয়ার নিজেও তাঁর মনমানসের গভীর গভীরতম প্রদেশে নিজস্ব ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে খুব ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। যে চালিকাশক্তি ফ্লবেয়ার ও গ্যঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁদের শৈল্পিক ছকে চালিত করেছিল সে সম্বন্ধেও ল্যাফার্গ পরিষ্কার কোন ধারণার অধিকারী নন। শেষের এই মূল বক্তব্য সম্বন্ধে ডায়রিতে কিছু মনোগ্রাহী আলোকসম্পাত পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে এডমণ্ড লেখেন যে "প্রতি চারশো বা পাঁচশো বছর পরপর পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বর্বরতার প্রয়োজন। সভ্যতা পৃথিবীকে মেরে ফেলতে পারে, পুরনো ইওরোপে কোন সুন্দর দেশের বৃদ্ধজনসাধারণ যদি রক্তহীনতায় আক্রান্ত হতেন তাহলে উত্তর থেকে এসে শূন্যস্থান পূরণ করতেন ও যাত্রা চালিয়ে যেতেন দীর্ঘদেহী আরো কিছু মানুষ। ইওরোপে এখন আর বর্বর জাতি নেই। তাদের কাজ সমাধা করবেন এখন শ্রমিকরা। একে আমরা সামাজিক বিপ্লব বলতে পারি।"

কমিউন-এর মধ্যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "খেটে খাওয়া জনসাধারণের হাতে সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হচ্ছে ফ্রান্স, বন্দী হয়ে পড়ছে অভিজাতরা, বুর্জোয়ারা এবং কৃষিজীবীরা। সব মালিকের হাত থেকে গদী চলে যাচ্ছে এমন শ্রেণীর হাতে যারা কোন কিছুরই মালিক না, চলে যাচ্ছে বস্তুস্বার্থান্বেষী সমাজের ধারকদের হাত থেকে এমন লোকেদেব হাতে যাদের নিয়মশৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা এবং রক্ষণশীলতার ওপর কোন আকর্ষণই নেই। সবসত্ত্বেও, সম্ভবতঃ বস্তুর পরিবর্তনের মহান নিয়মানুসারেই শ্রমজীবীরা প্রাচীন সমাজের বর্বরদের ভূমিকা নিয়ে নিচ্ছে, ধ্বংস এবং বিচ্ছিন্নতার স্পন্দমান প্রতিভূদের ভূমিকা।"

ধ্বংসের প্রতিভূ ছাড়া শ্রমজীবীদের আর অন্য কোন ভাবে গ্যঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় বা ফ্লবেয়ার দেখতে পারেননি। বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কিত কোন মোহ কিন্তু তাঁদের গ্রাস করেনি। এই সমাজের লোভ, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সামাজিক মূল্য-বোধের অভাব, সব কিছুকে সমান করে দেখার ধৃষ্টতা, মানুষকে ছোট করে দেখার প্রবণতা—এসব কিছুকে তাঁরা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন।

কিন্তু সেই সমাজের কোন বিকল্প তাঁরা দেখতে পাননি, এবং এখানেই তাঁদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের দুর্বলতা। ফ্লবেয়ারের মৃত্যুর পর সমালোচনামূলক বস্তুবাদ আর বেশীদূর এগোতে পারেনি, কেননা, ইতিমধ্যেই তিনি যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম এর পেছনে ব্যয় করে ফেলেছেন। কাজেই ঔপন্যাসিক হয় সমাজকে তার পূর্ণ গতিশীলতার মধ্যে দেখবেন, যা দেখেছিলেন বালজাক, অথবা তিনি সম্পূর্ণ ভাববাদী হবেন, আত্মমুখীনতায় লিপ্ত থাকবেন, অস্বীকার করবেন স্থান, ব্যাপ্তি ও সময়কে, অর্থাৎ মহাকাব্যিক গঠনকে তিনি ধ্বংস করবেন। এছাড়াও আরেকটা অসুবিধের কথা আসে। একশো বছরেরও বেশিদিন ধরে এই অসুবিধে অনুভূত হচ্ছে, চূড়ান্ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে তার সমাধান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা। এই প্রশ্ন হল জীবনের প্রতি সংহত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন, আদৌ মানুষ চরিত্র নিয়ে লিপ্ত থাকা যাবে নাকি তার প্রশ্ন।

রেনেশাঁর মহান ঔপন্যাসিকরা এই অসুবিধে ভোগ করেননি। তাঁদের মানবতাবাদ তাঁদের ধ্যানধারণার পথে চালিত করেছিল ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছিল। রেনেশাঁ সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন মহত্তম দার্শনিকত্রয়—স্পিনোজা, দেকার্তে এবং বেকন। অবশ্যই এখানেও দেকার্তে এবং স্পিনোজার মধ্যে মানবিক মননশীলতা নিয়ে আপাতদৃষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্যণীয়; তবে সেই মতবিরোধ এমন কোন সংঘাতের মধ্যে শেষ হয়নি যা কিনা গোটা দার্শনিক সংহতির জগতে ভাঙচুর এনে দিতে পারে। সব মিলিয়ে ইংরেজ ও ফ্রেঞ্চ বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকরা জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ফলস্বরূপ তাঁদের কাজে সম্পূর্ণতা ও সঞ্চারী শক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটিত, যখন ইওরোপের সামন্ততান্ত্রিক শেষ খুঁটিটিও উপড়ে ফেলছে যুদ্ধ এবং বিপ্লব, গড়ে উঠছে নতুন নতুন দেশ, তখন সেখানে আর কোন দার্শনিক সংহতি ছিলনা। আদর্শবাদকে কান্ট ও হেগেল যে সুষ্ঠু বিকাশের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে কোন বাস্তববাদীও সাময়িকভাবে বিচলিত বোধ করতে পারতেন। মানবজীবন সম্বন্ধে কোন সংহত দৃষ্টিভঙ্গি সেই শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিলনা। যার জন্য

ঔপন্যাসিকের পক্ষে এক বিশেষীকৃত উপায়ে ব্যতীত, জীবনের বা ব্যক্তিচেতনার এক একটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন অংশবিশেষের ওপর আলোকপাত করা ছাড়া আর অন্য কোন পথ ছিল না। ফ্লবেয়ারের চিঠিপত্রে এই অভাববোধ পরিস্ফুট।

তৎকালীন দার্শনিক, কান্ট, হেগেল, দেকার্ত, হিউম এবং অন্যান্যদের তিনি কিভাবে তন্নতন্ন করে উল্টেপাল্টে, খুঁজেছেন, তা তিনি নিজেই বলেছেন। তিনি সবসময়ই অনুভব করেছেন স্পিনোজার কাছে ফিরে যাবার আকুল আকাঙ্ক্ষা, ঠিক যেভাবে গঁ্যকুর ভ্রাতৃদ্বয় অনুভব করেছিলেন দিদেরোর দ্বান্দ্বিক ভাবনাচিন্তায় ফিরে যাবার এক দুর্মর বাসনা। কিন্তু শেষ অব্দি তাঁদের মনে হয়েছে সমসাময়িক পৃথিবীতে দার্শনিক ভিত্তিভূমির সন্ধান কোনদিন পূর্ণ হবার নয়। তাঁরা ফিরে এসেছেন।

ফ্লবেয়ার এবং তাঁর অনুগামীরা যে বারবার এবং অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা বা নিষ্ফলতা বোধ করেছেন, এ তাঁদের দুর্ভাগ্য। এটাই ট্রাজেডি যে তাঁরা সবসময়ে রাবেলা, সার্ভাতেঁ, দিদেরো, বালজাক প্রমুখ অতীতের মহানায়কদের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অতি সচেতন ছিলেন। এই যুক্তিতে তাঁরা অনেক সময়, এমনকি সাঙ্ঘাতিক ভুলও করে ফেলেছেন। গঁ্যকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের ডায়রিতে বালজাক সম্বন্ধে মন্তব্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তা কত সত্যি কথা। আজকের লেখকের কাছেও সেই মন্তব্য সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং অনায়াসে এই অধ্যায়ের আলোচনার উপসংহার হতে পারে।

"আমি খুব সম্প্রতি বালজাকের 'পেজ্যান্টস' লেখাটা আবার পড়লাম। বালজাককে কেউ কূটনীতিজ্ঞ বলেননি, তবুও তিনি বোধহয় আমাদের সময়ের সব চাইতে বড় কূটনীতিজ্ঞ। একমাত্র তিনিই অনুসন্ধান চালিয়েছেন আমাদের অসুস্থতার সূত্র। একমাত্র তিনিই এক বিশেষ উচ্চতা থেকে দেখেছিলেন ১৭৮৯ থেকে ফ্রান্সের বিভাজন, দেখেছিলেন আইনের ভিতরের মানসিকতা, দেখেছিলেন কথা ও কাজের মধ্যে কতদূর ফারাক, আপাতদৃষ্ট নিয়মশৃঙ্খলার আড়ালে লাগামছুট স্বার্থের স্বৈরাচার, দেখেছিলেন আইনানুগ সাম্য কিভাবে বিধ্বস্ত হয় বিচারকের সাক্ষ্যতেই অসাম্যের দ্বারা। এক কথায়, তিনি '৮৯র সেই বিশাল মিথ্যাভাষণের সাক্ষী যে মিথ্যাভাষণ মহৎ নামের জায়গায় এনে দিয়েছিল মহতী মুদ্রা, মারকুইসদের বানিয়েছিল কুসীদজীবী—তার বেশি কিছু নয়। তবুও তিনি এমন একজন ঔপন্যাসিক যাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ এবং তিনি এ সব কিছুর মধ্য দিয়েই দেখেছিলেন জীবনকে।"

এবং নায়কের মৃত্যু

৮

একটি উপন্যাস মূলতঃ চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে নিযুক্ত হয় একথা অপ্রয়োজনীয়, নীরস, মামুলী এক বক্তব্য বলে মনে হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আঙ্গিকগত অর্থে ছাড়া, আধুনিক ঔপন্যাসিকের মূল কাজ আর চরিত্রসৃষ্টি নয়। আজকাল মানব চরিত্র ছাড়া অন্য যে কোন কিছু নিয়েই উপন্যাস লেখা হতে পারে। মিঃ হাক্সলির মত কেউ কেউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা এবং কারুর মেজাজগত বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত চেনাপরিচিতি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। অন্যান্যদের মধ্যে কেউ কেউ ডি, এইচ, লরেন্সের মত নিজের ইচ্ছানুযায়ী রঙ চড়াতে ভালবাসেন। অথবা তাঁদের লেখা হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক, যা হয়েছে এইচ, জি, ওয়েলস-এর অধিকাংশ লেখাতেই। অথবা অনেকের লেখা মৃদু সামাজিক ব্যঙ্গতে পর্যবসিত, যা গাদা গাদা লেখা হয়েছে রাম শ্যাম যদু মধুদের হাতে (অবশ্যই সামাজিক ব্যঙ্গ যে কোন লেখকের পক্ষেই বৈধ বিষয় এবং পৃথিবীর অনেক লেখাই ব্যঙ্গমূলক ; কিন্তু সেখানেও কোন ব্যঙ্গলেখকই মানবচরিত্রকে তাঁর লেখার মূল কেন্দ্রবিন্দু করে রাখার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত নন)।

যাই হোক, সমসাময়িক উপন্যাস থেকে মানব ব্যক্তিত্ব অবলুপ্ত হয়েছে, অবলুপ্ত হয়েছে সেই সঙ্গে নায়কও। উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের জগতে নায়ককে বিলুপ্ত করে দেবার ব্যাপারটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। বাস্তববাদের অবক্ষয় এই ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করেছিল। 'মাদাম বোভারি' লেখার সময় পর্যন্ত ফ্লবেয়ার উৎসাহী ছিলেন নারী চরিত্রে। অবশ্য তাঁর সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় এমার চরিত্র যতটা নিখুঁত ঠিক ততটাই নিখুঁত নর্ম্যান প্রদেশের সাধারণ জীবনচিত্র-কলা। কিন্তু ইতিমধ্যেই Edmond de Goncourt মঞ্চ, হাসপাতাল, গণিকাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখতে মনস্থ করেছিলেন ; অর্থাৎ মানুষজন নিয়ে উপন্যাস লেখার ধারণা তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছিল। জোলা লিখেছিলেন একাধিক উপন্যাস—যুদ্ধের ওপর, অর্থের ওপর, গণিকাবৃত্তির ওপর, পারী শহরের বাজারের ওপর, মাদকদ্রব্যে আসক্তির ওপর ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাসী বাস্তববাদীদের এক বিশ্বস্ত ভাবশিষ্য আর্নল্ড বেনেট তাঁর পিতা এবং তাঁর নিজের যৌবন নিয়ে এক অত্যাশ্চর্য উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু তারপরে 'একটি পরিবারের ইতিহাস' লেখার এক ক্ষতিকর বাসনা তাঁকে

গ্রাস করে এবং পরপর দুটি লেখা আগের লেখাটিকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ করে দেয়। একই ভাবে যুদ্ধপূর্ব ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তিনি লিখে গিয়েছেন; যার কেন্দ্রীয় চরিত্র দুজন বৃদ্ধা, যাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কোন কুম্ভকারশালাতে। কিন্তু তারপরই তিনি নেমে এলেন কেন্দ্রীয় মানবচরিত্র ত্যাগ করে, অন্যান্য একাধিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করে শুরু করলেন লিখতে।

গ্যঁকুররা ছিলেন যত্নবান শিল্পী। এবং তাঁদের লেখা পড়ে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে তৃপ্তি লাভ করা যায়। জোলার মধ্যে ছিল সতেজ প্রাণস্পন্দন এবং প্রতিভার সৃষ্টিশীল শক্তি এবং তাঁর উপন্যাস অন্তর্নিহিত আবেগের তীক্ষ্ণতার জন্য এখনও পাঠযোগ্য। কিন্তু যাঁরা শিল্পীও নন, আবেগসম্পন্ন প্রতিভাধর মানুষও নন, তাঁদের গাদা গাদা 'বাস্তববাদী' লেখা প্রকাশনের পর কষ্টেসৃষ্টে একমাসের বেশি পড়া যায় না কোনমতেই। আধুনিক ঔপন্যাসিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ, সাধারণ পরিবেশের মধ্যেকার সাধারণতম মানুষজনের কথা লিখতে গিয়ে পরিত্যাগ করেছেন ব্যক্তিমানুষকে, নায়ককে। কিন্তু একই সাথে তাঁরা বাস্তববাদ এবং স্বয়ং জীবনকেও পরিত্যাগ করেছেন। 'বস্তুবাদী' মতাবলম্বী যাঁরা নিজেদের বাস্তববাদী বলে দাবী করেন, শুধু তাঁদের ক্ষেত্রেই যে একথা সত্য, তা নয়। বিশুদ্ধ ভাববাদী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অনুগামী ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রেও একথা একইভাবে সত্য। শেষোক্ত দল আবার চরিত্রসৃষ্টির ধারণাটাকে কমাতে কমাতে এনে দাঁড় করিয়েছেন এক অ্যাবসার্ডিটি বা অসমঞ্জসতার মধ্যে। অবশ্যই সে এক উজ্জ্বল, প্রতিভাময় অ্যাবসার্ডিটি। সাধারণত মানুষকে নিয়ে কথা বলতে জেমস জয়েস এতই বদ্ধপরিকর, যে তিনি খুঁজে বের করেছেন ডাবলিনের সাধারণতম, 'নীচ' এক মানুষকে, এবং দৈনন্দিন সাধারণ কাজের মধ্যে গল্পের চরিত্রকে রাখতে তিনি এতই ব্যগ্র যে আমাদের সঙ্গে চরিত্রটির প্রথম পরিচয় যখন হয় সে তখন নিত্যকর্মে ব্যস্ত। ফলতঃ এই মানসিকতা মানবতাবাদকে অস্বীকার করারই নামান্তর। নামান্তর সাহিত্যে সামগ্রিক পাশ্চাত্য ট্র্যাডিশনকে অস্বীকারের। সৃষ্টি নামক ব্যাপারটির প্রতি সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে বাস্তব থেকে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মধ্য দিয়ে। এবং ঘটনাচক্রে সময় ও ঘটনাবলির অন্তর্নিহিত যুক্তিবোধকে ধ্বংস করে ফেলার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলা হয়েছে বিবিধ চরিত্রের সাথে বহির্জগতের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। মানুষের ঐতিহাসিক চরিত্র অস্বীকার করে শেষ পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি সৃষ্টির ধারণাকেই হত্যা করে। মানুষ সময়ের অন্তর্গত এক জীব, সে এই পৃথিবীতেই সক্রিয়, এই পৃথিবী তাকে পাল্টে দেয় ঠিক যেমন মানুষও

পাল্টায় পৃথিবীকে, মানুষ সব সময়ই সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করে চলেছে নিজেকে—এক কথায় এই হল মানুষের ঐতিহাসিক পরিচয়। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি, বুর্জোয়াজি মানুষকে আর এইভাবে গ্রহণ করতে রাজী নয় : কেননা তাহলে স্বয়ং বুর্জোয়া জগৎকেই ধিক্কার জানাতে হয় এবং স্বীকৃতি জানাতে হয় ধনতন্ত্রের ইতিহাস নির্দ্ধারিত ভাগ্যকে এবং সমাজ সংলগ্ন সেইসব শক্তিদের যারা পরিবর্তন আনে সমাজে।

মহান উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে প্রায়ই যে নায়কের আমরা সাক্ষাৎ পাই, সে একজন যুবক। সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক এক সংঘাতের সম্পর্ক। এবং শেষ পর্যন্ত এই সংঘাতে হয় তার মোহমুক্তি নয় পরাজয় ঘটেছে। সে হল স্তঁধালের একমাত্র নায়ক। বালজাক প্রায়ই তাকে স্থাপিত করেছেন মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রায় প্রত্যেকটি রুশীয় উপন্যাসে এই ধরনের কোন যুবক কেন্দ্রীয় চরিত্র। এবং ইংলণ্ডেও আমরা এই ধরনের চরিত্র পাই পেনডেনিস থেকে রিচার্ড ফেভ্‌রেল, আর্নেস্ট পন্টিফেক্স এবং জুড-এ। একদিকে এই যুবক, যাকে কোন-মতেই সব কিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না ; যে আদর্শবাদী, আবেগবান অতএব অসুখী। এবং আরেকদিকে সেই সমাজ যা অহংবাদকে একমাত্র ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে। সেই সমাজে চরিত্রটি এমন এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর ভূমিকা পালন করে যে কোনমতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না তার সমাজের সঙ্গে। এই কথার অবতারণা এই কারণে যে, অনেক সময়ই মনে হয় সেই কাল দুই ধরনের অহংবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, পবিত্র ও কলুষিত। আর হতাশা, ভণ্ডামি, যাবতীয় ইচ্ছাশক্তির বিলোপ সাধন এবং যাবতীয় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা ছাড়া একজন পবিত্র অহংবাদীর অন্য কোন বাঁচার পথ ছিল না।

খুব নিরাপদে একথা ধারণা করে নেওয়া যেতেই পারে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই যুবক নায়ক ছিল কেবলমাত্র লেখকের নিজের যৌবনের এক কাল্পনিক পুনর্চিত্রণ। অথবা যে সমাজ লেখকের মানবতাবাদকে গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেনি লেখকের ব্যক্তিগত সুখসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রহণ করেনি সম্পত্তি কিম্বা পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখকের মনোভাবকে, সেই সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের স্তরবিশেষেরও পুনর্চিত্রণ ঘটত অনেক সময় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মধ্যে। ফ্লবেয়ারের চিঠিপত্রে ভর্তি বুর্জোয়া সমাজের প্রতি তাঁর তিক্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ। সেই সমাজের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত ছিল অজ্ঞতার ভিত্তিভূমিতে, সেই সমাজ দাঁড়িয়ে ছিল স্থূল অর্থের কঠিন খুঁটির ওপর। এবং সেই সমাজ শিল্পীকে বাধ্য করেছিল তার তুচ্ছ ক্ষুদ্র 'আদর্শের' কাছে নতি স্বীকার করতে।

ফ্লবেয়ার এবং তাঁর অনুগামী বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের অনেকেই ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম সততার প্রতিমূর্তি, তাঁরা সমাজের সকল দোষের মূলে দেখেছিলেন বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার। তাঁদের কাছে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অর্থ ছিল বুর্জোয়া আদর্শসমূহের কাছে নতিস্বীকারের সামিল। এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার বললেই তাঁদের মনে আসত গণভোটের কথা, যা কার্যত অচল হয়ে গিয়েছিল নেপোলিয়নের বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের কাছে।

তৎকালীন লেখকদের পক্ষে শতাব্দীর জনজীবনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় কিছু বৈশিষ্ট্যকে বুঝে নেবার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্গত জীবনের একঘেয়েমি ও নীচতার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিক্রিয়া। সামগ্রিকভাবে তৎকালীন ঔপন্যাসিক যে শ্রমজীবী শ্রেণীকে অবহেলা করে থাকবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। শ্রমজীবীর সঙ্গে ঔপন্যাসিকের কোন যোগা-যোগ ছিল না। ঔপন্যাসিক জানতেন এই বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের বাস এক অদ্ভুত, অবোধগম্য জগতে। এবং একমাত্র পারি কমিউনের পরেই সেই জগৎ আবিষ্কারের দুর্গম, কষ্টকর প্রচেষ্টার আরম্ভ। খুব খোলামেলা স্বীকারোক্তি করেছেন এদমোঁ দ্য গঁ্যকুর। 'নীচুতলার জীবন' নিয়ে নাড়াচাড়া করে উপ-ন্যাসের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর নিজেকে পুলিশ গোয়েন্দা বলে মনে হয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন, সম্ভবত তিনি একজন সচেতন, সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত সাহিত্যিক বলেই সেই সমাজ তাঁকে আকর্ষণ করেছে, যেভাবে অজানা অচেনা দেশ তার নতুনত্ব নিয়ে হাজার অনিশ্চয়তার মধ্যেও আকর্ষণ করে ভ্রমণ-কারীকে। সত্যি কথা বলতে কি বেশির ভাগ লেখকই শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন এই অজানা অচেনা কিছুর আকর্ষণে। এ হেন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে মানবব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা অসম্ভব সে ব্যাপারটা তাঁদের নজর এড়িয়ে যায়। দু-একজন ব্যতিক্রম। মার্ক রাদারফোর্ড অবশ্যই তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু বাদবাকী কোন ঔপন্যাসিকই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তেমন বিশ্বাসযোগ্য কোন চরিত্র সৃষ্টি করে যেতে পারেননি। আর সম্পূর্ণ দুই মেরুতে অবস্থিত এই দুই জগতের মধ্যবর্তী দেয়ালটিকে ভেঙে ফেলার বিশাল অসুবিধের জন্য খুব কম ঔপন্যাসিকই তেমন চরিত্র সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কিন্তু তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য আরো দুই শ্রেণীর লোক, যাঁদের সাহিত্য জগৎ থেকে ইচ্ছে করেই বুর্জোয়া ঔপন্যাসিকরা দূরে সরিয়ে রাখা উচিত মনে করেছিলেন, অথচ যাঁরা ধনতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসে এক অত্যন্ত মূল্যবান

ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথম শ্রেণী হল বৈজ্ঞানিকদের এবং দ্বিতীয়টি ধনতান্ত্রিক 'নেতার', যাঁরা আমাদের আধুনিক জীবনের কোটিপতি শাসনকর্তা।

আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, নিউটন, লাভোয়সিয়ের, ডারউইন, ফ্যারাডে, পাস্তর এবং ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চারজনই ইংরেজ এবং এই চারজনের মধ্যে আবার তিনজন হলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের প্রথমতম শারীর বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি ছিলেন সাদি, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং মারিয়া এজওয়ার্থ-এর বন্ধু। রাসায়নিক ডক্টর যোসেফ প্রিস্টলীর মত আকর্ষণীয় চরিত্রের ইংরেজ খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও তাঁর কোন উপযুক্ত জীবনী লেখা হয়নি (সম্ভবতঃ তিনি জেস্যুইট, বা অস্বাভাবিক ধরনের খামখেয়ালী বা টোরিমতাবলম্বী এর কোনটাই ছিলেন না বলে)। জনসাধারণের জন্য প্রস্রাবাগার খুবই প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যক, যদিও এ বিষয়ে চিন্তা খুব সুখকর নয়। বিজ্ঞানের অস্তিত্বও তাই বলে তার চাইতে কোন কম প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর যথার্থ ভাল ঔপন্যাসিকদের লেখা তন্ন তন্ন করে ঘাঁটলেও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও জনজীবনে এর প্রয়োজনীয়তার সামান্যতম স্বীকৃতিটুকু খুঁজে পাওয়া যায়না। দুটি বস্তুই তৎকালীন সাহিত্য বহির্ভূত। আজ, এমনকি আমাদের দিনেও, যখন বিজ্ঞান তার পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রস্রাবাগার তার সম্মানিত স্থান পেয়েছে সাহিত্যজগতে, তখনও একমাত্র কয়েকজন দ্বিতীয় সারির লেখক ছাড়া আর কেউ স্বীকার করেনা যে শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে একজন গণিকা বা অভিনেত্রী যে স্থান লাভ করেছেন অন্ততঃ তার সঙ্গেও সমতা রেখে একটা ন্যূনতম স্বীকৃতি পাবার অধিকার একজন বিজ্ঞানীরও আছে। তাই বলে গঁ্যাকুররা যেভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অভি-নেত্রী জীবনকে, কিম্বা জোলা যেভাবে কসাইখানার জীবনকে এবং আর্নল্ড বেনেট যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন প্রমোদোপকরণপূর্ণ হোটেলকে ঠিক সেইভাবে একজন বৈজ্ঞানিককেও আমি লেখার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। বৈজ্ঞানিক কোন বিষয়বস্তু নন। তিনি এমন এক বিশেষ ধরনের মানুষ যাঁর সৃষ্টিধর্মী মন কোন অংশেই এক মহান শিল্পীর মানসিকতা থেকে দূরে নয়। এই মানবজীবনেরই তিনিও এক অংশ। এবং তাঁকে অবহেলা করলে এই আধুনিক জীবনযাত্রার অন্তর্গত মানবিক অস্তিত্বের কোন সঠিক মূল্যায়ন কোন মতেই সম্ভব হতে পারেনা। এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষটার প্রতি এই আরোপিত উপেক্ষার দুটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ ঔপন্যাসিক নিজেই বিজ্ঞান জগৎ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ, এই সঙ্কীর্ণ

বিশেষীকরণ এবং শ্রমবিভাজনের জগতে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিকলা থেকে তিনি এতই বিচ্ছিন্ন যে মানবব্যক্তিত্বর এই মূল্যবান ক্ষেত্রটি তাঁর কাছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের মতো। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জীবনের বিবিধ শর্তগুলিই ঔপন্যাসিককে কোন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিত্বকে চিত্রিত করতে দেয়নি। আমাদের পৃথিবীর একাধিক সৃষ্টিকর্তার মধ্যে বিজ্ঞান অন্যতম। কিন্তু তবু বিজ্ঞানকে আমাদের এই পৃথিবীই ক্রীতদাস এবং অবক্ষয়িত করে রেখেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন বিজ্ঞানীকে নিয়ে লিখতে গেলে প্রয়োজন ছিল একজন অসম্ভব সাহসী, বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের। প্রয়োজন ছিল এমন লোকের যে অজ্ঞদের ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে সাহসের সঙ্গে, এবং যে সামাজিক ব্যবস্থার বাণিজ্যিক অবক্ষয়, গোড়ার গলদকে উন্মোচিত করে দেখাতে পারবে সম্পূর্ণভাবে। আর আজ সেই লোককে এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেকটা—দেখাতে হবে সমাজ কিভাবে বিজ্ঞানকে ধ্বংস করার জন্যই ব্যবহার করছে বিজ্ঞানকে।

সেই শতাব্দীতে মানবব্যক্তিত্বের এরকম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশকে তৎকালীন ঔপন্যাসিকরা উপেক্ষা করেছিলেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসে বৃহদায়তন ব্যবসায়ীর কোন সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়না। খুঁজে পাওয়া যায়না সেই মানুষদের যাঁরা তৈরি করিয়েছিলেন রেলপথ, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইস্পাত কারখানা, আফ্রিকার বুক চিরে বের করে এনেছিলেন হীরা এবং বিভিন্ন সমুদ্রকে যোগ করেছিলেন জলাভূমি কেটে তৈরি করা খালের সঙ্গে। তবে এই ক্ষেত্রেও বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। ১৮৭০ এর আগে ব্যবসাবাণিজ্যের জগতে সর্বোচ্চ আসন ছিল কুসীদজীবীর এবং বালজাক এই শ্রেণীর ওপরে খুব বিশ্বাসযোগ্য কাজ করে গিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে উৎপাদক ছিলেন তখনও একজন ছোটখাট মানুষ। গোটা দুনিয়াকে শাসন করার মত বিপুল অর্থ সমাগম তখনও তাঁর হয়ে ওঠেনি। এবং সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষুদ্রায়তন এই ব্যবসায়ী বা উৎপাদকদের সম্বন্ধে কিন্তু মহান বাস্তববাদীরা নীরব থাকেননি। শতাব্দীর শেষ তিন দশকে এবং আমাদের সময়ে ব্যাপারটা অন্যরকম। সিসিল রোডস, কিম্বা রক ফেলার কিম্বা ক্রুপ্, এঁরা সব কোথায়? একমাত্র ড্রেইজার-ই চেষ্টা করেছিলেন এই জীবনবৃত্তির মানুষদের একটি চিত্র নির্মাণের। কিন্তু শিল্পীরা সামগ্রিক বিচারে, যেন শয়তান জ্ঞানে এঁদের কাছ থেকে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়, শয়তানের চরিত্র চিত্রণেই বা কেন কল্পনাকে কাজে লাগান হবেনা। মিলটন তো শয়তানকে

অতি বশংবদ এক চরিত্র হিসেবে দেখেছিলেন। আর জেসুইট শহীদ এডওয়ার্ড ক্যাম্পিয়ন যদি প্রতিভাবান লেখকের নজরে পড়ে থাকেন, তবে ধনতান্ত্রিক শহীদ আইভার ক্রুজেরই বা পড়বেন না কেন?

রেনেশাঁ শিল্পীরা ভিলেন সম্বন্ধে কলম ধরতে কখনও পিছিয়ে থাকেননি। শেক্সপীয়ার বলতে পেরেছেন ভিলেন ছাড়া জীবন সম্পূর্ণ নয়। ভিলেনকে যদি নিছক নেতিবাচক কিছু ভেবে নেওয়া হয়, যদি ভেবে নেওয়া হয়, তার কোন সদর্থক বৈশিষ্ট্য নেই এবং সে হল কেবলমাত্রই শয়তানের প্রতিমূর্তি, তাহলে ভিলেন চরিত্রটির প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়। একথা সত্যি যে আধুনিক ধনতান্ত্রিকরা কেবলমাত্র ওপর ওপর রেনেশাঁ আমলের অ্যাডভেঞ্চারারদের সঙ্গে তুলনীয়। শেষোক্ত শ্রেণীটি যেখানে খোলাখুলিভাবে হিংস্র, রক্তলোলুপ এবং নিষ্ঠুর ছিল, প্রথমোক্ত শ্রেণীটিও সেখানে একই গুণ বা দোষসমন্বিত ছিল; তবে গোপনে। কিম্বা স্থান বিশেষে প্রথমোক্ত শ্রেণীটি হিংস্রতা বা রক্তলোলুপতার ব্যাপারস্যাপারগুলি পুরোপুরি ভাবেই ছেড়ে দিত তার প্রতিনিধিদের বা দালালদের হাতে। রেনেশাঁর যে কোন রাজপুত্র অনেকটা পরীক্ষামুলক উদ্দেশ্য নিয়ে খুব খোলাখুলিভাবেই জমকালো ও জাঁকজমকে ভরা কামুকতা নিয়ে তাঁর যৌনজীবন কাটাতেন, অনেকটা মানবদেহের মধ্যে জীবন খুঁজে নেবার মত। ধনবলে অর্জিত শাসনক্ষমতার অধিকারী আধুনিক কোটিপতির আনন্দ অনেক বিকৃত ও অবশ্যই গোপন, লুক্কায়িত। এবং তাঁর প্রমত্ত লালসা যতটা না Borgia-র ব্যাঙ্কোয়েটের মত তার চাইতে অনেক বেশি Folies Bergères-এর অসংলগ্ন ও ব্যস্ততার মধ্যে লেখা নড়বড়ে ভিতের কোন নাটকের মত।

তবুও এইসব কোটিপতিদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য মানুষজন নিশ্চয়ই আছেন। রোডস ঠিক যতটা অপ্রীতিকর মানুষ, ততটা উল্লেখযোগ্যও। নর্থক্লিফ যতটা অপ্রকৃতিস্থ ততটা এক প্রতিভাও বটে। আধুনিক জীবনের কাব্যধর্মিতার থেকে এইসব লোকেদের ঠিক বাদ দেওয়া যায় না; বাদ দেওয়া যায়না বস্তুর জয়যাত্রার থেকে। এই যাত্রায় এমনকি একটি সংবাদপত্রও এমনই তৎপর যে সুদূর কোন দেশে কোন রাজার যদি দুর্ঘটনাক্রমে মৃত্যু হয়, তবে আততায়ীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটি অগ্ন্যুদ্গার করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হাতের নাগালের কোন সংবাদপত্রে আমরা তার আলোকচিত্র পেয়ে যাই—আধুনিক পদার্থবিদ্যার জয়যাত্রাকে ধন্যবাদ! অনেক বড় বড় দেশের ও জাতির আন্দোলন, সংগ্রাম, মহান উদ্দেশ্যে নরনারীর আবেগময় আত্মোৎসর্গ, এসবও উল্লিখিত কোটিপতিদের

জীবনের সঙ্গে একাধিকক্ষেত্রেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যাইহোক, কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যে এঁরা কোন স্থান পাননি, লেখকরা এঁদের থেকে কুণ্ঠাভরে পশ্চাদপসরণ করেছেন, ঔপন্যাসিক দেখেছেন এহেন চরিত্রচিত্রণ করতে গেলে অনেক অপ্রীতিকর, অশুভ শক্তি সম্বন্ধে তাঁর কলম ছোটাতে হবে—তিনি ভয় পেয়েছেন। এর চাইতে অনেক নিরাপদ সোয়ানের সেই শান্ত সমাহিত জগৎ, ফুলের বাগান, ড্রইং-রুম, সুদীর্ঘ কথোপকথন, ভাব ও প্রভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, দেহ ও আত্মার আরো অনেক বেশি পরিস্রুত বিকৃতি। একথা সত্যি যে, এসবই হল সকল দেশের জীবনের অধিকর্তা এবং মহতী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাগ্যবিধায়ক সেই কোটিপতিদের জীবনেরই প্রতিফলন। কিন্তু সোয়ান, ডাচেস এবং মঁসিয়ে দ্য শার্লাস ইত্যাদিকে সৃষ্টি করেছে এক বাস্তব জগৎ। এবং পূর্বোক্ত জগৎ এই বাস্তব জগৎ থেকে এত সূক্ষ্মভাবে বিচ্ছিন্ন এবং তা এত দূরে অবস্থিত যে এই জগৎটির অস্তিত্ব আমরা খুব নিরাপদ ভাবেই উপেক্ষা করতে পারি।

অতএব আমাদের আধুনিক উপন্যাসে নায়ক ও ভিলেন, উভয়ের মৃত্যু হয়েছে। মাইক্রোস্কোপ স্লাইডের ওপর চেটানো সাতরঙা কাটিং ছাড়া অন্য কোথাও ব্যক্তিত্বর অস্তিত্ব নেই। এই কাটিং ছবিগুলি প্রায়ই অদ্ভুত, আকর্ষণীয় এবং সুন্দর, কিন্তু তারা আর যাই হোক, জীবন্ত রক্তমাংসের নরনারী নয়। ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হবার পর তার স্থান নিয়েছে সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যেকার সাধারণ মানুষ, কিম্বা তার নিজস্ব চেতনার অংশবিশেষের মধ্যে যান্ত্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা ব্যক্তিত্বই কোন এক বৈশিষ্ট্য। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বর এই বিলুপ্তির সাথে বিলুপ্ত হয়েছে উপন্যাসের গঠন, তার মহাকাব্যিক চরিত্র। মানুষ মানেই আর একাধিক বিরোধী ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত কোন বিশেষ, স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি নয়। আজ সকল সংঘাতকে ছাপিয়ে উঠেছে সামাজিক সংঘাত। এই সংঘাত আধুনিক জীবনকে কাঁপাচ্ছে তার মূলে, বদলে দিচ্ছে তার এতদিনকার রূপ। কাজেই উপন্যাস থেকে সংঘাত অপসৃত হচ্ছে; তার স্থান নিচ্ছে ভাববাদী সংঘাত, যৌন সম্পর্কের গূঢ়তার ওপর আলোকসম্পাত কিম্বা বিমূর্ত আলোচনা ইত্যাদি।

বস্তুবাদ ও আদর্শবাদের বিপথগামী ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও রেনেশাঁ থেকে কান্ট, বা ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত একটি সংহত ও একমুখী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণ করা অন্তত কিছু অংশে সম্ভব হয়েছিল। সেই স্থানে এসেছে যে কোন সংহত, বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত বিপর্যয়, দার্শনিক সারগ্রাহিতা, বার্গসঁ এবং নীটশের ইচ্ছাশক্তি এবং সজ্ঞা সম্পর্কিত অবক্ষয়ী কিছু

ছদ্ম-দর্শন, ফ্রয়েডের ধোঁয়াটে, যৌন-রহস্যময়তা, অ-কান্টীয়দের ভাববাদী আদর্শবাদ, এবং শেষ অব্দি মানুষের যুক্তিবোধকে অস্বীকার, রেনেশাঁ এবং মানবতাবাদের যাবতীয় ধারণা পরিত্যাগ। এ সবই হল দর্শনের জগতে অবক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল, রাজনৈতিক প্রতি-বিপ্লবের যাবতীয় অসহায় যন্ত্রণা ও উদ্বেগের প্রতিচ্ছবি। আমাদের সভ্যতার শুরু ইর‍্যাসমাস, র‍্যাবেলা ও মঁতেন এর সঙ্গে। এর শেষ হল মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনে—অর্থাৎ রক্ত ও জাতির তত্ত্বে, ধর্মীয় অন্ধকারচ্ছনতা ও যৌন-রহস্যময়তায়, স্পেঙ্গলার, অটম্যান স্পান, ফ্রয়েড এবং অন্যান্যদের মধ্যে। আজকাল কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভের প্রথম উজ্জ্বল ঘোষণাটি ব্যক্তির মৃত্যু ঘোষণার মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে, কোন সঠিক জীবনবোধ না থাকলে মানব ব্যক্তিত্বর কোন পূর্ণ, স্বাধীন অভিব্যক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। সেরকম কোন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ না করলে উপন্যাস নতুন জীবন পেতে পারেনা, পুনর্জন্ম লাভ করতে পারেনা মানবতাবাদ। আজকের দিনে এই দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র দিতে পারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যা শিল্পে নতুন এক সামাজিক বাস্তববাদের জন্ম দিয়েছে। বহুদিন আগে, ১৮৪৪-এ মার্ক্স ও এঙ্গেলস "দি হোলি ফ্যামিলি" তে দেখিয়েছেন, আজ, এই মুহূর্তে, সমাজবাদ থেকে মানবতাবাদের অর্থ কোন দিক দিয়েই বিচ্ছিন্ন বা পৃথক নয়। "মানুষ যদি বোধের জগৎ থেকে এবং সেই জগতে লব্ধ অভিজ্ঞতা সমূহ থেকে তার যাবতীয় জ্ঞান, উপলব্ধি ইত্যাদি তৈরি করে নেয়, তবে আমরা আশা করতে পারি মানুষও নিশ্চয়ই এই পরীক্ষামূলক পৃথিবীকে এমন ভাবে সাজিয়ে নেবে যাতে সেখানে যথার্থ মানবোচিত, মানবিক দিকগুলিই তার সামনে খোলা থাকবে, যাতে নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে ভেবে নিতেই অভ্যস্ত হবে। ফরাসী এবং ইংরেজ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ, মানবিকতা ও বস্তুবাদের এই সমস্থানিকতা বা সমাপতন বাস্তব প্রয়োগেই দেখাতে পেরেছে।"

খুবই স্বাভাবিক যে, একাধিক পাঠক এ সব পড়তে পড়তে প্রতিবাদ করবেন। বলবেন আমি খুব গা এড়িয়ে যাওয়া সামান্যীকরণ করছি। আমরা কি সত্যি সত্যিই 'ইউলিসিস' বা 'সোয়ানস ওয়ে'তে কোন সৃষ্টিধর্মিতা খুঁজে পাইনা? যাবতীয় অস্বীকার ও নেতিবাদ সত্ত্বেও ওয়েলস তাঁর আগের লেখাগুলিতে কি চরিত্র সৃষ্টি করে যেতে পারেননি? পারেননি লরেন্স এবং হাক্সলি?

খুবই সত্যি কথা, জয়েসের হাতে ব্লুম চরিত্রটিতে আমরা একটি মানবচরিত্রই পাই। কিন্তু ব্লুমই হল ইউলিসিসের একমাত্র চরিত্র। কনরাডের মার্লো-র চাইতে ডিড্যালাস-এর খুব বেশি কিছু রক্ত বা মাংস নেই। একদিনের এই

ওডিসিতে একাধিক ডাবলিনবাসীরা আসলে লেখকের নিজস্ব পরিচিত ব্যক্তিমণ্ডলী। অতীব চমৎকার বর্ণনা, তীক্ষ্ণ ও চতুর বিশ্লেষণ সবই আছে। কিন্তু চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করা হয়নি। আর ব্লুম নিজে কি সত্যিসত্যিই কোন মানুষের চিত্র? সম্ভবতঃ ব্লুমের শতকরা নব্বই ভাগই হল একজন মানুষের, যতটা না সৃষ্ট তার চাইতে বেশি ক্যামেরায় তোলা আলোক চিত্রের মত; তবুও লেখক একে আমাদের সামনে যেভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন, এ কোন মতেই তা নয়। ব্লুম কে দেখান হয়েছে বিমূর্তভাবে, বিংশ শতাব্দীর 'সাধারণ লোকে'র একটি প্রতীক হিসেবে। ব্যুভার এবং পয়শে-কেও বাস্তব সম্মত উপায়ে ব্লুমেরই ফরাসী সংস্করণ করার উদ্দেশ্য ছিল। তারা তার চাইতেও বেশি কিছু হয়ে গিয়েছে। আজকাল যে "লিটল্ ম্যান" সম্বন্ধে আমরা এত শুনে থাকি, উপরোক্ত চরিত্র দুটি সেই নগণ্য মানুষেরই এক নায়কোচিত পুনসৃ'ষ্টি হয়ে আছে। অথচ একই সাথে সম্পূর্ণ ভাবে তাও নয়। মানুষের অবচেতন সম্বন্ধে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারের ব্যাপারে ফ্লবেয়ার কিছু জানতেন না। জয়েস জানতেন, এবং তা সত্ত্বেও তা তাঁর কাজে খুব একটা লাগেনি। ফ্লবেয়ার যদিও ফ্রয়েডের নতুন আবিষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি অন্তত রাবেলাঁ পড়েছিলেন, আনন্দ সহকারে, এবং বুঝেছিলেন। জয়েস কেবলমাত্র জেসুইটদের ঘৃণাই করে গিয়েছেন। আমার ধারণা জয়েসের থেকে প্রুস্তও খুব একটা বেশি সফল হতে পারেননি। নরনারীকে তিনি অনেক বেশি ভালভাবে বুঝেছেন সত্যি। কিন্তু পারীর ড্রইংরুমের পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে ক্লান্ত এই অলৌকিক মানুষের দল এখনও নিতান্ত প্রচ্ছায়ার মত, অশরীরী। কোন কোন সমালোচকের মতে প্রুস্ত আদপেই কোন ঔপন্যাসিক নন। তিনি এ যুগের মঁতেন, এক বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক। মঁতেনের সঙ্গে এই তুলনার ব্যাপারটা মাথায় না রাখলেও কথাটা অনেকাংশে সত্যি। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে একই সারিতে প্রুস্ত বসতে পারেন না, কেননা ঔপন্যাসিকের সব চাইতে প্রয়োজনীয় গুণটি তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি জীবনকে সেরকম গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেননি যাতে তাঁর চরিত্ররা সম্পূর্ণ ভাবে তাদের নিজস্ব মৌলিক, স্বতন্ত্র এক জীবন লাভ করে, যে জীবনে তাদের সামনে আমরা আমাদের প্রশ্নাবলি রাখতে পারি এবং বের করে নিতে পারি তার উত্তর।

ওয়েলস, লরেন্স কিম্বা হাক্সলিকে নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের আরেকটু নীচের দিক থেকে শুরু করতে হবে। কিপস্, মিষ্টার পলি এবং অন্যান্য চরিত্ররা যতটা না মৌলিক, তার চাইতে বেশি তাদের স্রষ্টার আদর্শীকৃত প্রক্ষেপণ

তাদের মধ্যে যে করুণরস বা বিষণ্নতা আছে তা যতটা না তাদের নিজেদের তার চাইতে বেশি তাদের স্রষ্টাকর্তার। আমার অনেক সময়ই মনে হয় ওয়েলসের সঙ্গে হাক্সলির অনেক ব্যাপারেই মিল আছে। উভয়েরই নিজস্ব আবেগ লেখার মধ্যে এত বেশিমাত্রায় স্পন্দিত যে, সেই স্পন্দন আনতে চরিত্ররা ব্যর্থকাম। উভয়েই বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু। এবং সমসাময়িক জীবনের, দৈনন্দিন জীবনের রূঢ় সত্যাদি সম্বন্ধে কোন যথার্থ ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত টানতে দুজনেরই সমান অক্ষমতা। ওয়েলস যদি ব্রমলি গ্র্যামার স্কুল ও সাউথ কেনসিংটনে না গিয়ে ইটন ও অক্সফোর্ডে যেতেন তবে তিনি যা হতেন, হাক্সলি ঠিক তাই।

ঔপন্যাসিক হিসেবে লরেন্স আদৌ খুব একটা কিছু দাবী করতে পারেননা। কেননা "সন্‌স্ অ্যাণ্ড লাভার্স" এবং "দি রেইন্‌বো" র মত অভাবনীয়, আকর্ষনীয় প্রারম্ভের পর তিনি উপন্যাস জগৎ থেকে প্রায় সরেই এসেছেন। সেই স্থান পূর্ণ করেছে অদ্ভুত ধরনের রহস্যময়তায় আকীর্ণ, সুন্দর কিছু গদ্য কাব্য। এখানে কোন রক্তমাংসের মানুষ নেই। আছে ভাব। "দি রেইনবো-"র সঙ্গে "উইমেন ইন লাভ" তুলনা করলে ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা যাবে। শেষের উপন্যাসটির বিমূর্ততার সঙ্গে প্রথমটির আবেগময়ী বোনদের আদৌ যে কোন সম্পর্ক আছে, তা কি বিশ্বাস করা যায়? লেভিন ও কিটির বিবাহে টলষ্টয় একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। ব্যাপারটি কি বিবর্ণ ও প্রাণহীন মনে হয়? "দি রেইনবো" লেখার পরে লরেন্সের এমন কিছু হয়েছিল যা তাঁর সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয় সম্পূর্ণ ভাবে। আদিমতা নিয়ে তিনি কিছু অর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আধুনিক ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যাথার্থ্য সেখানে নয়। তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইংরেজ গ্রামগুলি এবং ইংল্যাণ্ডের মাটির কদর করতে তিনি কোনদিন প্রস্তুত ছিলেন না। ইংল্যাণ্ডের মাটি যে স্বাধীন নয়, এক স্বল্পসংখ্যক অজ্ঞ ও বিবেকহীন শ্রেণীর হাতে প্রতিটি ইংরেজের উত্তরাধিকার যে যথেচ্ছভাবে বিকৃত ও বিধ্বস্ত হচ্ছে, তা যদি কেউ চোখ মেলে দেখতে ও বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে, যে করেই হোক, ইংরেজ গ্রামাঞ্চল ও ইংল্যাণ্ডের জমির সম্বন্ধে আবেগ সহকারে চিন্তা অব্দি সে করতে পারবেনা। হার্ডি এই দিকটি দেখেছিলেন। কিন্তু লরেন্স দেখেননি। কাজেই লরেন্সের ইংরেজী ভাষা অনেক বেশি ভাল হলেও তাঁর চাইতে ইংরেজ গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে হার্ডির দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ধারালো ও বিশ্বস্ত।

উপন্যাসে মানুষকে তার হারানো জায়গায় ফিরিয়ে আনাই হল ইংরেজ ঔপন্যাসিকের মূল কাজ। মানুষকে ফিরিয়ে আনতে হবে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র

তুলে ধরতে সমসাময়িক মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতিটি স্তর পুনর্চিত্রিত করতে হবে। কল্পনাশক্তি ও বোধশক্তির সাহায্যে মানুষের সজ্ঞানতা ও সচেতনতা অনেক ব্যাপক হয়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক আরোপিত বন্ধন সমূহ ছিন্ন করে ত মুক্তির আলো দেখতে শুরু করেছে। আধুনিকতা মানুষকে যুক্ত করেছে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ; গতি বেড়েছে স্থলে, জলে ; উন্নীত হয়েছে চলচ্চিত্র, ওয়্যারলেস, টেলিভিশন ; সুযোগ আসছে সেরকম গৃহস্থালী স্থাপনের যেখানে থাকবেন দৃষ্টিকটু ও অপমানকর শ্রম নিয়োগ। আধুনিক জীবনের দেওয়া এই সব সুযোগ সুবিধার যথার্থ ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে মানুষ। কেবলমাত্র খুব সামান্য সংখ্যক লোক, যাঁরা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রভু তাঁরাই পারেন আধুনিক জীবনের এই চমৎকার সৃষ্টিগুলিকে কাজে লাগাতে। তাঁরা তা লাগানও। অবশ্য মানব মননের আরো বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য নয়, তার পূর্ণ ধ্বংস সাধনের জন্য। তবুও যে কোন মানুষের মধ্যেই, সে ভারতীয়ই হোক, চৈনিকই হোক, ইংরেজই হোক বা ফরাসীই হোক, একটা চেতনা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এখনও জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরো গভীর, আরো বহুধাবিস্তৃত হতে পারে। এই চেতনা রূপান্তরিত হচ্ছে কাজে, রূপান্তরিত হচ্ছে এক নতুন পৃথিবী তৈরির প্রচেষ্টায়। মানবমুক্তির এক যুগের সূচনা হচ্ছে ক্রমশ।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের লেখায় নরনারীর কোন আচারআচরণ নিয়ে আমরা ভাবতে বসব ? মানুষকে তার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দেখব কিভাবে ? কার দিকে আমরা প্রত্যাশী হয়ে তাকিয়ে থাকব পথনির্দেশনার জন্য ? বুর্জোয়া বাস্তববাদ তার কাজ যে বিন্দুতে অসমাপ্ত অবস্থায় নামিয়ে রেখেছে, আমাদের স্পষ্ট নব্যবাস্তববাদ তার কাজ শুরু করুক সেই বিন্দু থেকেই। এই বাস্তববাদ মানুষকে শুধু সমালোচক হিসেবেই দেখাবেনা, দেখাবেনা এক বেমানান সমাজের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষ হিসেবে। সে মানুষকে দেখাবে তার অবস্থার পরিবর্তন আনতে ব্যস্ত মানুষ হিসেবেই, সে দেখাবে সেই মানুষকে, যে জীবনকে জয় করতে উন্মুখ, যে ইতিহাসের চক্রাবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত এবং যে নিজেই নিজের ভাগ্যের মালিক। অতএব নায়কোচিত ব্যাপারটি এবং তৎসহ মহাকাব্যিক চরিত্রটিকে উপন্যাসে ফিরে আসতে হচ্ছে। শেক্সপীয়রের চরিত্র সমূহ আলোচনা করতে গিয়ে হ্যাজলিট তাদের চসারের চরিত্রসমূহের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং দেখিয়েছেন, যে ঔপন্যাসিকের জীবন সম্বন্ধে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তিনি কিভাবে মনুষ্যচরিত্র অঙ্কন করবেন :

"চসারের চরিত্রগুলি একে অপরের থেকে স্পষ্ট ও পৃথক, কিন্তু তাদের মধ্যে

বৈচিত্র খুব কম, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা অভিন্ন অস্তিত্ব। তারা সঙ্গত ও একরূপধর্মী ; প্রথম থেকে শেষ অব্দি আমরা তাদের সম্বন্ধে কোন ধারণা লাভ করিনা। বিভিন্ন অবস্থায় ফেলে তাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা হয়না, তাদের হীনমন্য বৈশিষ্ট্যগুলিকেও নতুন নতুন পরিস্থিতিতে উন্মোচিত করে দেখান হয়না। তারা কিছু অঙ্কিত প্রতিকৃতির মত, বা মুখাকৃতিবিচার করে চরিত্র নির্ণয়বিদ্যার ক্ষেত্রে স্থাপিত একসারি মুখের সমতুল্য। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধারণাতীত সত্যতা এবং সংক্ষিপ্ততা। শেক্সপীয়রের চরিত্ররা ঐতিহাসিক, তারাও একই রকম সত্যি, নিখুঁত, কিন্তু তাদের দেখা হয়েছে তাদের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে, যেখানে প্রতিটি স্নায়ু ও প্রতিটি পেশি অন্যান্যদের সঙ্গে সংঘাতে গতিময়তা পেয়েছে, সংঘর্ষ ও বৈপরীত্যের যাবতীয় ফলাফল আলোছায়ার নিখুঁত ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য সহ উপস্থিত রয়েছে। চসারের চরিত্ররা বর্ণনামূলক, শেক্সপীয়রের চরিত্ররা নাটকীয়, মিলটনের মহাকাব্যিক। অর্থাৎ চসার ঠিক যতটুকু ইচ্ছে করতেন, গল্পের ততটুকুই তিনি বলতেন, যা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁর চরিত্র উদ্ভূত প্রশ্নাবলির উত্তর দিতেন তিনি নিজেই। শেক্সপীয়রের চরিত্ররা পরিচিতি পেয়েছে মঞ্চের ওপর, তারা যে কোন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য এবং বাধ্য সেইসব প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই দিতে। চসারে আমরা পাই চরিত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নির্ধারিত এক সারবত্তা। শেক্সপীয়র তাঁর উপাদানগুলিকে অনবরত মিশ্রিত ও পুনর্মিশ্রিত করেছেন, সামগ্রিক ভিড়ের থেকে প্রতিটি অণু পরমাণুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে, দেখেছেন তাদের পারস্পরিক নৈকট্যে ও দূরত্বে। যতক্ষণ এই গবেষণা চলেছে ততক্ষণ আমরা তার ফলাফল সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি, কোন চরিত্র কি পরিস্থিতিতে কিভাবে মোড় নেবে তা বুঝতে পারিনি আদপেই।"

চরিত্রের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাস থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ বৈপ্লবিক ঔপন্যাসিকের। বাস্তব ভীতি, পূর্ণ মানুষকে দেখানর দায়িত্ব থেকে সঙ্কুচিত পশ্চাদপসরণ, এসবের জন্য নয়। বুর্জোয়াজির ঔপন্যাসিকরা যে কাজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, সেই কাজ তাঁকে সমাধা করতে হবে। স্বীয় কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে টিপিক্যাল মানুষকে, আমাদের দিনকালের নায়ককে, এবং এভাবে হয়ে উঠতে হবে, স্তালিন যাকে বলেছেন, "মানবাত্মার যন্ত্রশিল্পী"।

সামাজিক বাস্তববাদ

৯

উপন্যাসের তত্ত্বালোচনা করতে গিয়ে ফিল্ডিং সব সময় এর মহাকাব্যিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বারবার বলেছেন, মানুষকে তার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে না দেখালে তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখান হয়না। 'টম জোনস'এর মুখবন্ধে এক জায়গায় তিনি বলেছেন ঔপন্যাসিক নিছক কাহিনীকার মাত্র নন। তিনি ঐতিহাসিকও। অতএব তাঁর লেখা "কোন সংবাদপত্র নয় যে, আদৌ কোন খবর থাকুক বা না থাকুক, তাতে সব সময় সমান সংখ্যার শব্দ সাজান থাকবে।" ঔপন্যাসিক কাহিনীকার নন। তিনি অবশ্যই "সেইসব লেখকদের প্রণালী ব্যবহার করবেন, যাঁরা বিভিন্ন দেশের বিপ্লবকে উন্মোচিত করার দৃঢ় ঘোষণা করে থাকেন।" এর অর্থ হল, ঔপন্যাসিক অবশ্যই পরিচিত থাকবেন পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে, কার্য কারণ সম্বন্ধের সঙ্গে, সংঘাত ও সংকটের সঙ্গে। কেবল মাত্র বর্ণনা বা ভাববাদী বিশ্লেষণ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন না। ঔপন্যাসিকের ভূমিকা নিয়ে তিনি আরেকটি অধ্যায়ে আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের আয়ত্তের মধ্যে "প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করার ক্ষমতা একজন ঔপন্যাসিকের থাকা উচিত। থাকা উচিত সেই বস্তুসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্যগুলিকে চিনে নিতে পারার বুদ্ধিমত্তা।" এর জন্য যে গুণটির দরকার তাকে তিনি বলেছেন "আবিষ্কার ও বিচারক্ষমতা।" এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এও বলেছেন যে "আবিষ্কার" মানে কেবলমাত্র কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি নির্মাণের ক্ষমতা নয়। "আবিষ্কার বলতে সত্যি সত্যিই কোন কিছু খুঁজে বের করার বেশি কিছু বোঝান হয়না; কিম্বা আরো বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে, আবিষ্কার হল দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ এবং তীক্ষ্ণবোধশক্তি সম্পন্ন অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশ যাবৎ বস্তুকুলের সারাংশের গভীরে। আমার মতে বিচারক্ষমতার সহবিদ্যমানতা ছাড়া এ জিনিস কখনও সম্ভব হয়না। কেননা দুটি পৃথক পৃথক বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝে নেবার আগেই কি করে তাদের সারাংশ আবিষ্কার করব সেটা আমি বুঝে উঠতে পারিনা।"

এ এক অভূতপূর্ব চেতনা; এতই অভূতপূর্ব যে টম জোনসের লেখক পরিষ্কার ভাবে লেখকদের দুভাগে ভাগ করে ফেলেছেন—যাঁরা এহেন ইতিহাস লিখতে পারেন, আর যাঁরা পারেন না। ফিল্ডিং নিজেকে একজন ঐতিহাসিক বলে চিহ্নিত করেছেন। একজন ন্যায়পন্থী ঔপন্যাসিকের বা ঐতিহাসিকের

অন্যতম গুণ হল বিদ্যা। এখানে তিনি হোমার মিল্টনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই দুই মহাকবিকে তিনি তাঁর গুরু মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে হোমার ও মিল্টন তাঁদের সময়ের যাবতীয় বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। এই অধ্যয়নের ফলেই তাঁরা প্রতিটি স্তরের ও "প্রতিটি শ্রেণীর মানুষজন সম্বন্ধে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন"। কোন ঔপন্যাসিক যখন ফিল্ডিং নির্ধারিত কর্তব্য বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে যাবেন তখন আমরা আশা করতে পারি আমরা এক নব্য বাস্তববাদ লাভ করব। হ্যাঁ, এক নতুন বাস্তববাদ। কেননা এ কথা তো খুবই সত্যি যে আজ, আমাদের যুগে, কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত সারাংশ আবিষ্কার করলে, দুইটি পৃথক বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্য সঠিক উপায়ে নির্ণয় করলে কিম্বা সব মানুষ সম্বন্ধে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পালন করলেই তার নিছক ফল হবে ফিল্ডিং বা ডিকেন্সেরই এক পুনর্সৃষ্টি। মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে সব সময় কিছু বৈপরীত্য থাকে। তা ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত আন্তর বৈপরীত্যও হতে পারে। আবার তা বহিরাগত কিছু বৈপরীত্যও হতে পারে। এই বাহিরের সঙ্গে মানুষ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

এই বৈপরীত্যগুলিই মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি। আজ বস্তুনিচয়ের মধ্যেকার আবশ্যিক পার্থক্যগুলি নির্ধারণ করার মানে হল এই বৈপরীত্যগুলিকে উন্মোচিত করা, অন্ধকার থেকে এদের বোধশক্তির আলোতে এনে পরীক্ষা করা। ফিল্ডিং এর সময় থেকে মানুষের মধ্যে সম্পর্কাবলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা যতদিন না বুঝতে পারছি ততদিন আমরা প্রত্যেকটি মানুষ সম্বন্ধে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করতে পারবনা।

মানবচরিত্রের ওপর আধুনিক মনস্তত্ব নিঃসন্দেহে অনেক কিছুই আরোপ করেছে—বিশেষ করে ঔপন্যাসিক মানবচরিত্রের যে দিকটি নিয়ে নিরত থাকেন সেই মানবচরিত্রের গভীর গভীরতম অবচেতন প্রদেশের ওপর তো বটেই। কিন্তু তাতে মোটেই প্রমাণিত হয়না যে, মানুষের চিন্তাভাবনা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং ভাব আবেগ ইত্যাদিকে এই সব মনস্তাত্বিক তথ্যের সুদীর্ঘ তালিকা সব সময়েই ব্যাখ্যা করতে পারবে। ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস এবং পাভলভের যাবতীয় লেখালেখি সত্বেও ঔপন্যাসিক তাঁর কাজ তো আর মনস্তাত্বিকের হাতে তুলে দিতে পারেননা। ঈদিপাস কমপ্লেক্স বা মনোবিশ্লেষণের অস্ত্রাগারের আরো গাদা গাদা ঘৃণ্য সব কমপ্লেক্স-এর মত ভাববাদী কারণ ও যুক্তি দিয়ে মানব মনের অন্তর্গত যাবতীয় চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তনের প্রণালীকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা একজন মার্ক্সবাদী কখনই স্বীকার করবেননা। ফিল্ডিং যেভাবে দাবী

করেছেন সেভাবে একজন মানুষকে তার ব্যক্তিগত বিপ্লবের মধ্যে লিপ্ত অবস্থায় আমরা সব সময় আঁকতে পারিনা। ফ্রয়েড প্রদর্শিত মানসিক জীবনের সম্পূর্ণ জীববিজ্ঞানোচিত দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের আর্টকে রাখে, আমাদের যদি বাধ্য-বাধকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, পাভলভ এবং রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্তনপন্থীদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাহলে কাল্পনিক পুনর্চিত্রণের জন্য মানব ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনুপ্রবেশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। একথা অনস্বীকার্য যে, মানবমন সম্বন্ধে আমাদের সীমিত জ্ঞান অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছেন আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা। এও অনস্বীকার্য যে, যে-ঔপন্যাসিক এই সব মনস্তাত্ত্বিকদের অবদান উপেক্ষা করবেন তিনি যেমন অজ্ঞ তেমনই মূর্খ। কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিকে তার পূর্ণাবয়বে, এক সামাজিক প্রাণী হিসাবে দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরোক্ষভাবে তাঁরা জীবন সম্বন্ধে চিন্তাভাবনার এক ভাল ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করেছেন। প্রুস্ত এবং জয়েস এর ওপর ভিত্তি করেই মানবব্যক্তিত্ব তৈরি করার বদলে মানবব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করাই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, এরকম ভেবে নিয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যক্তিমানুষের মনে বুদ্ধিদৃপ্ত, সাহসী এবং গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও কখনও যথার্থ-ভাবে এ কথাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি যে ব্যক্তি হল সামাজিক সামগ্রিক-তারই একটি অংশমাত্র। এই সামগ্রিকতার যে নিয়মাবলি রয়েছে সেগুলি বিচ্ছেদ্য এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যক্তিমনের অ্যাপারেটাস বা যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে সঞ্চারিত হয়, যেভাবে সঞ্চারিত হয় আলোকরশ্মি প্রিজমের মধ্য দিয়ে। এই স্বতন্ত্র নিয়মগুলিই প্রতিটি ব্যক্তির প্রকৃতির পরিবর্তন আনে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনস্তাত্ত্বিকরা এই ব্যাপারটি থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে-ছেন। আমাদের সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুমুখী, বহিরাগত শক্তিগুলির উদয় হয়, মানুষকে আজ তার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, লড়তে হচ্ছে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বেকারীর বিরুদ্ধে, কৃষি ব্যবস্থার মৃত্যুর বিরুদ্ধে, যন্ত্রের আধিপত্য ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে। এবং একই সাথে তাকে লড়তে হচ্ছে সেই সব বিষয়সমূহ তার মনের মধ্যে যে প্রতিফলন ফেলছে, তার বিরুদ্ধেও। এ বিশ্বকে বাঁচাতে তাকে লড়তেই হবে, লড়তে হবে সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য। এবং তাকে লড়তে হবে মানবসত্তায় ধনতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেও।

এই দ্বৈত সংঘর্ষে উভয় পক্ষই পরস্পরের ওপর প্রভাব ফেলে ও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এবং এই দ্বৈত সংঘর্ষেই ভাববাদী ও বস্তুবাদী বাস্তববাদের মধ্যেকার প্রাচীন ও কৃত্রিম বিভাজন শেষ হবে। আমাদের কাছে প্রাচীন প্রাকৃতিক বাস্তববাদের আর অস্তিত্ব নেই, আর অস্তিত্ব নেই সীমাহীন বিশ্লেষণ ও সজ্ঞা

কেন্দ্রিক উপন্যাসের। পরিবর্তে আসবে এক নতুন বাস্তববাদ যেখানে এই দুই দিকই পরস্পরের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক খুঁজে নিতে পারবে। অবশ্যই জোলা ও মোপাসাঁর উত্তরাধিকারী বাস্তববাদীরা তাঁদের পূর্বসূরীদের সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে পেরেছেন। কিন্তু পৃথিবীর যথার্থ গতি সম্যকভাবে বুঝতে গেলে যে দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের প্রয়োজন, তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এই ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। ফলতঃ তাঁরা সেই প্রকৃতিবাদিতার স্থানে নিয়ে এসেছেন এক কৃত্রিম, কর্কশ প্রতীকময়তার রাজত্ব। জুলে রোমাঁ এবং সেলিঁর অসংখ্য শক্তিশালী কিন্তু অসন্তোষজনক লেখার এই হল এক বিরাট বড় দোষ।

এই সংযোগ কি করে সম্ভব? বুর্জোয়া বাস্তববাদের অন্তর্গত এই পুরোন বিভেদ কি করে ভেঙে ফেলা যায়? তা করা যায় সর্বাগ্রে ইংরেজী উপন্যাসের যে ভিত্তি সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুদ্ধার করে। তার মানে স্থূল অর্থে এই নয় যে প্লট ও চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা আমাদের কাজ হল জীবন্ত মানুষজন নিয়ে, বহির্জগতের ঘটনাবলির মধ্যে মানুষ টিঁকে আছে, কেবলমাত্র সেগুলি নিয়ে নয়। এই ভুল করেছেন অনেক সমাজতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকই। তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে, সমূহ বুদ্ধি খরচ করে বর্ণনা করেছেন কোন একটি স্ট্রাইকের ঘটনা, বা একটি সামাজিক আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের আগমন, বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যা, তা সামাজিক পটভূমিকাই নয়; তা হল এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশমান মানুষ। উল্লিখিত ঔপন্যাসিকরা এই দিকটি নিয়ে ভাবেননি। মহাকাব্যিক মানুষের নিজের সঙ্গে তার জাগতিক কাজকর্মের জগতের কোন ভেদাভেদ দেখা যায়না। সে বেঁচে থাকে, এবং সে যে জীবন যাপন করে, তাকে পাল্টায়ও সে-ই। মানুষ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে।

খুব সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সোভিয়েত উপন্যাস বা পাশ্চাত্য বিপ্লবী ঔপন্যাসিকদের কেউই পুরোপুরি এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এর চাইতে ভালো আত্মসমালোচনা আর হয়না। অবশ্য এর অনেক ভালভাল অজুহাতও রয়েছে! রুশীয় গৃহযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক শিল্পস্থাপনা, কৃষকজীবনে বিপ্লব, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ফ্যাসীবাদের হাত থেকে শ্রমজীবী মানুষদের বাঁচানর সংগ্রাম, এই ঘটনাগুলি নিজেরাই এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, এত বীরোচিত, এত স্মরণীয়, যে লেখকদের ধারণা হয়ে ছিল নিছক এই ঘটনাগুলির বর্ণনাই এক অভূতপূর্ব প্রভাব সৃষ্টি করবে। প্রভাব একটা হয়েছে, তবে তা বেশির ভাগ সময়েই তীব্রতম আবেগময়তার প্রভাব এবং সেই আবেগ, সব সত্ত্বেও, প্রথম শ্রেণীর সাংবা-

দিকতার মানের সমপর্যায়ে পড়ে। অর্থাৎ সেই সব লেখকরা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে তুলতে পারেননি, পারেননি আমাদের সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতাকে বিস্তৃত করতে।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি এঙ্গেলসের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছি। তাতে ঐতিহাসিক ঘটনাকে ১+১=২-এর মত একটি সহজ সমীকরণ হিসেবে দেখা হয়নি, দেখা হয়নি কার্যকারণের সরাসরি প্রত্যক্ষ এক সম্পর্ক হিসাবে। "ইতিহাস নিজেকে এমনভাবে তৈরি করে নেয় যে, এর শেষতম ফলাফলটি সব সময়ই উদ্ভূত হয় একাধিক ব্যক্তিইচ্ছার মধ্যেকার সঙ্ঘাত থেকে। একাধিক ব্যক্তিইচ্ছা-গুলির প্রত্যেকটি আবার আলাদা আলাদা ভাবে জীবনের বিশেষ শর্তসমূহ থেকে জন্ম নেয়। অর্থাৎ এই অগুন্তি প্রতিচ্ছেদী শক্তিগুলি, এই একাধিক শক্তিসমূহের সীমাহীন সামন্তরিক অস্তিত্বই জন্ম দেয় একটি বস্তুর—ঐতিহাসিক ঘটনার।" মার্কস এবং এঙ্গেলস দুজনেই শেক্সপীয়রকে একমাত্র রচয়িতা বলে স্বীকার করে-ছেন, যিনি মানবব্যক্তিত্ব চিত্রণের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন। একজন মার্কসবাদী সাহিত্যিক যেভাবে তাঁর চরিত্র উপস্থাপনা করেন, শেক্সপীয়রের চরিত্ররা তার আদর্শ। তারা একই সাথে টাইপ আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তিও বটে, একই সাথে তারা জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং এক পৃথক ব্যক্তিত্ব। ল্যাসেলকে তাঁর নাটক Franz von Eickingen সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন এঙ্গেলস; সমালোচনা করে বলেছিলেন, তাঁর নাটকে শেক্সপীয়রের বাস্তববাদের পরিবর্তে শিলারের নাটকীয় তত্ত্বাদির ওপর জোর দেওয়াই হয়েছে নাটকটির মূল ত্রুটি। "ব্যাপক ব্যক্তিকরণ, যা মূর্খসুলভ বলে মনে হয়, তা বাতিল করে খুব উচিত কাজই করেছেন আপনি" লিখেছিলেন এঙ্গেলস, "কেননা তা শেষ হয় নিছক দার্শনিকীকরণের মধ্যে, এবং এক অন্তগামী সাহিত্যের সূচনা করে যায়। যদিও আমি মনে করি, একজন ব্যক্তি যা করে নিছক তাই দিয়েই তার চরিত্র নির্ণয় করা হবে না, সে কিভাবে কাজটি করল তাও দেখা প্রয়োজন। সেইদিক দিয়ে দেখলে, আমার মনে হয় না, আপনার নাটকের চরিত্র-গুলিকে আরো তীক্ষ্ণভাবে আলাদা আলাদা করে দেখলে, বা তাদের একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করে দেখলে আপনার নাটকের আদর্শকেন্দ্রীক চরিত্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হত। আমাদের যুগে প্রাচীনদের চরিত্রনির্ণয় ইতিমধ্যেই অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হচ্ছে। এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে নাটকের উন্নতি ও বিকাশের ইতিহাসে শেক্সপীয়রের গুরুত্ব আপনার আরো একটু বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল।"

শেক্সপীয়র তাঁর চরিত্রদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন "তাদের উপাদানসমূহের অবিরাম মিশ্রণ ও পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে, সমূহ সামগ্রিকতা থেকে তাদের প্রত্যেকটি উপাদানকে বেছে নিয়ে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে, উপাদানগুলির সংস্পর্শে অন্যান্য উপাদানগুলির পারস্পরিক নৈকট্য ও দূরত্ব যাচাই করার মধ্য দিয়ে, যতক্ষণ পরীক্ষানিরীক্ষার পালা চলছে ততক্ষণ অব্দি জানা যায়না কি হবে তার ফলাফল, নতুন পরিস্থিতিতে কোন দিকে মোড় নেবে চরিত্ররা অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটবে এবং তা একই সাথে ঐতিহাসিক ঘটনাটি এবং স্বয়ং চরিত্রটির অন্তর্নিহিত যুক্তিবোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবে। এঙ্গেলস যখন লিখেছিলেন যে, ব্যক্তিইচ্ছাসমূহের সংঘাত থেকে যা উদ্ভূত হয়, তা কখনই ঠিক ঈপ্সিত ফলশ্রুতি হিসেবে আসে না, তখন তিনি এই বিশেষ ব্যাপারটির দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

বাস্তব সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমি এতক্ষণ যা বলেছি তা থেকেই এই কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। বিপ্লবী বা প্রলেতারীয় সাহিত্য সম্পর্কে সর্বপরিচিত সাধারণ যে ইলিউশন কাজ করে তার সাথে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একত্রে চলে না। মার্কস ও এঙ্গেলস সুস্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন, এতাবৎকালের রাজনৈতিক টানাপোড়েন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে কোন সাহিত্যিক তাঁর লেখা চালিয়ে যেতে পারেন না। সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক, এই রাজনৈতিক সংঘাতে প্রত্যেকটি লেখক তাঁর নিজের একটি অবস্থান বেছে নেন, এবং সেই অবস্থান থেকেই তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন। বিশ্বসাহিত্যের মহান সময়গুলিতে বিশেষ করে এই ব্যাপারটি বার বার লক্ষিত হয়। কিন্তু যে ধরনের লেখা বাস্তব মানুষের জীবন্ত ক্রিয়াকলাপের বিকল্প হিসাবে লেখকের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার বিরুদ্ধে তাঁরা সবসময়ে ঘৃণা পোষণ করেছেন। নু্য ইয়র্ক ট্রাইব্যুন-এ ১৮৫১ সালে একটি প্রবন্ধে এঙ্গেলস ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সাল অবধি জার্মানীতে যে সাহিত্য আন্দোলন হয় সেই সম্বন্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। "তৎকালীন সাহিত্যিকদের অধিকাংশই এক মৌল নিয়মতান্ত্রিকতা বা এক মৌলতর প্রজাতান্ত্রিকতার প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। নিজ নিজ লেখাতে বুদ্ধিমত্তার ঘাটতিকে আপাত চমক-সৃষ্টিকারী ও দৃষ্টিআকর্ষণকারী রাজনীতি বিষয়ে পরোক্ষ উল্লেখ করে পুষিয়ে নেওয়াটা ক্রমেই বিদ্বানসমাজের বিশেষতঃ দ্বিতীয়শ্রেণীর লেখকদের একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কবিতা, উপন্যাস, সমালোচনা, নাটক ইত্যাদি যাবতীয় সাহিত্য-কর্মে 'প্রবণতা' নামক একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল। এবং

প্রকারান্তরে তা ছিল সরকার বিরোধী চেতনার কম বেশি নিষ্প্রভ এক প্রদর্শনী মাত্র।"

প্রায় বছর চল্লিশেক বাদে মিস হার্কনেসকে বালজাকের ওপর চিঠি লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস এ ব্যাপারে আরো স্পষ্টভাষী হয়েছেন। তিনি বলেছেন, "লেখকের সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গৌরবান্বিত করতে গিয়ে তুমি যে এক কৃত্রিম সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস লিখে ফেলনি, যাকে আমরা জার্মানরা 'টেন্‌ডেন্‌জ রোমান' বলে থাকি, তার জন্য আমি তোমাকে আদৌ দোষ দেব না। আমি মোটেই সে কথা বলতে চাইনি। লেখকের মতামত যত বেশি অপ্রকাশিত থাকে ততই তা ভাল শিল্প কর্ম হয়ে উঠতে পারে। যে বাস্তববাদের উল্লেখ আমি করেছি তা এমনকি লেখকের মতামত থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।" মার্কস ও এঙ্গেলস যার ওপর জোর দিয়েছিলেন তা হল এই জগৎ সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সেই শিল্পকর্ম অবশ্যই একার্থক হবে কেননা কেবল-মাত্র লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিই সেই শিল্পকর্মকে শৈল্পিক সংহতি দিতে পারে। কিন্তু লেখার কোনও অংশেই যেন লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ না ঘটে। ব্যক্তিমতামত যেন কখনই ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচারিত না হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন চরিত্রের ভিড়ের মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত মতামতগুলির খুব স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করা উচিত। আরেকজন তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ঔপন্যাসিক, কার্লের মা, মিনা কাউটস্কিকে এঙ্গেলস বলেছিলেন "এ হল যথার্থ উদ্দেশ্যপূর্ণতা যা সমস্ত মহৎ শিল্পকর্মে পরিলক্ষিত যা আছে ইস্কাইলাসে ও অ্যারি-স্টোফেনিসে, যা আছে দান্তে ও সার্ভান্তেঁর মধ্যে, যা আছে সব সমসাময়িক রুশীয় ও নরওয়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। এঁরা অসাধারণ উপন্যাস লিখে গিয়েছিলেন এবং এদের প্রত্যেকটিই উদ্দেশ্যপূর্ণ। কিন্তু আমার মনে হয় পরিস্থিতি ও বাস্তব ক্রিয়া কলাপ থেকেই এই উদ্দেশ্যপ্রবণতা জন্ম নেয়। আলাদা ভাবে এর ওপর জোর দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। এবং পাঠককে বর্ণিত সামাজিক সংঘাত সমূহের এক রেডিমেড ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের সমাধান দিতেও কোন লেখক দায় বদ্ধ থাকেন না কখনই।"

ঐ একই চিঠিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরো জোরদার করেছেন তিনি। দেখিয়ে-ছেন, আধুনিক অবস্থায় লেখকের জনগণ অনেকাংশই আসবে বুর্জোয়াজি থেকে। এবং "অতএব, আমার দৃষ্টিতে, উদ্দেশ্যমূলক সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন করবে বাস্তব সামাজিক সম্পর্কাবলীর বিবরণ দিয়ে, সেইসব সম্পর্ক সম্বন্ধে পারস্পরিক ভ্রান্ত ধারণা ধ্বংস করে, বুর্জোয়া জগতের

আশাবাদকে উৎপাটিত করে, কায়েমী ও পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার চিরস্থায়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের বীজ রোপণ করে—এবং লেখক নিজে কোন নির্দিষ্ট সমাধান না দেখালেও এবং স্থানবিশেষে তিনি কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন না করলেও এটা হবে।”

উপদেশ দেওয়া বা প্রচার করা ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। তাঁর কর্তব্য হল জীবনের বাস্তব, ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরা। নর ও নারীর বিকল্প হিসেবে যে কোন সাধারণ চরিত্রকে উপস্থাপিত করা, রক্ত এবং মাংসের পরিবর্তে গাদা গাদা মতামত প্রচার করা, সন্দেহ, প্রাচীন বশ্যতা ও বন্ধন, ট্র্যাডিশন ও আনুগত্য ইত্যাদির যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট মানুষের পরিবর্তে বিমূর্ত হিরো এবং ভিলেনকে উপস্থাপিত করা অতীব সহজ হতেই পারে। কিন্তু এসব করার অর্থ উপন্যাস লেখা নয়। যে কোন কথার পেছনে জীবনের প্রতিটি গতিপ্রকৃতি বুঝতে না পারলে কথার কোন অর্থ থাকে না। অবশ্যই উপন্যাসের চরিত্রদের রাজনৈতিক মতামত থাকতে পারে, কিম্বা থাকা উচিতও হয়তো। তবে তা ততক্ষণই, যতক্ষণ সেই মতামত একান্তভাবেই সেই চরিত্রদের, ঔপন্যাসিকের নিজের নয়। এমনকি, যদি, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি চরিত্রের মতামতের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে সেই মতামত চরিত্রের থেকেই আসা উচিত। অর্থাৎ পক্ষান্তরে এর অর্থ হল নিজস্ব কণ্ঠ এবং ব্যক্তিগত ইতিহাসের ওপর দখল থাকা উচিত।

একজন বিপ্লবী লেখক একজন দলীয় লেখক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিকামী সংগ্রামী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির সমান। কাজেই তাঁর কাছ থেকে বিস্তৃততম কল্পনার ব্যাপ্তি, চূড়ান্ত সৃষ্টিশীল উদ্যম আশা করা যায়। তিনি দলীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন এক নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করে। সেই সাহিত্য ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াজির স্বৈরাচারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে পৃথক। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর থেকে পৃথিবীর যে চিত্রণ আশা করে, তিনি তার বিকল্প হিসেবে তাৎক্ষণিক কোন শ্লোগান সর্বস্বতায় নিমজ্জিত হন না।

যতক্ষণ না তিনি একজন খাঁটি মার্কসবাদী হতে পারছেন, যতক্ষণ না তিনি সম্পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন দ্বান্দ্বিক হতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি সেই চিত্রকে যথাযথ ও সত্যানুগ করতে সফল হতে পারেন না। অথবা ফিল্ডিং যা বলেন, যতক্ষণ কোন লেখক তাঁর সমকালের জ্ঞান আয়ত্ত করার যথার্থ কোন চেষ্টা না চালান, ততক্ষণ তিনি সফল ঔপন্যাসিক হতে পারেন না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শিল্পী কোন কিছুকেই তাঁর জীবন অধ্যয়নের বাইরে রাখেন না। প্রলেতারীয় সাহিত্যের বয়স অল্প, সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে

তার বয়স দশ বছরেরও কম। এবং অনেক সময়ই এরকম বিরূপ মন্তব্য করা হয় যে, অন্তত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারীয় সাহিত্য কেবলমাত্র কিছু বিশেষ লোককে এবং তাদের সীমিত বৈশিষ্ট্যকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। বলা হয় প্রলেতারীয় সাহিত্যিক সেই স্ট্রাইক-নেতা, সেই ধনতান্ত্রিক 'বস্', সেই নবজ্ঞানা-ন্বেষী বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি পুরাতন বিষয়বস্তুর বাইরে খুব বেশী কিছু একটা আনার চেষ্টা করেনি। এবং এই মানুষরাই যে রক্তমাংসেরই মানুষ, তা দেখাতে এই সাহিত্য সফল হয়েছে অত্যন্ত যৎসামান্য পরিমাণে। এই বিরূপ সমালোচনা কিছুটা পরিমাণে যৌক্তিক অবশ্যই ; যদিও তা ম্যালরেঁার মহাকাব্যিক গল্পগুলি উপেক্ষা করে, উপেক্ষা করে র‍্যালফ্ বেইট্‌স্ এর দুটি উপন্যাস, উপেক্ষা করে জন ডস পাসোস এবং এরস্কাইন কল্ডওয়েলের লেখা। তবু বৈপ্লবিক ঔপন্যাসিকের আওতার বাইরে কোন মানবচরিত্র, কোন আবেগ, বা কোন মানবব্যক্তিত্বের সংঘাত ইত্যাদি অবস্থান করতে পারে না এবং সত্যি কথা বলতে কি আমাদের যুগের নায়ককে সৃষ্টি করতে একমাত্র তিনিই সক্ষম , সক্ষম আধুনিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সৃষ্টি করতে, কেননা সেই জীবনের সত্য অন্বেষণ একমাত্র তিনিই করতে পারেন। হ্যাঁ, যে-যে দোষগুলিকে মার্কস এঙ্গেলস সমালোচনা করেছেন, সম্পূর্ণভাবে সেই দোষমুক্ত ঔপন্যাসিকের লেখা আমরা খুবই কম পাই। নতুন সাহিত্য তার কাজ শেষ করার আগে আরও অনেক কিছু করার আছে। এবং একথা তো খুবই সত্যি যে মহৎ ঔপন্যাসিক ছাড়া মহান উপন্যাস পাওয়া যায় না। অন্যদিকে সন্দেহপ্রবণদের মনে করিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় যে আজকের জগতে আদর্শবাদের ভয়াবহ সংগ্রামে বুর্জোয়াজির অধিকাংশ ভাল লেখকই বামদিকে ঝুঁকে পড়ছেন দ্রুতগতিতে এবং এইভাবে তাঁরা ঘোষিত বিপ্লবী লেখকদের সান্নিধ্যে চলে আসছেন একান্তভাবেই। আশা করতে দোষ নেই, এই সান্নিধ্য থেকে জন্মলাভ করবে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই প্রতিভা। কেননা যিনি বিপ্লবী তিনি অতীতের ঐতিহ্য থেকে যেটুকু প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন এবং আশাসঞ্চারী তা গ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে বর্ত-মানের যা-যা প্রয়োজনীয় তাও বাদ দিয়ে দেন না। আমার প্রবন্ধেও আমি তা বলতে চেয়েছি বলেই মনে করি।

তবুও মানুষ জীবন্ত

১০

তাহলে জীবনের নতুন চিত্রে কি ধরনের মানুষ আঁকতে হবে? পাঠক এ প্রশ্ন করতেই পারেন। লেখার মধ্যে কি উপায়ে এই একগুঁয়ে, উচ্ছৃঙ্খল, কলহপ্রিয় এবং আবেগপ্রবণ প্রাণীটিকে উপস্থাপিত করা হবে? তাকে নিয়ে ঠিক কি করা উচিত? সে প্রতিনিয়ত তার নিজের অভ্যন্তরে ও বাইরে সংগ্রামরত, সে সবসময় কষ্টসহিষ্ণু, সে প্রেমিক, সে ঘৃণা করতে জানে, সে নিজ সম্পত্তি রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে বিপ্লবী মানুষ।

খুব স্বাভাবিক সব প্রশ্ন। কিন্তু এর উত্তর দেওয়া যথার্থই কঠিন। যাবতীয় চরিত্রের মানুষের মধ্য থেকে আমরা বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে বেছে নিতে পারি— সে হল বিপ্লবী মানুষ; বিশেষ করে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক বিপ্লবী মানুষ। যদিও প্রতিটি বৈপ্লবিক উপন্যাসই টাইপ অথবা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে একজন বিপ্লবীর শৈল্পিক চিত্র উপহার দেয়। স্বীকার করছি এখন অব্দি আমরা সফল হইনি। বিপ্লব সংক্রান্ত যে কয়টি লেখা হয়েছে তার মধ্যে বিপ্লবীদের চরিত্রগুলিই সর্বাপেক্ষা কম বিশ্বাসযোগ্য। এমন কি শলোকভ, ম্যালরঁ বা বেট্‌স্-এর স্বনামখ্যাত লেখা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। শলোকভের কমিউনিস্ট নায়করা মানসিক শক্তিসম্পন্ন গতিবান, তাঁদের ইচ্ছাশক্তি প্রশংসনীয় তাঁরা জীবন্ত এবং দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদক। কিন্তু তবু এক সমতল দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তাঁরা পূর্ণাবয়ব মানুষ নন। ম্যালরঁ এবং বেট্‌স্-এর চরিত্ররা কমিউনিস্ট হিসেবে ঠিক যতটা বিশ্বাসজনক, মানুষ হিসেবে মোটেই ততটা নন। একজন পেশাদারী বিপ্লবীর (অর্থাৎ যে মানুষের গোটা জীবন বৈপ্লবিক সংগঠন এবং নেতৃত্ব নিয়ে কেটেছে তাঁর) মনস্তত্ত্ব কখনই ম্যালরঁ বা বেট্‌স্-এর নায়কের সমতুল্য নয়।

অবশ্যই এরকম ব্যক্তিকে আমরা মনে রাখব যে, কোন বিপ্লবী কারণে জীবন উৎসর্গ করেছে। এই অর্থে একজন বিপ্লবী বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট এক সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র। এই চরিত্র এসেছে ভিক্টর হুগোর লেখাতে। ফ্লবেয়ার স্বীকার করেছেন এই চরিত্রের অস্তিত্ব, কিন্তু তিনি এই চরিত্রকে তার নিকৃষ্টতম রূপেই কেবল মাত্র দেখেছেন, সেই ১৮৪৮-এর নিম্ন

মধ্যবিত্ত রাজনীতিক হিসেবে, সেই টাইপ চরিত্র হিসেবে যাকে চূড়ান্তও নিষ্ঠুর সততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস ৪৮-এর বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে। খুব অদ্ভুত ভাবেই, মেরিডিথও এই চরিত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং "ভিত্তোরিয়া" ও "স্যাণ্ড্রা বেলিনি"র মধ্যে তিনি আঁকতে চেষ্টা করেছেন এক ইতালীয় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে।

দস্তয়েভস্কি এবং তুর্গেনেভ একই সঙ্গে রুশীয় স্বৈরাচারী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন আবার বিরক্তও হয়েছিলেন। বাকুনিনের বন্ধু নেচায়েভের অত্যাশ্চর্য বিপ্লবী চরিত্র নিয়ে তাঁরা ভেবেছিলেন এবং নেচায়েভের ভাবমূর্তি তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রগতিশীল রুশীয় আন্দোলনকে অযৌক্তিকভাবে শূলে চড়ানর জন্য। তাঁদের উপন্যাস্ "দি পজেজ্‌ড্‌" এবং "স্মোক" এর প্রমাণ। অনেক পরে, আমাদের সময়ে, এই একই কারণে নেচায়েভকে ব্যবহার করেন কনরাড তাঁর "আণ্ডার ওয়েস্টার্ণ আইজ" উপন্যাসে। অবশ্য মহত্তর পূর্বপুরুষদের থেকে কনরাডের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল।

এই সব ঔপন্যাসিকদের একটি বিশেষ দিক আছে। বিগত শতাব্দীর পাতি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী আন্দোলন থেকে তাঁরা তাঁদের বিপ্লবীদের বেছে নিয়েছিলেন। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা তার ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন। কখনো কখনো তাঁরা সমাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিপ্লবী এই ব্যক্তিটির প্রতি বিরক্ত, আবার কখনো কখনো তাঁরা এই চরিত্রটির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা আকৃষ্ট—এরকম প্রায়শই দেখা যায়। তাঁদের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই নিজেরা স্বয়ং বিপ্লবী হয়েও মার্ক্স ও এঙ্গেলস এই ধরনের বিপ্লবীদের আরো তীব্র এবং আরো সন্তোষজনক ভাবে আক্রমণ করেছেন। সন্তোষজনক, কেননা তাঁরা দুজন এই বিপ্লবীর সঙ্গে আমাদের দিনের যথার্থ বিপ্লবীর সম্পর্ক অন্বেষণ করেছেন। এবং আমাদের দিনের একজন বিপ্লবী ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রমজীবী সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের সমালোচনা কখনই নেতিবাচক নয়। এই সমালোচনা তাঁরা অস্ত্রের মত ব্যবহার করেছেন, যে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মানবজাতি ইতিহাসে তার মহত্তম কর্তব্য পালনে একদিন অগ্রণী হবে।

তা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের শ্রমজীবী বিপ্লবীর আগমন ঘটেছে, এবং তা অশোভন ভাবে ঘটেনি। মার্ক রাদারফোর্ডের লেখা "রেভলিউশন ইন ট্যানার লেন" এর মুদ্রাকর নায়ক জাকারিয়া কোলম্যানের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, তা অমর। উপন্যাসটির ত্রুটি একাধিক, প্রায় সবকটি সম্ভাব্য ত্রুটি বিচ্যুতিই

তাতে বর্তমান। কিন্তু উপন্যাসটি বেঁচে থাকবে তার সৎ এবং শক্তিশালী চরিত্রচিত্রণের জন্য, জাকারিয়া, জঁা স্যালো, ডুই পলিন ইত্যাদির জন্য; বেঁচে থাকবে সেই ভাবগম্ভীর গদ্যের জন্য, যা নিপুণভাবে অভিব্যক্তি দিয়েছে সেইসব আবেগপূর্ণ অসুখী গণতন্ত্রীদের।

"জাকারিয়া ছিল এক স্বভাব কবি, মূলতঃ এক কবি কেননা যা কিছু তাকে সাধারণের ঊর্ধে তুলে দিত, তাই তার কাছে প্রিয় ছিল। ইসাইয়া, মিল্টন, ঝড়ঝঞ্ঝা, একটি অভ্যুত্থান, একটি মহান আবেগ—ইত্যাদির মধ্যে সে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করত।" তার দৃষ্টিভঙ্গির কাব্যময়তা এবং তার বাস্তব জীবনের গদ্যধর্মিতার মধ্যে অবস্থিত জীবনে কোন ফাঁক ছিলনা। তার জীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে এসেছে দারিদ্র্য, প্রথম অসুখী বিবাহ, নির্যাতনের তিক্ততা, কারাগার, ধর্মীয় সন্দেহ প্রবণতা ইত্যাদি। কিন্তু এ সব কিছুই তাব জীবনকে পরিবর্তিত করার অদম্য ইচ্ছা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পলিনের সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহ, এক মুহূর্তের জন্য হলেও তার বিপ্লবের কবিতাতে পার্থিব সুখ এনে দিয়েছে।

তার জীবনে কাব্য ও গদ্যের এই মিলন তাকে তার নিজের কাছে অনুগত ও বিশ্বস্ত করে রেখেছে; যার জন্য জীবনের সায়াহ্নে এসে ট্যানার লেনের সেই র‍্যাডিকাল লৌহদ্রব্য ব্যবসায়ীকে বলতে পেরেছে: "আমি বিদ্রোহে বিশ্বাস করি। বিদ্রোহ সঠিক পথে মানুষের বিশ্বাসকে জোরদার করে · বিদ্রোহ অন্যান্যদের বিশ্বাসও দৃঢ় করে তোলে। যখন একদল দরিদ্র ব্যক্তি জমায়েত হয় এবং ঘোষণা করে, অবস্থা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে শত্রুদের মারা ছাড়া বা নিজেদের মৃত্যু বরণ করা ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই, তখন সব সত্ত্বেও এই দুনিয়া নিশ্চয়ই ভাবতে বাধ্য হয় যে ঠিক এবং বেঠিকের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে।"

লং একর বা শু লেনের কোন বিপ্লবী মুদ্রাকর আজ নিজেকে অন্যভাবে প্রকাশ করবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু জাকারিয়া কোলম্যান বা তার মতো আরো হাজারো মানুষ যদি না আসতো তবে সে এখন যা, তা হতে পারতনা। কোলম্যানের সারল্য এবং তার অকৃত্রিম ও অপরিপক্ক বিশ্বাস—মন্দের বিরুদ্ধে ভালর জয় হবেই, এসব আজ আমাদের কাছে প্রায়ই মর্মন্তুদ মনে হয়। কেননা প্রায়ই এসব সরল চিন্তাভাবনা বা ধারণাকে অনায়াসে পদদলিত করা হয়। কিন্তু তবুও কোলম্যানের শক্তিমত্তা, তার কাব্যধর্মিতা, তার শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস ইত্যাদি এখনও অব্দি এমন একটি উৎস যা থেকে বর্তমান বিপ্লবী তাঁর শক্তিসঞ্চয় করতে পারেন। উপন্যাসে কোলম্যানের বিশ্বাস কখনও পাল্টায় না। কিন্তু সে নিজে পাল্টায়,

সে বেঁচে থাকে, আহত হয়, অথচ সে আত্মসমর্পণ করে না, এবং জীবনের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে তার চরিত্রের বিকাশ ঘটতে থাকে।

আরেকটি বই-এর প্রসঙ্গ এসে যায়, রাদারফোর্ডের চাইতেও মহত্তর একটি বই, এই শতাব্দীর যথার্থ বৈপ্লবিক মহাকাব্য। অবশ্যই সেটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিষয়বস্তু হল স্পেনীয় অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ফ্লেমিশদের মুক্তিযুদ্ধ; এবং মাঝে মধ্যে ইতিহাস অপেক্ষাও এই লেখাটি লোককথার অনেকবেশি কাছাকাছি। তা সত্ত্বেও "টিল্ উলেনস্পিগেল" এর রচয়িতা চার্লস ডি কোস্টার ভাল ভাবেই জানতেন যে তাঁর উপন্যাস আমাদের সময়েও একই রকম বৈপ্লবিক কাজ সম্পাদন করতে পারবে। ভূমিকাতে এক জায়গায় তিনি স্পষ্টতঃ বলেছেন, যে, আরো অনেক স্পেনীয় এবং অন্য অনেক জেরাকারীই আছে যাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে এবং পরাজিত করতে হবে। এখানেও বিপ্লবকেন্দ্রিক কাব্যধর্মিতার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে জীবনের গদ্যময়তা। তবে ডি কোস্টারের কবিতার অনুপ্রেরণা ছিল ফ্লেণ্ডার্স এর লোককথা, জাকারিয়ার মতো ওল্ড টেস্টামেণ্ট নয়।

কেবলমাত্র বাস্তব অর্থেই ডি কোস্টার একটি আধুনিক মহাকাব্য লেখেননি। তিনি সঞ্জাত হওয়ার শক্তি দেখিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন এক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান যা তাঁর সময়ের থেকেও বহুদূরে প্রসারিত, যা ফ্রয়েডের কোন শিষ্যই দিতে পারেননি। এর অন্যতম কারণ হল তাঁর মনস্তত্ত্ব ছিল তাঁর জীবনদর্শনেরই ফল, এবং তা কিছু পাঠ্যপুস্তক থেকে আহৃত পুরোন জ্ঞান নয়। এই বইটিতে মাটির এবং সাধারণ জীবনের কবিতা, ব্যাপক ব্যঙ্গ ও হাস্যরস, উষ্ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিশ্বস্ত প্রেম, শৌর্য এবং গভীর অনুরক্তি ও উৎসর্গ ইত্যাদির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে ধনিক ও শাসক শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা, বাগাড়ম্বরতা ও ভণ্ড ধর্মপরায়ণতার প্রতি ঘৃণা। অর্থাৎ এই বইটিতে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহের সারমর্ম অভিব্যক্ত হয়েছে চমৎকারভাবে। যখন টিল তার কবর ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে সবেগে হাঁটতে হাঁটতে এবং মাথার চুল থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে, তখন সে সাধারণ মানুষের পুনর্জন্মের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সেই মানুষ এমন এক জগতের জন্য লড়ছে যে জগতে মানুষের কোন দ্বৈত মূল্য নেই, যেখানে মানুষ স্বয়ং তার জীবনে স্বাধীনতা আনতে এবং নিজেই নিজের জীবনের শাসনকর্তা হতে পারে। এই মানুষ মেয়রদের এবং পৌরপ্রধানদের কাছে ভীতির কারণ, ভীতির কারণ ভণ্ডব্যক্তিদের জগতের জঘন্য প্রতিনিধিদের কাছে। এবং উপন্যাসে

গ্রাম্য যাজকটি যখন ভিখিরি উলেনস্পিয়েগেলের মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে যান, তখন এই সাধারণ মানুষটিই তাঁর গলা চেপে ধরে।

"খুনে কোথাকার!" চেঁচিয়ে ওঠে টিল, "আমাকে ঘুমের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় তুমি কবরে ছুঁড়ে মেরেছ। নীল কোথায়? তাকেও তুমি কবর দিয়েছ নাকি? তুমি কে?"

যাজক আর্তনাদ করেন, "সেই ভিখিরিটা আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে যে! হা ভগবান! আমার আত্মাকে রক্ষা করো ঈশ্বর!"

শিকারী কুকুরের সামনে হরিণ যেভাবে প্রাণভয়ে দৌড়য়, সেভাবে পালিয়ে বাঁচলেন যাজক।

নীল এগিয়ে এল উলেনস্পিগেলের কাছে।

"মিষ্টি মেয়ে আমার, তুমি আমাকে চুমু খাও।" বললে সে……"উলেনস্পিগেলের আত্মাকে বা ফ্ল্যাণ্ডার্সের হৃদয় নীলকে কেউ কখনও পারে নাকি কবর দিতে? নীলও ঘুমুতে পারে। তবে মরতে সে পারে না! না! এসো নীল।"

তারপর সে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল নীলকে নিয়ে, কেউ জানে না কোথায়।

শেষের সেই গান এখনও গাওয়া বাকী, কিন্তু আমরা তার ঝুঁকিও জানি। তারপর আলেয়ার আলোরা কথা বলল:

"আমরা সেই আগুন, অতীতের চোখের জল আর মানুষের দুঃখদুর্দশার প্রতিশোধ; আমরা সেই প্রভুদের ওপর প্রতিশোধ, যারা তাদের জমির ওপর মানুষ শিকার করে বেড়ায়; আমরা প্রতিশোধ নিই নিষ্ফল যুদ্ধের, কয়েদখানায় ছিটিয়ে থাকা রক্তের, পুড়িয়ে মারা মানুষদের আর জ্যান্ত কবর দেওয়া নারী ও শিশুদের, আমরা প্রতিশোধ নিই শৃঙ্খলিত ও রক্তাক্ত অতীতের। আমরা সেই আগুন, আমরা সেই মৃতের আত্মা।"

এই কথায় সাতজনে (সপ্তপাপ) কাঠের মূর্তি হয়ে গেল। উলেনস্পিগেল আগুন ধরিয়ে দিল তাতে যাতে তারা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আস্তে আস্তে গড়িয়ে নামল রক্তের নদী। তারপর ছাই-এর থেকে উঠে দাঁড়াল সাতটি আকৃতি। প্রথম জন বলল:

"আমার নাম আগে ছিল অহঙ্কার; এখন আমাকে বলা হোক মহান আত্মা। এই একইভাবে কথা বলল বাদবাকীরা, আর উলেনস্পিগেল এবং নীল দেখল অর্থলিপ্সা থেকে এল অর্থনীতি; ক্রোধ থেকে এল জীবনীশক্তি; লোভ থেকে এল ক্ষুধা; হিংসা থেকে এল সব কিছুকে ছাপিয়ে যাবার প্রচেষ্টা; এবং আলস্য

থেকে এল কবি ও সাধু সন্ন্যাসীদের দিবাস্বপ্ন। আর কামনা রূপান্তরিত হল এক সুন্দরী রমণীতে, যার নাম হল প্রেম।

তারপর আলেয়ার আলোরা খুব আনন্দে উচ্ছল হয়ে তাদের ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল। এবং উলেনস্পিগেল ও নীল শুনতে পেল হাজার হাজার লুকিয়ে রাখা নরনারীর কণ্ঠস্বর, উদাত্ত এবং হাস্যমুখরিত কণ্ঠে গান :

যখন এই সাতজন অন্তরূপ নিয়ে মাটিতে এবং
সমুদ্রে তার রাজ্যপাট বিছিয়ে দেবে, তখন মানুষ,
তোমার হাত বাড়িয়ে দাও স্বর্গের দিকে ; আবার
ফিরে এসেছে সেই সব সোনা ঝলমলে দিনগুলো।"

এই দুটি বই, "রেভলিউশন ইন ট্যানারস্‌ লেন" এবং "উলেনস্পিগেল" তাদের অধিকাংশ শক্তিই সঞ্চয় করেছে তাদের জাতীয়তাবাদী উৎসাহের থেকে ইংল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের জনসাধারণের স্পিরিটের জন্য। কোলম্যান ইংল্যাণ্ড-এর দরিদ্র জনসাধারণের সংগ্রামের রক্তমাংসের রূপ। সে এসেছে সরাসরি ল্যুডাইটদের থেকে, সপ্তদশ শতাব্দীর পিউরিটানদের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ওয়েসলীর খনিশ্রমিক পর্যন্ত এবং প্রথম দিকের চার্টিস্টদের কাছেও বটে। সে এমন এক শ্রেণীর সংগ্রামী প্রোটেস্টাণ্ট যে শ্রেণীকে কোনদিন আমাদের শাসক শ্রেণী মেনে নিতে পারে নি। তার দুর্ধর্ষ প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদ আজও অব্দি চলেছে, আধুনিক শ্রম আন্দোলন হিসাবে, আর সময়ের সাথে খসে পড়েছে তার ওপর থেকে ধর্মীয় আবরণ। টিল হল রবিনহুড এবং কোলম্যানের এক মিশ্রণ। টিল হল পৃথিবী ও আত্মা, এক রুক্ষ ভিখিরি এবং অন্যায় জেরার মুখে মানবাত্মার প্রত্যুত্তর। সে হল লোককাহিনীর এক জীবন্ত রূপ। সে আমাদের রক্তের গতিকে আলোড়িত করে, সে আমাদের রক্তকে করে উত্তপ্ত, দ্রুতগতিসম্পন্ন।

কোন আধুনিক লেখক ডি কোস্টার এবং মার্ক রাদারফোর্ডের মত অত সাবলীলভাবে সহজ ভঙ্গিতে সাধারণ মানুষের চরিত্র চিত্রণ করতে পারেন না। শ্রমজীবী নর ও নারী তাঁকে যন্ত্রণা দেয়। তার কারণ কিন্তু শুধু এই নয় যে শ্রমজীবীদের অনেকেই সাধারণতঃ নিজেদের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারেন না। সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতিও তো তাদের চেয়ে স্পষ্টভাবে নিজেদের ব্যক্ত করতে পারেন না। এক বিশেষ গোষ্ঠীর মার্কিনী সাহিত্যিকরা, হেমিংওয়ে যাঁদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত তাঁরা এক বিশেষ ধরনের নিষ্ঠুর, কিন্তু সহজসরল ও দুর্বোধ্য চরিত্রের শ্রমজীবী মানুষ চরিত্র সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সে হল পোড় খাওয়া মানুষ। এবং হেমিং-

ওয়ের প্রতিভা তার জন্য শক্তিশালী এবং মনোসিল্যাবলসম্পন্ন সহজসরল ভাষা তৈরী করে গিয়েছে। সে এক অর্থে অচেতন। সে চিৎকার চেঁচামেচি করে কোন অভিযোগ আনে না। মুষ্টিযোদ্ধা, ষাঁড় লড়াইয়ের নায়ক, বন্দুকবাজ, আস্তাবলের ছোঁড়া কিম্বা সৈন্য-এর যে কোনটি হিসেবে সে তার ভাগ্যকে মেনে নিতে রাজি, রাজি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে। মার্কিনী ঔপন্যাসিকদের এই শ্রমজীবী মানুষের চরিত্রকে উইণ্ডহ্যাম ল্যুইস "মূক পশু" বলে অভিহিত করেছেন। জীবন তাদের সবসময়ে যেরকম বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আটকে রাখে সেই তুলনায় তারা নিষ্ক্রিয় কিছু উপাদানের সমতুল্য।

একজন শ্রমিকের এটাই কি যথাযথ চিত্র? অবশ্যই নয়। এমন কি 'সত্তরের বা' আশির লণ্ডনের ক্লিষ্টতম ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে না। আধুনিক মার্কিনী ঔপন্যাসিকরা তো বটেই, এমনকি কতিপয় সমাজতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকও শ্রমজীবী মানুষদের মূক, প্রতিরোধহীন জনতা হিসেবে এঁকেছেন। এঙ্গেলস এই প্রবণতার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। শ্রীমতী হার্কনেসকে লেখা তাঁর চিঠিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায় :—

"খুঁটিনাটি সব ব্যাপার সম্বন্ধে সত্যনিষ্ঠা ছাড়াও বাস্তববাদ আরেকটি জিনিস বোঝায়, তা হল টিপিক্যাল অবস্থার মধ্যে টিপিক্যাল চরিত্রগুলির পুণর্চিত্রণ। আপনার চরিত্রদের দৌড় যত দূরেই হোক না কেন, এক অর্থে তারা টিপিক্যাল। কিন্তু যে অবস্থা ও ঘটনাবলীর মধ্যে তাদের যাবতীয় চলাফেরা, সেগুলি টিপিক্যাল নয়। 'সিটি গার্ল'এ (শ্রীমতী হার্কনেসের উপন্যাসের নাম—আর ফক্স) শ্রমজীবী সম্প্রদায় এক নিষ্ক্রিয় জনতা হিসেবে অবস্থান করে, তারা নিজেদের জোরে নিজেরা দাঁড়ায় না, দাঁড়াবার চেষ্টাও করে না। ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী দারিদ্র্য থেকে তাদের মুক্তি পাবার সমস্ত চেষ্টাই বহিরাগত, যেন দৈবপ্রেরিত। (সেণ্ট সাইমন বা রবার্ট ওয়েন দুজনেই এই শ্রেণী সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন—'দরিদ্রতম হীনতম শ্রেণী')। কিন্তু ১৮০০ বা ১৮১০ সালে সেণ্ট সাইমন বা রবার্ট ওয়েন এর সময়ে এই কথা যদি সত্যি হয়ও, ১৮৮৭ সালে তা কখনও সত্যি হতে পারে না, বিশেষ করে সেই মানুষের কাছে তো নয়ই যে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রামী প্রলেতারীয়েতদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে, এবং দেখেছে মেহনতী মানুষের মুক্তি আনার দায়িত্ব মেহনতী মানুষেরই, অন্য কারুর নয়। প্রতিকূল পরিবেশের নিপীড়ন ও যাবতীয় জরাক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতিরোধের লড়াই এবং মানবিক অধিকার অর্জনের যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, তা নিশ্চয়ই ইতিহাসের এক

অংশবিশেষ, এবং বাস্তবতার ব্যাপ্ত জগতে তার নিশ্চয়ই একটা স্থান আছে।"

অর্থাৎ শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার জন্য এঙ্গেলস ভর্ৎসনা করেছেন শ্রীমতী হার্কনেসকে। কিন্তু এই একই ধারণা আমাদের সময়-কার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, বিশেষতঃ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এখনো বর্তমান। মূলত এর কারণ দুটি। প্রথমতঃ তাঁদের মতে এই ব্যাপক যন্ত্রসভ্যতা এবং সর্বাধিক উৎপাদনের জগতে শ্রমিকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিনষ্ট হয়েছে, এবং সে একরকম যন্ত্রেরই অংশবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এইসব ব্যক্তিরা ফ্যাসীবাদের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে প্রায়ই দোষ দিয়ে থাকেন শ্রমজীবীকে। তাঁরা মনে করেন এই শ্রেণীর যন্ত্রের মত বশ্যতাই এরকম গণক্রীতদাসত্ব সম্ভব করেছে। এভাবে তাঁদের অভিযোগগুলি ফ্লবেয়ারের সঙ্গে খুব অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। ফ্লবেয়ার জনসাধারণকে দোষ দিয়েছিলেন ভোটদানের মাধ্যমে লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টির একনায়কতন্ত্র সম্ভব করার জন্য।

শ্রমজীবী শ্রেণীর জীবনের সত্যতা কোনমতেই অস্বীকার্য নয়। ধর্মঘটের পরিসংখ্যান এবং ধর্মঘটের কারণগুলির দিকে একবার চোখ ফেরালেই উপরিউক্ত ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, সমগ্র জনসাধারণকে যান্ত্রিক রোবট করে দেবার চেষ্টার বিরুদ্ধে একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণীটিই লড়াই শুরু করে; একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণীই এই আপোষহীন সংগ্রামের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ছোট বড় যে কোন আয়তনের প্রতিটি কল-কারখানায়, গুরু বা লঘু, কিছু না কিছু একটা ঘটছে প্রতিদিনই। তা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বিশেষের প্রতিবাদ হতে পারে; হতে পারে আরো গুরুতর কোন সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপ, কিন্তু এই সংগ্রাম অতিশয় নিরবচ্ছিন্ন।

এলমার রাইস এবং এক্সপ্রেশনিস্ট শিবিরের অন্যান্য অনেকের নাটক, হাক্স-লি'র 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড', এবং এহেন একাধিক বই নাটক এবং ফিল্ম ধীরেসুস্থে যান্ত্রিক মানুষের ধারণাকে বড় করে তুলেছে, এরা দেখতে শিখিয়েছে মানুষকে এক সুসংহত শূন্য বা পিঁপড়ের মত মূক যান্ত্রিক প্রাণী হিসেবে। এ এক অদ্ভুত ধরনের সত্যের বিকৃতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ হল সমসময়ের মানুষজনের বাস্তব সংঘর্ষ ও প্রতিরোধের জীবন থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফল। যে যান্ত্রিকতাকে বুদ্ধিজীবী ভয় পান, তার প্রতিরোধের জন্য জোটবদ্ধ মেহনতী শক্তিকে দেখতে তিনি অক্ষম। এ হল তজ্জনিত হতাশার ফল। তবুও প্রতিটি ধর্মঘট, কলে কারখানায় প্রতিদিনের জীবন বাড়িয়ে তুলেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যক্তিগত তৎপরতা, সাহস এবং চরিত্র। পরিবেশের চাপে দেহ ও মন

যখন ধীরে ধীরে আগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার ক্রীতদাস হয়ে পড়ে তখন এই সাহস, চরিত্র ইত্যাদির জোরেই আবার মানুষ উঠেও দাঁড়ায়। মানুষের মনের আরেকটা খুব বিপজ্জনক এবং আপত্তিকর বৈশিষ্ট্য আছে, যা কলে কারখানায় ক্রীতদাস-প্রথা চালু করার চেষ্টার সঙ্গে প্রায়ই একাত্ম হয়ে ওঠে। আমরা বস্তুবাদী চোখ নিয়ে, সুসভ্য জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে খুব কম সময়েই সংবাদপত্র পড়ি, বা একটি ফিল্ম দেখি, বা কোন নাটক বা উপন্যাসের সমালোচনা করি। যদি সেই ন্যূনতম মূল্যবোধের কথা আমরা মাথায় রাখতে পারতাম তাহলে খুব স্পষ্টতঃই দেখতে পেতাম, আমাদের কালে এই ব্যাপক হারে উৎপাদিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আসলে কিছু ক্ষিপ্ত উন্মত্ত লোক যাঁরা যাবতীয় মানসিক ও চারিত্রিক বিকৃতিতে ভুগছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের কুক্ষিগত। অতএব অনুভূতির এই প্রত্যক্ষ মাধ্যম-গুলির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে যে সূক্ষ্ম ও একান্ত কৌশলী আক্রমণ চালান হয় তার প্রতিরোধ করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। অবক্ষয়, বিশেষ করে আত্মিক অবক্ষয় খুব দ্রুত সংক্রামক হয়ে ওঠে, অর্থাৎ মনের ব্যাপক মৃত্যুজনিত যাবতীয় সঙ্কটকে আমাদের রুখবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও, এইস্থানেও শ্রমজীবী সম্প্রদায় আর যাই থাকুক নিষ্ক্রিয় থাকে না। অবক্ষয়ের ঘৃণ্যতম অবস্থাতেও তারা হতাশ বুদ্ধিজীবীদের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাজার-হাজার পাঠচক্র, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গজিয়ে ওঠা ক্লাব, চলচ্চিত্র ও থিয়েটার সোসাইটি, বিশাল সংখ্যক সদস্য নিয়ে বামপন্থীদের বুক ক্লাব ইত্যাদির আর কি মানে থাকতে পারে? যদি প্রতিরোধের এই সংগঠনগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা মুক্তমনে যোগ দিতে পারতেন, তাহলে তাঁদের অভাব অভিযোগের মাত্রা কিছুটা কমত। অবক্ষয় বস্তুটি কোন আত্মিক ব্যাধির ফলস্বরূপ আসে না, এটি আসে ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার ফল হিসেবে। বুদ্ধিজীবীরা এই অবক্ষয়কে ভয় পান, কিন্তু তাঁরা পরিষ্কারভাবে এই মূলগত কথাটি বুঝতে চান না। এটিই হল তাঁদের নিয়ে প্রধান সমস্যা। একটি যন্ত্রকে বা সামগ্রিক-ভাবে চলচ্চিত্রকে দোষ দেওয়া বাতুলতা। দোষ দিতে হলে দেওয়া উচিত সেই মেশিন বা চলচ্চিত্রের ব্যক্তি মালিককে।

কলকারখানার অভ্যন্তরে এই ব্যাপক ও গণউৎপাদনের সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করতে গেলে প্রতিরোধের আগুন কলকারখানার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তা পড়বেই। এই প্রতিরোধ রূপ নেয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে, যাবতীয় রকমের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়ায়

মানব সংস্কৃতির সচেতন আত্মরক্ষার হাতিয়ার। এই প্রতিরোধ জন্ম দেয় মহান, বীরোচিত কর্মাবলীর এবং জন্ম দেয় নতুন ধরনের নরনারীর। সকলেই একমত হবেন, লাইপজিগ-এ ফ্যাসিস্ত বিচারালয়ের সামনে ডিমিট্রভ-এর প্রতিরোধ আমাদের যুগে শৌর্য ও আত্মিক সাহসিকতার এক মূর্ত প্রতীক। ডিমিট্রভকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রাথমিক স্তরে এই বুলগেরীয় সৈনিকটি তাঁর কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৯১২ থেকে ১৯১৮ সালে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৯২৩-এ যে ফ্যাসিবাদ তাঁর দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎপাটিত করে ছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। সর্বশেষ, গোটা মানবজাতির রক্ষাকর্তা স্বরূপ ফ্যাসীবাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন লাইপজিগ বিচারালয়ের মুখোমুখি। সক্রেটিসের মত তিনিও দাবী করতে পারতেন যে তাঁর সারাটা জীবন কেটেছে সদর্থক কিছু রক্ষা করার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে।

বস্তুত রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের এই কাহিনী আমাদের যুগের এক মহাকাব্য যা শিল্পীর হাতে নতুনভাবে বর্ণিত হবার দাবী রাখে। ভোলা যায় না সেই ঘটনাবলি—বার্লিনে হিটলারের ক্ষমতাদখলের পূর্বাহ্ন, রাস্তায় ঘাটে, পানশালায় এক জরাক্রান্ত উন্মত্ততা; যাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হওয়া উচিত, তাদের মধ্যে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই এ হেন এক আত্মসন্তুষ্টি। ভোলা যায় না যাদের জীবন বিপন্ন তাদের গোপনে গোপনে মরিয়া লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ। ভোলা যায় না অভিজাত ক্লাবগুলিতে, মন্ত্রীমণ্ডলীতে, সংবাদপত্র কার্যালয়ে সমর্থন কেনাবেচা, জার্মানীর গণতন্ত্র হত্যা করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি।

এবং এর মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ভ্যান ডার লুব, এক জড়বুদ্ধি, বিকৃতকামী। তার ঘোরাফেরা বার্লিনের প্রান্তদেশে, তার নিদ্রা ডস হাউসে। ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে সমাজের আবর্জনাসমূহের প্রতি সে এক নাগাড়ে বলে চলে বীরত্বব্যঞ্জক সব কথাবার্তা। সমাজের প্রতি তার এক মূর্খ-সুলভ ঘৃণা। মানসিক সুস্থতার এক বিপজ্জনক সীমান্তপ্রদেশে তার অবস্থান; তৎকালীন সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তা খুব খাপ খেয়ে যায়। সম্ভবত সে অপ্রকৃতিস্থই; যদিও পুলিশ গোয়েন্দারা, হিটলারের ঝটিকাবাহিনীর সমকামী সৈন্যরা এবং স্থানীয় নাৎসী অফিসাররা তা দেখতে অসমর্থ। রাতের অন্ধকারে সে বেরিয়ে যায় ছোটখাট অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ সারতে, এবং খুব তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে দিলে সে এক অসুস্থ উল্লাসবোধ করত। নাৎসী প্রেমের উত্তেজক

ক্ষ্যাপামীতে সে অনুপ্রাণিত হয় এবং নিজেকে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের নায়ক বলে মনে করে গর্বিত বোধ করে, অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় অবক্ষয়িত রাইখস্ট্যাগে, আর তার ক্রোধোন্মত্ত, ক্ষিপ্ত চিৎকার চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় নাৎসী গোয়েন্দার দল, নির্ধারিত হয় পরিকল্পনা, নাৎসী পুরাণে কথিত বহুস্বপ্নের সেই সন্ত বার্থলোমিউর সঙ্কেত স্বরূপ জালান হয় আগুন।

এই ডাকিনী স্থাবাথের মধ্যে আকস্মিকভাবে আগমন হয় তিনজন সুস্থ লোকের, বুলগেরিয় কম্যুনিস্ট উদ্বাস্তুদের। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। হিটলার যে সুযোগ চাইছিলেন তা পাওয়া গেল। এই অগ্নিকাণ্ডের উত্তর দিতে হয় তাদের, তাদের গোটা পৃথিবীকে বোঝাতে হয়, বস্তুতঃ হিটলার এই অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে আরো মারাত্মক এক অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর এক টিপিক্যাল জার্মান নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যক্তির আগমন; সে নিরীহ, স্থির মস্তিষ্ক, শ্রদ্ধেয়। তার নাম টর্গলার। টর্গলার তার ওপর আরোপিত দায়িত্বে এত আহত ও ক্ষুব্ধ হয় যে গোটা ব্যাপারটার ভণ্ডামি ফাঁস করে দিতে সে পুলিশের শরণাপন্ন হয়। সে যে সরল ও নিরাপরাধ এটা ছিল সন্দেহাতীত। তার যুক্তি ছিল, জার্মান বিচারালয় কিছুটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও এবং পুলিশ একটু অমানুষিক প্রকৃতির হলেও তারা নিশ্চয় উন্মাদ নয়।

কয়েদখানায় চারজনকেই দিবারাত্র শেকলে বেঁধে রাখা হয়। বুলগেরিয়ানদের মধ্যে দুজন জার্মান ভাষা বোঝেন। তাদের একজনকে আরেকজনের থেকে আলাদা করে রাখা হয়। বহির্জগতের কোন খবরই তাদের কাছে পৌছয়না। তারা শুধু এটুকু বোঝে যে তাদের পেছনে সব সময় চোখ রাঙাচ্ছে এক ভয়াবহ ঘৃণ্য মৃত্যু এবং মৃত্যু আসবে এক অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য কারণে। তারা মার খায়। তাদের কিছু পড়তে দেওয়া হয়না। এবং তাদের আধো অন্ধকারের মধ্যে বেঁধে রাখা হয় শেকলে। নিজের দেশেও তারা কারাগারের অন্ধকার ও অত্যাচার সহ্য করেছে। কাজেই তারা মরতে ভীত নয় মোটেই। কিন্তু স্বদেশে আগাগোড়া তারা এটুকু জানত যে, জেলের গরাদ পেরোলেই বাইরে অপেক্ষা করে আছে তাদের দেশবাসীরা, লড়াই করে যাচ্ছে তারা তাদের মুক্তির জন্য। কিন্তু এখানে যেন তারা অস্বাভাবিক, অপ্রকৃতিস্থ এক কালো গহ্বরে আটকা পড়ে আছে, এখানে একমাত্র ঘাতকের মারণাস্ত্রের অশুভ অলৌকিক আলোর ঝিলিকই দূর করতে পারে সেই গহ্বরের অন্ধকারকে। অনবরত এরকম দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে একজন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তাকে যদি মরতেই হয়, সে পরিচ্ছন্নভাবে মৃত্যু বরণ করবে। এবং সে হাতের শিরা কেটে ফেলে আত্মহত্যা

করার চেষ্টা করে। সে, মরেনা। তারা দুজনেই আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে, অথচ তারা লড়াই করতে পারেনা একমাত্র বাইরের সুস্থ জগতই তাদের পেছনে সাহায্যের জন্য এসে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সেই যোগাযোগটুকু করার মত লড়াই করার পথও তাদের কাছে উন্মুক্ত ছিলনা।

টর্গলারকে খুব শিগগিরই তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাকে গ্রেপ্তারকারী দুশমনরা এই 'শ্রদ্ধেয়' শক্রটির আত্মসম্মান নামক বস্তুটিকে চূড়ান্ত রূপে আঘাত ও অপমান করে এবং উল্লসিত হয়। তারা তাকে জানিয়ে দেয়, তাকে গুলি করে মারা হবে। এরপর তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এক অন্ধকার অলিন্দ ধরে। এবং ঘাতকরা তার মাথার পেছনে রিভালভারের নল চেপে ধরে অপেক্ষা করে কখন সে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠবে। অর্থাৎ তখন সে আর তার পবিত্রতা রক্ষায় মূর্তিমান পুণ্য নয়। সে তখন যে কোন বিপন্ন মানুষের মতই ভীত সন্ত্রস্ত এক সাধারণ মানুষ। সে তখনও চেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর আত্মসম্মানের অন্তত বহিঃপ্রকাশটুকু বজায় রাখতে। কিন্তু এটুকুই। তার বেশি কিছু নয়।

এই সব কিছুর মধ্যদিয়ে ডিমিট্রভের যাত্রা। যাই হোক, সে অন্যান্যদের থেকে একটু আলাদা। তার বর্তমান পরিস্থিতিকে সে তার গোটা জীবনেরই একটা অংশ হিসেবে দেখে। সেই জীবনে সে কোনও বার আত্মসমর্পণ করেনি, এবং কখন হীনমন্যতার অবস্থাকে স্বীকার করে নেয়নি। একদম প্রথম থেকে সে আবার প্রত্যাঘাত করে। তার যাবতীয় চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত হয় একমাত্র একটি উদ্দেশ্যে—কি করে শক্রপক্ষকে তাদের নিজেদের জালেই জড়িয়ে ফেলাযায়। সে জানে তারা কয়েদী; তাদের একটা সামগ্রিক বিপর্যয়ের নিছক অজুহাত হিসেবেই ব্যবহার করা হবে। সে জানে শক্রপক্ষকে তাদের নিজেদের জালেই জড়িয়ে ফেলতে পারলে গোটা দুনিয়া রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে ঐ উন্মাদটির প্রদত্ত বিবরণেই বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ তার শ্রেণীস্বার্থ, যা মানবজাতিরই স্বার্থ, তা এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

বাকী দুজন বুলগেরিয়ান জার্মান ভাষা জানতনা, কিন্তু তারা তা শেখারও চেষ্টা করেনি। ডিমিট্রভ জার্মান জানত খুব ভালভাবেই, আর সে এটা বুঝেছিল যুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলে এই ভাষাটা তার আরও ভাল করে জানতে হবে। আর সেই জন্যেই হাতে ও পায়ে শৃঙ্খল নিয়েও সে পড়ে গিয়েছে জার্মান ব্যাকরণ, রচনাবলী, জার্মান ইতিহাস ইত্যাদি। কেননা তার মনে হয়েছিল এইগুলিও এক অত্যাশ্চর্য অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে। বহির্জগতের সাথে,

বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমরেডদের সাথে আবার কিভাবে যোগাযোগ করা যায় সে কথা চিন্তা করেই কাটত তার রাত দিন। একের পর এক এসেছে ব্যর্থতা। এবং শেষ অব্দি তার মনে পড়েছে উত্তর ককেশাস পর্বতমালার মধ্যে সেই ছোট্ট খনিজ জলের উৎসটির কথা, যেখান থেকে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এলব্রূজ সমেত বরফাচ্ছাদিত বিশাল পর্বতমাল দেখা যায়। সেখানে তাকে একসময় সেণ্ট্রাল কমিটির স্বাস্থ্যাবাসে থাকতে হয়েছিল। যে ডাক্তারের ওপর কর্তৃত্বভার ছিল, তিনি ছিলেন একজন কম্যুনিস্ট। তার নিজের মত আরো অনেক পার্টি কর্মী সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তারা খনিজ জলে স্নান সেরে গার্ডেনস এর মধ্য দিয়ে উঠে এসে সোজা চলে যেত টেম্পল অব এয়ার-এ, যা বরফাচ্ছাদিত, দুর্গসদৃশ এলব্রূজের একদম মুখোমুখি অবস্থিত। মস্কো থেকে অনেক অনেক দূরে এক জায়গায় পড়ে আছেন একজন ডাক্তার। তাঁকে একটা নির্দোষ নিরাপদ চিঠি লিখলে সেন্সর কি অনুমতি দেবেনা? সেন্সর অনুমতি দিল অর্থাৎ কয়েদখানার বাইরে প্রচার বেড়ে চলল, জোট বাঁধল শক্তি। কয়েদীরা আর একা রইলনা।

নিজস্ব ইংরেজী জ্ঞান বাড়ানর জন্য সে শেক্সপীয়র পড়েছিল। এই কবির মধ্যে সে এমন কিছু পেয়েছিল যা তার মনকে আরো দ্রুতগতিতে কাজ করতে সাহায্য করেছিল, যা তার নিজস্ব চিন্তাভাবনার জগতের ওপর এনে দিয়েছিল আরো শক্ত অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ। তাকে খুব নাড়া দিয়েছিল হ্যামলেটের সেই উক্তিটি : "to thine own self be true and it shall follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man."। তার মধ্যে যে আবেগ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে তা হল তার আনুগত্য, আনুগত্য তার নিজের জীবনের, এবং তার দৃঢ় কমিউনিস্ট প্রত্যয়ের প্রতি। এই ছিল তার জীবনের রাস্তা। মৃত্যু চিন্তা তাকে প্রায়ই এসে নাড়া দিতনা। সম্ভাব্য মৃত্যুর চাইতে সে বেশি চিন্তাভাবনা করত তার জয়লাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং তার শত্রুদের কি করে পরাজিত করা যায় তাই নিয়ে। তার লক্ষ্য ছিল কি করে তার বিচারসভাকে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে কঠিন অভিযোগে রূপান্তরিত করে তোলা যায়। অপ্রকৃতিস্থ ও অস্বাভাবিক পরিবেশ তাকে কোনদিন যন্ত্রণা দিতে পারেনি কেননা সে নিজে এতই স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ ছিল যে সে জানত, সে কোনদিন ব্যর্থ হবেনা।

গল্পটির মধ্যে হাস্যরস খুঁজতে গেলেও ভুল করা হবে না। একাধিক পৃষ্ঠাতে তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, যদিও সে হাস্যরস প্রায়শই হিংস্র ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে পরিণত।

এখানে আক্রান্ত হয়েছেন যাবতীয় কর্মব্যস্ত পুলিশ অধিকর্তারা ও নাৎসী নেতারা যাঁরা মিথ্যা সাক্ষ্যর বিশাল অট্টালিকা স্থাপনে নিরত, তাঁদের সঙ্গী স্থূলমস্তিষ্ক জমিদারনীরা, ছিঁচকে চোররা, সব রকমের মানসিক অসুস্থতার রুগীরা, এখানে আক্রান্ত হয়েছে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তসমাজের পচন ধরা শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ, অপরাধ ও মানসিক ব্যাধির মধ্যেকার সেই সীমারেখা যার সাহায্যে ঐ চারজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ; এখানে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ জর্জরিত গোয়েবল্‌স্‌ ও গোয়েরিং এর সাক্ষ্য, শিক্ষিত বিচারকের আজ্ঞানুবর্তী কুকুরের মত আচরণ—এ সমস্ত একজন খাঁটি কমেডিয়ানের পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ।

আর সারাক্ষণই এর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে ভ্যানভার লুবের চেহারাটি যে সত্যি কথা বলতে পারত, যে অবনতমস্তক, নির্বাক, মানবাত্মার অপমানের মূর্ত প্রতীক। ভ্যানভার লুবে যে সর্বহারা, এমন কি যে তার নিজস্ব সত্তাকেও হারিয়ে ফেলেছে। সে এক মেফিস্টোফিলীয় নাটকের "হতভাগ্য ফাউস্ট"।

এই নাটক অত্যন্ত কর্কশ ও পুরুযোচিত, কোমলচিত্ত পাঠক এই অভিযোগ করতে পারেন। জেলের মধ্যে ডিমিট্রভ তার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পায়। তার স্ত্রী সাইবেরিয়ার মহিলা শ্রমিক ছিল। সে ছিল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, কবি, একাধারে বন্ধু ও সহ সংগ্রামী। তার মার কাছে লেখা এক চিঠিতে ডিমিট্রভের অনুভূতির সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। সে লেখে, ল্যুবা, তার স্ত্রী, এক মহানায়িকা. "যে ল্যুবাকে ভোলা যায় না"। আরেকজন মহিলার ভালবাসা তাকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখে,—তার মা'র ভালবাসা ; এই বৃদ্ধার মুখে দীর্ঘ কৃষক জীবনের অভিজ্ঞতার কুঞ্চন, এই বৃদ্ধা যে কয়টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককেই পাঠিয়েছেন বিপ্লবে। সেই সংগ্রাম থেকে দুজন আর ফিরে আসেনি। তাঁর চিন্তাভাবনা সব বাইবেলীয় জগতে। তাঁর কাছে তাঁর সন্তান জর্জ "ঈশ্বর প্রেরিত দূত পলের" মত।

কিছুটা মনোগ্রাহী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুযোগ না পেলে কোন আধুনিক ঔপন্যাসিকই এইরূপ একটি বিষয় নিয়ে লিখতেন না। সেক্ষেত্রে ডিমিট্রভের সেই গৃহকর্ত্রীর কথাও তো ধরা যেতে পারে—যিনি তাঁর আকর্ষণীয় ভাড়াটের সঙ্গে নিজের এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করে সুন্দর সুন্দর বাগ্‌দানের কার্ড ছাপিয়ে রাখতেন। অথচ তাঁদের মধ্যে বাগ্‌দান তো দূরের, কোনদিন কোনও বোঝাপড়াই হয়নি। এই মধ্যবিত্ত জার্মান মহিলাটির কাছে সে ছিল অলভ্য এক আদর্শ, তাঁর স্বর্গলোকের পতি দেবতা।

বিষয়টির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি নিয়ে আমি যথেষ্ট পরিমাণে বাক্যব্যয় করেছি। খুব স্বাভাবিক কারণেই আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, আমার মূল আলোচনার সঙ্গে এই বৃহদাকার অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাটির আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না। এটুকু হয়তো ক্ষমা করে দেওয়া যায়। কেননা আমাদের আধুনিক জীবনে অনেক অস্বাভাবিক, অত্যাশ্চর্য ঘটনা আছে, যেগুলির কল্পনাভিত্তিক ট্রিটমেণ্ট দরকার। এই অত্যাশ্চর্য বিষয়গুলিতে কল্পনার সঙ্গে মিশে থাকে মহাকাব্যিক সুর, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মানুষের শান্ত সমাহিত প্রত্যয়, নীচতার সঙ্গে আনুগত্য এবং উন্মাদের প্রলাপের সঙ্গে মানসিক সাহস ও উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত হাস্য-রস ও ব্যঙ্গ। আলোচিত লেখাটিতে এইগুলি দেখানর চেষ্টা করা হয়েছে বলেই হয়তো অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অভিযোগটুকু মেনে নেওয়া যায়। এই বিস্তারিত আলোচনার থেকে উঠে আসে এমন এক চরিত্র, যাকে অধ্যয়ন করলে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বেড়ে যায়, অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় ওপর বিশ্বাস এবং আমাদের জীবন অধ্যয়ন অনেক বেশী গভীরতা পায়।

আপনারা কিন্তু নিশ্চয়ই ভেবে নেবেন না যে লাইপজিগের যুদ্ধের জন্যই অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে ডিমিট্রভ এই পৃথিবীতে এসেছিল। তার জীবন ছিল নিজেকে জয় করার ও পুনর্নির্মাণ করার এক সংগ্রাম, এবং একইসাথে তার বলকান দেশীয় অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমাদের মধ্যে যাঁরা তাকে ১৯২৩ এর বুলগেরিয় বিদ্রোহের পরাজয়ের পরও মনে রেখেছেন, তাঁরা জানবেন পরবর্তী বছরগুলিতে নৈতিক সচেতনতার কি ধরনের অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে তাকে পার হতে হয়েছে। দীর্ঘ সময় তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে, নির্দয় আত্মসমালোচনায়। তার ব্যর্থতাই তাকে দেখাল সে তখনও প্রস্তুত হতে পারেনি, সে তখনও মানুষকে জয়ের পথে চালিত করতে সক্ষম নয়। তার ওপরে এর প্রতিক্রিয়া হল ভয়ানক। হারিয়ে যাওয়া জীবনগুলির দায়িত্ব এবং আন্দোলনের গোটা কারণটিরই ভেঙে পড়ার ধাক্কা তার ওপর দেখা দিল বেশ ভারী হয়ে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সে আবিষ্কার করল মূল কারণগুলিকে; বলকান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল কারণগুলিকে খুঁজে বের করল সে, এবং এর পর তার কাজ চলল নিজেকে নিয়ে, যতক্ষণ না তার নিজের দোষত্রুটিগুলিকে সে আবিষ্কার করল, যতক্ষণ না সে নিজেকে একজন বলশেভিক বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারল, যতক্ষণ না লেনিনের অভিজ্ঞতা

এবং রাশিয়ার শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতাতে সে নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারল।

বিচারককে সে বলেছিল, "আমি স্বীকার করি আমার গলার স্বর খুব কঠিন ও তীক্ষ্ণ। কেননা আমার জীবন সংগ্রাম কঠিন ও তীক্ষ্ণ। আমার ইচ্ছে প্রত্যেককে, প্রত্যেকটি জিনিসকে তাদের ঠিক নামে ডাকতে..... আমি একজন অভিযুক্ত কম্যুনিস্ট ; আত্মপক্ষ সমর্থন করছি, আমি আমার রাজনৈতিক সম্মান বিপ্লবী হিসাবে আমার সম্মান রক্ষা করছি, আমি রক্ষ করছি আমার কম্যুনিস্ট আদর্শ, আমার যাবতীয় আদর্শ, আমার গোটা জীবনের মর্ম এবং যাথার্থ্য।"

বিচারের পর বুলগেরিয় কয়েদীরা একটি সাধারণ কুঠুরিতে প্রথমবারের মত সাক্ষাৎ করে এবং তাদের সংগ্রামের মোটামুটি একটা খতিয়ান নেয় ডিমিট্রভ। "আমরা চারজন ছিলাম, কম্যুনিস্ট—চারজন সশস্ত্র সংগ্রামী। টর্গলার পলাতক কেননা সে তার বন্দুক ফেলে দিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছে। তোমরা দুজনে তোমাদের রাইফেল ফেলে দাওনি, নিজের নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থেকেছ, কিন্তু তোমর' গুলি চালাওনি। সারাটা সময় একা আমাকে গুলি চালাতে হয়েছে।" ডিমিটভ একাই গুলি চালিয়েছে, সম্পূর্ণ একা। লেখকের কাছে সে সব সময় মানুষের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী মানবাত্মার প্রতীক। সে রক্তমাংসে জীবন্ত একজন মানুষ।

অবলুপ্ত গদ্যশিল্প

১১

পাঠককে যদি মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে একজন মানুষের কাল্পনিক ইতিহাস রচনা কঠিনতম কাজ, কেননা তা হল এক ধরনের শিল্পসৃষ্টিই, তবে নিঃসন্দেহে তা এক নীরস মামুলি মন্তব্যের মত শোনাবে। কোন প্রত্যাশী ঔপন্যাসিক ডিমিট্রভের চরিত্র এবং লাইপজিগের সেইসব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারেন। কিন্তু তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে নিছক কিছু চরিত্র ও ঘটনাবলীর জীবন্ত বর্ণনা দিয়েই তিনি সেই উপন্যাস লিখতে পারবেন, তাহলে তাতে খুব একটা সুবিধে হবে না। না, একটি উপন্যাস ঠিক ততদূরই ইতিহাস, যতদূর তা মানুষের অস্তিত্ব, বিকাশ, জীবনযাপন এবং হয়তো মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। যথার্থ ইতিহাস লেখার সঙ্গে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, ইতিহাসে সন্দেহ বা অনুমানের কোন স্থান নেই, সেখানে সবকিছু তুলনামূলক বিচারের জন্য সংগৃহীত, সেখানে সবকিছুই পর্যবেক্ষণ মারফৎ আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ এবং যথার্থ সাধারণীকরণ।

ডিমিট্রভের কাল্পনিক এক চিত্র আঁকতে গেলে আমাদের প্রথমেই অবশ্য অবশ্যই সরে আসতে হবে আসল ডিমিট্রভের থেকে, যার বাস মস্কোতে এবং যার জন্য কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালে একটি সংরক্ষিত আসন আছে। ধরে নেওয়া যায় আমাদের কাজ শুরু করতে হবে সম্পূর্ণ সাদা একটি কাগজ নিয়ে, এবং সম্পূর্ণ নতুন এক কল্পনার ডিমিট্রভকে সৃষ্টি করতে হবে, যে যুগপৎ আসল লোকটির থেকে মহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর। মহত্তর, কেননা আমরা যদি ভাল সাহিত্যিক হই তাহলে আমাদের চিন্তাশক্তি তার সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো প্রত্যাশী করে তুলবে এবং তাঁকে আমরা কিছুটা রূপান্তরিতও করবো। ক্ষুদ্রতর, কারণ আমরা যতই চেষ্টা করিনা কেন, তাকে আমরা কিছুতেই সত্যিকারের রক্তমাংসের সেই মানুষ হিসেবে, তার যাবতীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি সহ, তার উপস্থিতবুদ্ধিসহ, তার দোষগুণসহ পুনর্সৃষ্টি করতে পারব না। আমরা কাজ শুরু করছি অবশ্যই সম্পূর্ণ শূন্য একটি ক্যানভাসের ওপর। কিন্তু তাহলেও আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম হচ্ছে বাস্তবকে কেন্দ্র করে। তার নীট ফল যা দাঁড়াচ্ছে তা শেষপর্যন্ত অবশ্যই নির্ভর করছে বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনার তীক্ষ্ণতার ওপর। যদি চিন্তাভাবনা তীক্ষ্ণ, গভীর ও প্রকাশধর্মী না হয় তাহলে আমরা ডিমিট্রভ

সম্বন্ধে আমাদের আবেগ পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে পারব না; আমার চোখে ডিমিট্রভ যেভাবে বেঁচে ছিল, পাঠকের মনেও তাকে সেভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারব না। অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চার করে দিতে হবে অন্যান্যদের মধ্যে, আমাদের জীবনদর্শনকে প্রসারিত করে দিতে হবে অন্যান্যদের জীবনদর্শনে, এবং তা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ দখল আনতে হবে বাস্তবের ওপর, যা আমাদের ধীশক্তির পূর্ণ প্রকাশের অন্যতম সর্ত।

আমরা যদি খুবই মহৎ লেখক হই তাহলে সত্যিই আমাদের লেখায় সৃষ্টি হবে এমন এক নতুন জগৎ যেখানে আমাদের চরিত্র ডিমিট্রভ সম্পূর্ণভাবে তারই নিজস্ব এক জীবন যাপন করবে। সময় এবং স্থানের নাগালের বাইরে তার অস্তিত্ব হবে স্বাধীন। তবু এক অর্থে কিন্তু সেই চরিত্রটি আদৌ আমাদের নিজেদের চরিত্র হবে না। কেননা হাজার হলেও একে ছিঁড়ে আনা হয়েছে জীবন থেকে এবং পুনর্সৃষ্ট করা হয়েছে সাদা কাগজের ওপর। সেই সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে অভিজ্ঞতার শক্তি এবং তীব্রতা। উপকরণসমূহের ওপর আমাদের কর্তৃত্ব অনুযায়ী ফলশ্রুতি যতই চিরস্থায়ী হবে, লেখাতে জীবন ও বাস্তবের প্রতিফলনও ততই সুন্দর হবে।

যাই হোক, ডিমিট্রভকে যতই ডন কুইক্সোট, টম জোনস, অ্যানা ক্যারেনিনা অথবা জুলিয়েন সোরেলের মত কালজয়ী জীবনের অধিকারী করে আঁকা হোক না কেন তাসত্ত্বেও সে সেই ছাপাখানার কম্যুনিস্ট কর্মচারীই রয়ে যাবে—যে একাই আমাদের যুগের নিকৃষ্টতম স্বেচ্ছাচারিতার রক্তপিপাসু শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সে উঠে আসবে শ্রেণী সংগ্রামের থেকে। সে উঠে আসবে সেই সব বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাত থেকে, যেগুলি সেই শ্রেণী-সংগ্রামেরই প্রতিফলন। এবং ঠিক সেই ধরনের চরিত্র-চিত্রণ করতে গেলে আমাদের কিছু শিল্পসম্মত অস্ত্র হাতে নিতে হবে। মানবাত্মার সত্য বলে প্রতীয়মান কিছু কালজয়ী বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি মানুষের বিকাশ ও জয়যাত্রাকে সম্ভব করে তুলবে যা সেই যথার্থ শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। অস্ত্র হাতে নিতে হবে এই যুগোত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মূর্তিদানের জন্য।

আগের একটি পরিচ্ছেদে আমি ফ্লবেয়ারের একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছি, যাতে বলা হয়েছে, অবশ্যই খুব প্রাসঙ্গিকভাবে, যে, একমাত্র তাঁরাই মহত্তম লেখক হতে পারেন, যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে এবং সুসংহতভাবে তাঁদের শিল্পের বিশুদ্ধ ফর্মাল দিকটিকে উপেক্ষা করেন। তৎসত্ত্বেও এ থেকে যদি এমন সিদ্ধান্ত টানা হয় যে ফর্মাল দিকটি অপ্রয়োজনীয়, তবে তা হবে যেমন বিপজ্জনক

তেমন মূর্খামি। আসলে এইসব মহান লেখকরা তাঁদের শিল্পশৈলীর একচ্ছত্র প্রভু ছিলেন। এবং যদি কখনও এরকম মনে হয় যে তাঁরা যাবতীয় নিয়মকানুন ভেঙে ফেলছেন, তাহ'লে বুঝে নেওয়া উচিত, তাঁরা এরকম নতুন নিয়মকানুনের জন্ম দিচ্ছেন একমাত্র তাঁদের কল্পনার ঔজ্জ্বল্যকে আরেকটি নতুন পথে মোড় নিতে দেবার জন্য। মার্ক্সবাদী চিন্তাভাবনা কখনও শিল্পের ফর্মের দিকটিকে অবহেলা করতে বলে না। মার্ক্সের কাছে ফর্ম ও কনটেণ্ট অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, জীবনের দ্বন্দ্বের দ্বারা পরস্পর সম্পর্কিত। এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের কাছে ফর্মের প্রশ্ন সবচাইতে প্রথমে।

উদাহরণস্বরূপ 'পরিবেশের' কথা ধরা যেতে পারে। এ হল চরিত্র এবং পরিবেশের মধ্যেকার সেই সূক্ষ্ম সম্পর্কের কথা, যা পাওয়াই কঠিন। যে লেখক তাঁর চরিত্রের বাস্তবতাকে অত্যুচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান, যিনি তাঁর লেখার চূড়ান্ত মুহূর্তগুলিকে তীব্রতায় তীক্ষ্ণ করে তুলতে চান, তাঁর কাছে এই সম্পর্ক অপরিহার্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে সামাজিক বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত অধিকাংশ উপন্যাসের মধ্যে এই গুণটি পাওয়া যায় না। অবশ্যই আবহাওয়া বা পরিবেশের প্রতি একজন সমাজতান্ত্রিক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীনতর ভাবনাচিন্তার কোন বাস্তববাদী লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক। কিন্তু তিনি এটা উপেক্ষা করতে পারেন না। অতীত এবং বর্তমান উভয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক-দের কাছ থেকেই তিনি পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক কিছু শিখতে পারেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পরিবেশ সৃষ্টিতে ফক্‌নারের জুড়ি নেই। কখনো কখনো তাঁর লেখাতে আতঙ্ক, উন্মত্ততা বা ভয়ের পরিবেশ আধিপত্য বিস্তার করে। ফক্‌নার যদি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চান তবে তাঁর গোটা বই-এর থেকে ফুটে বের হয় আতঙ্ক। এবং এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ফক্‌নার যে মাঝে মাঝে রোম্যান্টিক রচনার সবচেয়ে খারাপ আবর্তে আটকে পড়েছেন, এটাই তার অন্যতম প্রধান কারণ।

এর জন্য আমরা অবশ্য ভেবে নেব না যে চরিত্র এবং পরিবেশ দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। এরা চলে দুটি সমান্তরাল রেখাতে ; কিন্তু এদের দুজনের মধ্যে কোন সংযোগ নেই এরকম ভেবে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। আমি যা বলতে চাইছি, তা বুঝতে গেলে আবার ডিমিট্রভের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। পরিবেশের দিকটি বাদ দিয়ে এই উপন্যাসটির কথা চিন্তাও করা যায় না। প্রথমেই coup d'etat-এর পরবর্তী বার্লিনের পরিবেশ—ভয়, সন্দেহ, ও মনোভাব ব্যক্ত করতে না পারার যন্ত্রণা। কোন কিছু লুকিয়ে রাখার আতঙ্ক, একটি আধুনিক শহরের

দৃশ্যাবলী ও শব্দাবলী, ট্র্যাফিকের ঘর্ঘর, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেনের গর্জন, রাস্তার দুপাশে অদ্ভুত ধরনের আলো ঝলমলে নিওন সাইন—এ সব, সব কিছু গ্রথিত হবে হিস্টিরিয়া, সন্ত্রাস এবং অস্বস্তিকর এক প্রত্যাশার এক ভয়ঙ্কর সিম্ফনির সঙ্গে। এ রকম এক পটভূমিকায় চরিত্ররা একে একে ভিড় করতে শুরু করে যতক্ষণ না ম্যুনিখের ট্রেনে ডিমিট্রভের আবির্ভাব হয়। খুব ভোরবেলায় ডিমিট্রভ তার কামরার মহিলা যাত্রীটির সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হয়, রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের খবর ছাপান সংবাদপত্রটি কেনে সে, তারপর স্টেশনের বাইরে শহরের দিকে পা বাড়ায় যেখানে লুণ্ঠতরাজে উন্মত্ত, সভ্যতার সব শত্রুরা তার জন্য ওৎ পেতে আছে।

এইরকমভাবে কয়েদখানায় রূপান্তরিত এক শহরের থেকে নতুন যুগের প্রতীকটি খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিস্ফুট হয়। সেই একই পরিবেশ, তবে অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত ; এবং তার ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে চারজন কমিউনিস্ট সৈনিকের সেই ছোট্ট দলটি। এবং শিল্পীকে এই জায়গায় খুব সূক্ষ্মভাবে দেখাতে হয় পরিবর্তনশীল পরিবেশটিকে। পরিবেশ পাল্টাচ্ছে কেন না ডিমিট্রভ তার শত্রুপক্ষর চাইতে বেশিমাত্রায় শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকও তাঁর প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার, নিষ্ঠুরতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির থেকে সরে আসতে থাকেন তাঁর প্রতিশ্রুতিময় দ্বিতীয় দৃশ্যের দিকে। কেননা তাঁকে 'পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার' মধ্যেই দেখাতে হবে সেই বিরাট পরিবর্তনটি—কয়েদখানার রণক্ষেত্রে পরিবর্তন

তারপর সব শেষে আসে বিচারের দৃশ্য—আসে সেই বিচারালয় যেখানে প্রথম দৃশ্যের শহর থেকে যাবতীয় আণ্ডার ওয়ার্ল্ড'টি উঠে আসে ডকের ওপর, চারজন সৈনিকের মোকাবিলা করতে। অর্থাৎ বিশেষ পরিবেশটির প্রতি প্রত্যেকটি সৈনিকের প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে সজোরে প্রকাশ করে তার নিজের ইচ্ছা, পাল্টে ফেলতে চায় গোটা ব্যবস্থাকে ; মানুষ যেভাবে নিজেকে স্বীকার করে, সেভাবে সে গোটা ব্যাপারটার ওপর আলোকপাত করতে চায়। তবে ঔপন্যাসিককে আগাগোড়া মনে রাখতে হয়েছিল যে এই গুরুগম্ভীর বিচারালয়ের পেছনে, বিদগ্ধ সুশিক্ষিত সব বিচারক, তৎপর পুলিশের লোক, খিটখিটে স্বভাবের আইনজ্ঞ এবং সদা অনুসন্ধিৎসু প্রেসম্যানদের পেছনেই ওঁৎ পেতে আছে সেই কয়েদখানার সেল। প্রত্যেকটি সেসনের পরে সেখানে ফিরে আসতে হয় কয়েদীদের। আসতে হয় ডিমিট্রভকেও। ডিমিট্রভকে, তার মানে গোটা 'পরিবেশের' ব্যাপারট এত পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যাতে উপন্যাস শেষ হলে, বেঠোফেনের নবম সিম্ফনি শোনা যাচ্ছে বলে মনে হয়। শোনা যায় মানুষের

গলা। মানুষের মুক্তির কণ্ঠস্বর। তারা জীবনের বন্দনা গায় বিজয় দর্পে। আর সেই শব্দে ভেঙে যায় বিচারালয়ের দেয়াল। ভেঙে যায় কয়েদখানা।

ফরাসী প্রাবন্ধিক অ্যালেই তাঁর 'সিস্তেম ত্য বো-আর্ট' প্রবন্ধে একটি অনুচ্ছেদে উপন্যাসে এই ধরনের বর্ণনামূলক লেখা প্রসঙ্গে বলেছেন: "কেউ কেউ বলতে পারেন গদ্যের দুটি প্রণালী হল, মনন এবং বর্ণন। এদেরই সাহায্যে বস্তুনিচয় পরস্পর সংলগ্ন হয়ে থাকে, বিভিন্ন সেন্টিমেণ্ট যথাযথ আকার পায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে যে কোন বর্ণনারই পেছনে একটা শক্ত অবলম্বন চাই। ঔপন্যাসিকের উচিত নয় এমন কোন ল্যাণ্ডস্কেপ বা ঘরবাড়ি গড়ে তোলা, যার পেছনে চিন্তা বা মননের কোন ভূমিকা নেই। একইভাবে তিনি সেন্টিমেণ্টগুলিকে বা অ্যাকশন সমূহর দিকে এমন নজর দেবেন না, যার সত্যিই কোন দরকার নেই। সেই অর্থে বালজাকের হাতে যে কোন বর্ণনা অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু খুব বেশি কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়না!…এদের প্রত্যেকটি অংশই বিচার বুদ্ধির ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত। গদ্য গড়ে ওঠে এভাবেই। আপনারা বলবেন, সেখানে মনন সব সময়ই একটা শক্ত জমি পাবার চেষ্টা করতে থাকে; ঠিক যেমন কবিতায় যে কোন বর্ণনাই আসে জাক্সটাপোজিশন বা দুটি বা ততোধিক বস্তুর পাশাপাশি অবস্থানের মধ্য দিয়ে। কেননা সেখানে জমি দখল করে থাকে একমাত্র দ্বন্দ্ব। যে কোন গদ্য রচনাই সর্বাগ্রে মননের সাহায্যে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে থাকে। এভাবে সতত ভ্রাম্যমান ইমেজগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পড়ে বা একটি মূল কেন্দ্র বিন্দুতে মিলিত হয়। এখানে আপনারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে পারেন, মননই দেহ ও বস্তুর জন্ম দেয়। যদি পাঠক বাধা দেবার জন্য সচেষ্ট হন, তবে সেটা তাঁর ভুল বুঝবার জন্য। তিনি ধরে নেন মনন মানে কিছু বিমূর্ত ফর্মুলা, যা আদপেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুর ধারক বা বাহক নয়। সেদিক দিয়ে একথা খুব সত্যি যে অ্যালেনকন বা ভেরিয়ের কি ধরনের শহর সেটা যে-কোন ভৌগোলিকের চেয়ে বালজাক বা স্তেঁধাল অনেক ভাল বুঝতেন এবং আমাদের বোঝাতেও পেরেছেন।

"একটা ব্যাপার এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার মত। তা হল, এই সব বর্ণনার সময়ে, কল্পনা-শক্তি কিন্তু প্রথমে কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। তাদের একটু বিমূর্ত বলেই তখন মনে হয়; তখন এদের মধ্যে যা পাওয়া যায়, তা হল জাজমেণ্ট বা বিচারবোধ। বর্ণনার পরের দিকে আস্তে আস্তে পাঠককে সব কিছু দেখিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য যেভাবে কোন দৃশ্য দেখান হয়, সেভাবে নয়। সক্রিয় মানব চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে তারা যেভাবে জমে ওঠে, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হয়, সেভাবেই।"

লেখক নরনারী সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে গেলে প্রাথমিক যে উপকরণের ওপর নির্ভর করেন, তা হল শব্দ। তিনি চিন্তা করেন, সেই সূত্রে তাঁর লেখা আসে; এবং তাঁর চিন্তাভাবনার যৌক্তিক অনুক্রম বা পরিণতি প্রকাশিত হয় কথোপকথন বা বাক্যের সুসংহত আকারের মধ্যে। স্টাইল, গদ্যের ছন্দ, গদ্যের প্যাটার্ণ ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায়, যদিও তা বহু কথিত নীরস মামুলি মন্তব্যই হয়ে দাঁড়াবে। তা হল, এমন কোন জীবন্ত স্টাইল নেই, যাতে শব্দ এবং চিন্তা বা মননের এই সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবেনা। অর্থাৎ, অন্যভাবে বলা যায়, রোম্যান্টিক মননের জন্য দরকার স্টাইল, বাস্তববাদী বা সরল 'গদ্যময়' মননের জন্য চাই সহজ স্টাইল। জোরজার করে একটা বিশেষ স্টাইল তৈরী করার চাইতে, বা মননের বিকল্প হিসেবে অলঙ্কারকে বেছে নেবার চাইতে বিরক্তিকর জিনিস খুব অল্পই আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, কোন কোন সময়ে যখন চিন্তাভাবনা করা খুব কঠিন, বেদনাদায়ক বা অশালীন হয়ে পড়ে, তখন স্টাইলও প্রভাবিত হয় এবং সেটাই অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে। ইদানীং কালের জীবনী লেখার 'শিল্প' এ ব্যাপারে একটি বিরাট বড় উদাহরণ। এর সবটাই হল চিন্তাভাবনাহীন এক অদ্ভুত ভান বা কৃত্রিমতা, সুতরাং চূড়ান্ত স্টাইলাইজেশনের শিকার।

অভিব্যক্তির মহত্তম গুপ্তধন সঞ্চিত আছে যে কোন জাতির ফোক ল্যাঙ্গুয়েজ বা লোক-ভাষার মধ্যে। যদিও নিরন্তর এই ভাষার মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত ও পরিবর্তন ঘটে চলে, তবুও কখনই এ মরে না বা বিলুপ্ত হয় না। মহৎ লেখকদের সম্বন্ধে বলা যায়, সত্যিই তাঁরা কোন প্রবাদতুল্য ভাষা তৈরী করেছেন, না নিছক তার ব্যবহার করেছেন, সেটা বিচার করে বলা খুব কঠিন। চসার থেকে শুরু করে শেক্সপীয়র এবং শ পর্যন্ত দেখলে বোঝা যায়, মূলতঃ এই জনপ্রিয় এবং প্রায় প্রবাদতুল্য ভাষার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছেন কম বেশি সব লেখকরা। বিদ্বান সমালোচকরা এবং সাহিত্য-ঐতিহাসিকরা একটা কথা তো বলতে বলতে প্রায় গতানুগতিক করেই ফেলেছেন যে, বাইবেলের ইংরাজী সংস্করণ ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের প্রায় পুরো অংশটারই উৎসস্বরূপ। তাসত্ত্বেও, আমি যদ্দূর জানি, আজ অব্দি কেউই দেখতে চেষ্টা করেননি, সেই সংস্করণের কতটা এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ জনগণের সাধারণ কথ্য ভাষা ছিল। অবশ্যই এ কথা সত্য যে, বাইবেলের ভাষা মিলটন ও 'পিলগ্রিম্স প্রগ্রেসে'র ভাষার সঙ্গে এক সাথে এমন এক সাহিত্যিক উত্তরাধিকার তৈরী করে

দিয়ে গিয়েছে, যা ইংল্যাণ্ডের কোন উচ্চ শ্রেণীই দাবী করতে পারবেনা। এবং এভাবেই তখন থেকে বাইবেলের ভাষা অনেকাংশে সাধারণের ভাষা হয়ে উঠেছে। আমাদের শতাব্দীতে ভাষা ও অভিব্যক্তির এই উৎকর্ষ দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু অংশত আমেরিকা থেকে ভাষা আমদানীর জন্য এবং অংশত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রাণবস্তু যে আবার সজীব হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের আধুনিক লেখার এই ফ্যাকাশে, রক্ত শূন্য ভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী হল সজীবতার এই উৎসধারা থেকে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরে থাকা। খুব সীমিত সংখ্যক যে কয়জন গদ্যলেখকের লেখা যথার্থই প্রাণবন্ত, কিপলিং তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার লোকভাষায় কিপলিং অবগাহন করেছেন। যন্ত্রশক্তির দুর্দম বিকাশকে ঘিরে গড়ে ওঠা নতুন জনগণের মিথলজির অন্তর্গত লোকভাষার সাম্প্রতিকতম ও আধুনিকতম প্রকাশকে গ্রহণ করতেও তিনি ভয় পেতেন না। ভাল গদ্য লেখার শিল্প হল প্রতিটি বস্তুকে তার সঠিক নামে ডাকবার অধুনালিপ্ত শিল্প। ডিমিট্রভ ডকের ওপর থেকে ভাষণ দেবার সময় এর থেকেই পেয়েছিল তার শক্তি। সব চাইতে রূঢ় ও অদ্ভুত সত্য হল এই যে, এই ক্ষমতা আমাদের দেশে এখনও যাদের মধ্যে আছে, তারা হল শ্রমজীবী মানুষ। কেননা তারা এখনও জীবনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, এখনও তারা তাদের শব্দ কোষে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দের আমদানী ঘটায়। অনেক আমেরিকান লেখক তাঁদের দেশে এই ঘটনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ফলত, তাঁদের দোষত্রুটি যাই থাকনা কেন, তাঁরা এমন একটি নতুন জীবন্ত শিল্প গড়ে তুলেছেন, যা আমাদের ইংরেজ সাহিত্যিকদের কাছে পাওয়া যাবে না।

সত্য ভাষণে আদৌ পিছপা নয়, এই রকম শেষ লেখক হিসাবে আমরা উইলিয়াম কবেটকে পেয়েছিলাম। মার্ক্স তাঁকে বলেছিলেন, "গ্রেট ব্রিটেনের সব চাইতে রক্ষণশীল এবং সবচাইতে র‍্যাডিক্যাল মানুষ—প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের যথার্থ প্রতিভূ, এবং নব্য ইংল্যাণ্ডের বলিষ্ঠতম পূর্বপুরুষ। যার যা প্রাপ্য তাকে সেইটুকু প্রদান করাই ছিল কবেটের গুণ।

যে গ্রাম অঞ্চলের ওপর দিয়ে তিনি ঘোড়ায় করে যান, তার যখন বর্ণনা দেন তিনি, তখন জমির আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যটুকু পর্যন্ত দেখিয়ে দেন, অথচ তিনি যখন ইংরেজ হিসেবে কোন দৃশ্য বর্ণনা করেন, বর্ণনা দেন কোন গায়ক পাখীর, লিঙ্কন-শায়ারের খোলা অনাবাদী জমির, গ্রামের কোন ঘরে চাষীদের সাক্ষাৎ-বৈঠকের, ইয়র্কশায়ারের কোন ঘোড়ার হাটের তখন তিনি আগাগোড়াই একটা কথা

সম্বন্ধে সচেতন থাকেন—তা হল, এই সব, সবকিছু মানব জীবনেরই অংশবিশেষ ; এবং তাদের সৌন্দর্য বা মানে সবকিছুই মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। হাডসন বা জেফ্রিস-এর মত প্রকৃতি-লেখকদের থেকে এখানেই তাঁর পার্থক্য। কবেটের ইংরেজী সরাসরি এসেছে কবেটের ইংল্যাণ্ড থেকে। যেমন :

"হান্টিংডনশায়ারের সেন্ট ইভস্-এ যখন ছিলাম, সেই খোলামেলা গ্রামটিতে আমি চাষীদের সঙ্গে বসতাম, সন্ধ্যের খাবার তৈরী হত, ততক্ষণে পাইপ খেতাম গরু ঘোড়ার গাড়ি-তৈরীর একটা দোকানে, ছুতোরের বেঞ্চের ওপর বসে। আমার দোস্তরা হাটে চারপেয়ে মাংসওলা জীবগুলোকে নিয়ে পাকাপোক্তভাবে বসবার কোন জায়গা পায়নি। তাই ফেন্‌স্ থেকে তারা আসত, যেত ওয়েনের দিকে। একদিন যখন বসে ছিলাম, দেখি সবার হাতে হাতে একটা হাণ্ডবিল ঘুরছে—কোন এক খামারবাড়ির একগাদা জিনিসপত্র বিক্রী হবে, সেই ব্যাপারে। চাষের জিনিসপত্তরের মধ্যে 'খুব ভাল একটা আগুন নেভাবার যন্তর, কয়েকটা ইস্পাতের কলকব্জা', ফাঁদ আর স্প্রিংয়ের বন্দুকও' আছে। এটাই কি তাহলে কোন ইংরেজ চাষীর জীবন ? মনে আছে ইলবীচ থেকে বোস্টনের রাস্তায় প্রায় মাইল ছয়েক হেঁটেছিলাম। আগেই আমি এইসব চত্বরের জমিজমার চিরস্থায়ী ধনঐশ্বর্য দেখেছিলাম। প্রায় পাঁচ, সোয়া পাঁচ মাইল আসার পর একটা সরাইখানা পেলাম, ভাবলাম সকালের কিছু খানাপিনা পাওয়া যাবে। একগুষ্টি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যে বুড়ি বেরিয়ে এল, তার কাছে না আছে এক টুকরো মাংস, না আছে একটুকরো রুটি। তার একটু দূরেই একটা ঘর, ওপরে বড় বড় করে লেখা আছে সরাইখানা। মালিকের কাছে খাবার বলতে একমাত্র নুনে জড়ানো শুকনো শুয়োরমাংসের শিরদাঁড়ার একটুখানি অংশ। কাছাকাছি যদিও অনেক বাড়িঘর ছিল, মালিক আমাকে বলল, লোকজন এত গরীব গুর্বো হয়ে পড়েছে, যে কসাইরা পর্যন্ত লোকালয়ের মধ্যে মাংস কাটা ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের যে অবস্থা হয়েছিল, সেরকম। অথচ সেই জায়গাতেই আমি আমার চারপাশে ঘাসের জমিতে কম করে হাজার দুয়েক মোটাসোটা ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। আর কতদিন, আর কতদিন, হে ভগবান, এভাবে চলবে! আর কতদিন, এভাবে উপচে ওঠা খাবার দাবারের মধ্যে মানুষজন উপোস করে থাকবে ? এই অবস্থায় আর কতদিন সম্পত্তি সংরক্ষণ করবে আগুন নেভানর যন্ত্র, ইস্পাতের ফাঁদ আর স্প্রিং-য়ের বন্দুক ?"

আমি খুব সভয়ে বলছি, কবেট একজন বিশুদ্ধ শিল্পী ছিলেন না। কিন্তু

তিনি এমন একটা ভাষায় লিখেছেন, যা খুব অসাধারণভাবে খাঁটি গদ্যের ভাষার কাছাকাছি চলে গিয়েছে; যেখানে শব্দ এবং ধারণার মধ্যেকার সংযোগটি এত সুস্থ ও সুখী, যে তা নিয়ে পাঠকের মনে কোন প্রশ্ন ওঠেনা। আজ আমাদের দিনে, এই গদ্যশিল্প মৃত্যুঞ্জয়ী। কেননা কোন বস্তুকে ঠিক তার নামটিতেই ডাকতে গেলে সেই বস্তুটিকে ভয় পেলে চলবেনা, এমন কি সেই বস্তুর এবং নিজের মধ্যখানটিতে কোন বাধা সৃষ্টিও হতে দেওয়া চলবেনা। কবেটের গদ্যসংক্রান্ত ধারণা ছিল এক আর বি. বি সি. র গদ্যসংক্রান্ত ধারণা আরেক। কবেট ভাষা ব্যবহার করতেন জীবনকে প্রকাশ করতে, বি বি. সি. সেটা করে জীবনকে গোপন করতে। একজন সৈনিক বা একজন চাষীর ইংরেজী উচ্চারণে উষ্ণতা আছে, আবেগ আছে, যুক্তিবোধ আছে।

পোর্টল্যাণ্ড প্লেসের ভদ্রলোকদের মিহি ভাষণের মধ্যে কোন অনুভূতি বা আবেগ, চিন্তা বা যুক্তির ছাপ, জীবনের পরিচিত বা ভালবাসার জিনিসগুলোর কোন ছাপ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হল, সেই সব ভূত এবং জুজুবুড়িদের ফাকাশে প্রতিচ্ছবি, যাদের আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলির বিকল্প বলে মনে করেন। হয়তো এই ধরনের তুলনা করাটা অশোভন। সত্যিই হয়তো এটা খুব বিষন্ন করে দেবার মতই একটি ঘটনা যে, কবেটের সময় থেকে আমাদের আজকের দিন পর্যন্ত বি. বি. সি র এই রক্তশূন্য, নির্দোষ আদর্শের দিকে, আমাদের ভাষার বিবর্তন ঘটেছে। এই বিবর্তনে জীবনের সত্যকে ভয় পাওয়া হয়, এবং আমাদের শ্রেণীসমাজের বুদ্ধিজীবী অস্তিত্বের এটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। যদি প্রতিটি বস্তুকে ঠিক সেই নামেই আমরা ডাকতে চাই, তাহলে বায়ুর অনুকূলে অনেকটা যেতে হবে আমাদের, সাহিত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে খুব দৃষ্টিকটু লড়াইয়ে আমাদের নামতে হবে। সে লড়াইয়ের পাশে ভিক্টর হুগো বা কীটসের লড়াইকে খুব ক্ষুদ্রাকৃতি মনে হবে এবং আমাদের ভাষাকে নতুন রক্ত দিতে আমাদের সৃষ্টিশীল, আবিষ্কারমুখীন দক্ষতাকে যথাসাধ্য কাজে লাগাতে হবে। সম্ভবত এখানে কবিরা এগিয়ে যাবেন সবার আগে। যদি তাই হয় তাহলে সাদরে আহ্বান জানানো যাচ্ছে: লড়াইয়ে সামিল হতে উৎসাহ যোগাবে আমাদের অতীত। অতীতে আমাদের ভাষার ভবিষ্যৎ এবং তাকে গড়ে তোলার জন্য যে নিরন্তর সংগ্রাম, তা সবসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হয়ে থেকেছে জাতীয় মুক্তির জন্য স্বয়ং আমাদের দেশেরই মূল সংগ্রামের সাথে।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

১২

লেখকের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক অদ্ভুত ও জটিল; কেবলমাত্র লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার চাইতেও জটিল। কেননা বিবিধ শ্রেণীর, বিবিধ বৈচিত্র্যময় স্বার্থসমন্বিত বিচিত্র আবেগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিসমৃদ্ধ লোকজনকে নিয়েই জনসাধারণ। আপাতদৃষ্টিতে যতই উদাসীন বা এমনকি জীবনবিমুখ ও অলস মনে হোক না কেন, প্রচণ্ড শ্রেণীসংগ্রামে, বিবিধ জাতীয় এবং জাতিগত কুসংস্কার, মানবজীবনের পথে নিজের পথ তৈরী করে নেওয়া ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের প্রভাবে জনগণই আন্দোলিত বা প্রভাবিত হয়। জনগণের মধ্য থেকেই লেখক তাঁর চরিত্রদের বেছে নেন, এবং জনগণের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাঁর পাঠকরা। জনগণের মধ্য থেকেই তিনি বেছে নেন তাঁর প্রাথমিক উপাদানগুলি এবং একই সঙ্গে তাঁর সমালোচকদের। আমরা দেখতে পাই মহৎ উপন্যাসগুলিতে লখক, চরিত্র এবং পাঠকদের মধ্যে এক ধরনের প্রাণবন্ত ঐক্য পাওয়া যায়। যেখানে সেই ঐক্যের অভাব, যেখানে লেখক বিচ্ছিন্ন জনসাধারণ থেকে, যেখানে লেখক উপেক্ষা করেন জনসাধারণকে, কিংবা অজ্ঞ থাকেন তাদের সম্বন্ধে, সেখানে খুব আশঙ্কা থেকে যায় রক্তশূন্যতার; সেখানে লেখকের কল্পনার রসায়নবিদ্যায় একটা খুব গুরুত্ব-পূর্ণ উপাদানের যেন অভাব থেকে যায়, যা লেখকের মননশক্তিতে এনে দেয় দীনতা, খর্ব করে দেয় তাঁর ক্ষমতা। অবশ্য সব সময় এ রকমটি ঘটেনা বা ঘটতেই হবে এমন কোন কথাও নেই। আমরা জানি স্তাঁদাল সচেতনভাবেই এমন এক জনসাধারণের জন্য লিখে গিয়েছিলেন, যারা তখনও জন্মায়নি। তিনি মেনেই নিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের জেনারেশনে কেউ তাঁর লেখা বুঝতে পারবে না।

ব্যক্তিগত জীবনে একজন লেখক যতই নিষ্প্রভ বা নিরীহ হোন না কেন, জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর হওয়া উচিৎ দ্বিতীয় হেনরি ও তৈমুরলঙের এক সংমিশ্রণ। প্রত্যেকের ইচ্ছা ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি। তবুও একটা ব্যাপার থেকেই যায়। চূড়ান্ততম স্বৈরাচারীটিও কিন্তু ঠিক যথার্থ শাসক হয়ে উঠতে পারেন না, গড়ে তুলতে পারেন না ইতিহাস যদি তিনি ইতিহাসকে বুঝতে না পারেন, যদি তিনি মানবজীবন নিয়ন্ত্রণকারী অদৃশ্য

শক্তিগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সহানুভূতিশীল না হন। কাজেই লেখককে অত্যন্ত গভীরভাবে চিনতে হবে তাঁর জনসাধারণকে। তাঁর যেন মনে হয় সমাজের প্রতিটি লোক তাঁর এক সরাইখানার বন্ধু, প্রতিটি নারী তাঁর ঘনিষ্ঠ, প্রতিটি শিশু তাঁর নিজের শিশুর মত। ইতিহাসের সবচাইতে স্মরণীয় স্বৈরাচারীরা, এমন কি যাঁরা ঐশ্বরিক এক দূরত্ব নিয়ে বসে থাকতেন নিজেদের সিংহাসনে, তাঁরাও নৈশকালে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়তেন তাঁদের প্রজাসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য। যে লেখক এভাবে তাঁর জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন না তিনি নির্বীর্য। তি'ন ভ্রান্ত জীবনদর্শনের অধিকারী।

এই সৃষ্টিশীল সংযোগকে পুরোপুরি সম্ভব ও সার্থক করে তুলতে কেবলমাত্র সহানুভূতিই সব কিছু নয়। বরং বলা যায় লেখকের সহানুভূতির পেছনে থাকা উচিত ইতিহাস সচেতনতা ও যুক্তিবোধ। তাঁর দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাঁকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। সেই উত্তরাধিকারকে তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। কেন না রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে জনগণ নিজেরাই কাজে লাগাতে পারে।*

---

*ট্র্যাডিশন এবং উত্তরাধিকারসূত্র সংক্রান্ত এই প্রশ্ন নিয়ে 'দি সেক্রেড উড'-এ টি এস ইলিয়ট একটি অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করেছেন, যার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত নই। তিনি বলেছেন, লেখকের ইতিহাস ভিত্তিক একটা ধারণা থাকা উচিত যা তাঁকে কেবলমাত্র নিজের জেনারেশনকে নিয়ে লিখতেই বাধ্য করবে না বরং তাঁকে এই জিনিসটাও বুঝিয়ে দেবে যে, হোমার থেকে শুরু করে, ইউরোপের সামগ্রিক সাহিত্য জগৎ এবং তাঁর নিজের দেশেরও সামগ্রিক সাহিত্য, যুগপৎ বিরাজ করছে এবং যুগপৎ একটি নিয়ম তৈরী করে দিচ্ছে।

এ একটি আংশিক সত্য মাত্র কেননা বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অতীতের কোন অর্থ থাকে না, আবার বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্ত অতীত সম্পর্কে তার নিজের বিচারবুদ্ধি বহন করে চলে। এই বিচারবুদ্ধি কি ভাবে তৈরী হয়, সেটা দেখাই হল সমালোচকের কাজ। যাই হোক, ট্র্যাডিশন সম্বন্ধে মিঃ ইলিয়ট কমবেশি প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় এক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। "বিচ্ছিন্নভাবে কোন কবির বা কোন শিল্পীর, কারুরই কোন অর্থ থাকেনা। তাঁর যাথার্থ্য বা তাঁর পরিমাপ হল মৃত কবিদের বা মৃত শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিমাপ করার সামিল। আপনি তাকে বিচ্ছিন্ন একাকীভাবে যাচাই করতে পারবেন না; বৈপরীত্য বা তুলনামূলক ব্যাপারটা বুঝে নেবার জন্য তাঁকে আমাদের অবশ্যই মৃতদের মধ্যে স্থাপন করে দেখতে হবে।"

বস্তুত এই দুটি উত্তরাধিকার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত। কোন জাতি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তার রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে ইতিহাসে টিকে থাকতে পারে না। সে লেখক অতীতের সংস্কৃতি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কেবলমাত্র কিছু ফ্যাকাশে প্রেতাত্মাকেই পেয়ে থাকেন, ট্র্যাডিশনের কোন জীবন্ত শরীরকে খুঁজে নিতে পারেন না। তিনি তাঁর নিজের উদ্দেশ্যর সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন। কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবে, মহত্তম লেখকরা তাঁদের সময়ের সক্রিয় জীবনযাত্রার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। শেক্সপীয়র তাঁর

*অতীত ও বর্তমানের এই মূল্যায়ণ যথার্থ নয়। দুয়ের মধ্যে যদি সত্যিই কোন ইন্দ্রিয়গত সংযোগ থাকে তবে তা নিশ্চয়ই নিছক 'বৈপরীত্য ও তুলনা'র মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না। এতো খুবই সত্যি কথা যে কবিকে আমরা একটা ব্যাপক ব্যাপ্তিরই অংশবিশেষ হিসেবে ধরে থাকি ; কিন্তু তাঁকে আমরা সেই অংশ হিসেবে দেখিনা যা কেবলমাত্র তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রের দ্বারাই নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত ও নির্দেশিত হয়ে থাকে। কবি বা ঔপন্যাসিক কোন মৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নন। অতীতকে তিনি ব্যবহার করেন কেবলমাত্র অতীতকে পাল্টানোর জন্যই নয়, বর্তমানকে পাল্টানোর জন্যও। সংস্কৃতি এমন একটি বস্তু যাকে আমরা বেঁচে থাকার জন্যই ব্যবহার করব, কেবলমাত্র নন্দনতত্ত্ব সাধনার জন্য নয়।

মিস্টার ইলিয়ট সত্যি সত্যিই এই ব্যাপারটি অংশত বুঝেছিলেন ; কেননা মুখবন্ধেই তিনি স্বীকার করেছেন যে সেক্সপীয়রের চাইতে তিনি দান্তেকে বেশী মূল্য দিয়েছেন বলে সংস্কৃতিকে তিনি জীবনের এমন একটি সক্রিয় প্রতিনিধি বা শক্তি হিসেবে দেখেছেন যে এখানে পাশাপাশি এসে গিয়েছে নীতি ধর্ম এবং রাজনীতির প্রশ্নও। 'ট্র্যাডিশনের' ওপর তাঁর রচনাতে তিনি বলেন, প্রতিটি নতুন কাজ খুব সূক্ষ্মভাবে অতীতের গোটা ধারাকে আস্তে আস্তে পাল্টে ফেলে। কিন্তু এই পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তিগুলি কি কি ? এই পরিবর্তন আসেই বা কি করে ?

আমাদের নিজেদের জীবন যেভাবে আমাদের বাধ্য করে সে ভাবেই আমরা অতীতের বিচার করে থাকি। আমাদের জীবন শুধু আমাদের ঐতিহ্য, পৈতৃক-সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, তা দাঁড়িয়ে আছে শ্রেণীসংগ্রামের ওপরেও। প্রতিটি নতুন সৃষ্টির মধ্যেকার পরিবর্তনের পেছনে এটিও কাজ করে। আমরা কেবলমাত্র অতীতকেই দেখতে পারি না। আমরা অবশ্যই সর্বাগ্রে বর্তমানকে দেখব। দেখব সেই বর্তমানকে যা সবসময় পরিবর্তনশীল।

ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে একজন সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে কাজ করেছেন। মিল্টন স্থ' এবং কু'র সংগ্রাম নিয়ে এক মহাকাব্য খাড়া করে যাওয়া ছাড়াও ইংরেজদের ইতিহাসের মহত্তম বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর গদ্য রচনাগুলিতে এমন কিছু রাজনৈতিক নীতি প্রকাশ করে গিয়েছেন, যা তাঁর দেশের লোক বিপদকালে উপেক্ষা করতে পারবে না। বিচারক ফিল্ডিং ছিলেন দরিদ্রের সহায়, এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এক অমানুষিক আইনী ব্যবস্থার সংস্কার সাধক। প্রথম এবং মহত্তম রোম্যান্টিক কবি বায়রন 'চাইল্ড হ্যারল্ড' লেখা ছাড়াও ল্যুডাইস্ট্‌দের ওপরে লর্ডসের সামনে বক্তব্য রেখেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন, "এক ঐশ্বরিক সংযোগে বাঁধা পড়ে আছে জীবন ও মৃত্যু, বাঁধা পড়ে আছে সারা জীবনের সৎ, সাহসী ও জ্ঞানীজনরা। এই সংযুক্ত সমষ্টি থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হব না।"

ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে প্রদত্ত অভিভাষণে মিলটন বলেছিলেন: 'যদি এইসব মুক্ত লেখনী ও মুক্ত কণ্ঠের প্রধান কারণ জানতে চাওয়া হয়, তাহলে দেখিয়ে দিতে হয় এই কোমল মনোভাবসম্পন্ন, স্বাধীনতাকামী ও মনুষ্যচিত সরকারকে। তা হল সেই স্বাধীনতা, যা সকল বৃহৎ ও মহৎ প্রতিভাকে লালন পালন করে; এ হল সেই জিনিস যা স্বর্গীয় প্রভাবের মত আমাদের নতুন অনুভূতি প্রদান করেছে এবং আমাদের আলোকিত করেছে। এবং আমাদের ধ্যানধারণাকে মুক্ত ও স্বাধীন করেছে, ব্যাপ্ত করেছে ও উত্তোলিত করেছে অচিন্ত্যনীয় স্তরে। আপনারা এখন আমাদের ক্ষমতা খর্ব করতে পারেন না, আমাদের অজ্ঞতর করে দিতে, সত্যানুসন্ধিৎসা থেকে বিরত করতে পারেন না। কেননা আপনারাই আমাদের এই উচ্চতায় নিয়ে এসেছেন। আর তা করতে গেলে প্রথমে আপনাদেরই আরো কম সহানুভূতিশীল এবং আরো কম স্বাধীনতা কামী হতে হবে। আমরা আবার সেই আদিমতায়, অজ্ঞানতায় এবং ক্রীতদাসপ্রথায় ফিরে যেতে পারি। কিন্তু আপনাদেরও তাহলে অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী হতে হবে। এবং আপনারা তা পারবেন না, কেননা যাঁদের হাত থেকে আপনারা আমাদের মুক্ত করেছেন, তাঁরাই ছিলেন ঐ ধরনের লোকজন। আজ যে আমাদের হৃদয় অনেক বেশি প্রশস্ত, আমাদের চিন্তাভাবনা যে অনেক মহান এবং যথার্থ বিষয়াবলীর প্রত্যাশায় ও সন্ধানে অনেক বেশি সজাগ ও ব্যগ্র, এ হল আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত আপনাদের গুণাবলিরই প্রকাশ। আপনারা যতক্ষণ এক বাতিল-করা ও নির্দয় আইনকে পুনরায় জারি না করছেন, ততক্ষণ আপনারা কোন দমনমূলক নীতির মধ্যে আসতে পারছেন না। ···সব স্বাধী-

নতার আগে আমি চাইব জানবার, কথা বলবার এবং বিবেক অনুযায়ী মুক্তকণ্ঠে তর্ক করবার স্বাধীনতা।”

অ্যাথিনী দেবীর মত স্বাধীনতা জিনিসটি একেবারে হঠাৎ পুরোপুরি রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি। এ হল ইতিহাসের, বহু পর্যায়ের এক মন্থর এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ যাত্রা বা বিকাশ। এর প্রতি পদক্ষেপে আছে বহু বিপ্লব ও বহু পরিবর্তন। মিলটন ইংরেজ ইতিহাসের এমন এক সমস্যার সময়ে এ কথা বলেছেন যখন এক ধরনের সম্পত্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা ও একগুঁয়েমিকে ভেঙে ফেলা দরকার হয়ে পড়েছিল, কেননা সেটা ইংরেজদের বস্তুবাদী অগ্রগতি ও মানসিক অগ্রগতি উভয়ের ওপরেই এক ভারী শৃঙ্খলের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক বিশেষ ধরনের স্বার্থপরতাকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল; কিন্তু তার বদলে আর এক ধরনের সম্পত্তি, আর এক ধরনের ইতর আত্মম্ভরিতা এসে সেই স্থান পূরণ করেছিল। আজকের দিনে তা সামগ্রিকভাবে প্রগতির পরিপন্থী, আজকের দিনে তা ইংরেজদের মনের ওপর চেপে বসা বেড়ীর মত, যা তাদের স্বাধীনতার জাতীয় উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। মিলটনের কাল থেকেই ইংরেজরা একটা জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে, এবং ইংল্যাণ্ড একটি ভিন্ন ধরনের দেশ। কিন্তু এখন সেই সময় এসেছে যখন মিলটনের উত্তরসূরীরা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক ক্রীতদাসত্ব এবং জাতীয় অবক্ষয় একে অপরের সঙ্গে জড়িত, অঙ্গাঙ্গীভাবে। জাতিকে যদি বাঁচতে হয়, স্বাধীনতাকে তবে অবশ্যই আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে।

এখানে বাধ্য হয়ে অনেকটা রাজনৈতিক শিক্ষাদানের মতই একটা ঝুঁকি নিতে হচ্ছে আমাকে, যার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে আমার মূল বক্তব্যের খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই বলে মনে হবে—আমি আমার পাঠকদের দু'টি সবচাইতে অপ্রীতিকর ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেব, যে ঘটনা এই বছরে—উনিশশো ছত্রিশ সালেই ঘটেছে এবং পাঠককে বলব আমাদের জাতীয় জীবনের ওপর এই ঘটনা দুটির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবটি নির্ণয় করতে। আমার বিশ্বাস তা করতে গিয়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, এই ধরনের রাজনৈতিক ঘটনা এবং আমাদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়বস্তুর মধ্যে যথার্থই একটা সংযোগ আছে, যা পর্যায়ক্রমে লেখকের কল্পনাতেও ছাপ ফেলে।

উনিশশো ছত্রিশ সালে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ জনসাধারণের সম্পদ ও ব্রিটিশ জাতির উত্তরাধিকার দেখাশোনা করতে গিয়ে এমন দুটি অপ্রীতিকর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে যেখানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসমূহ ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী

স্বার্থকে বিপদাপন্ন করে তোলে। তার মধ্যে প্রথমটি হল আবিসিনিয়াতে ইটালীর অ্যাডভেঞ্চার। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে এর তীব্র বিরোধীতা করলেও পরে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে এই আগ্রাসন নীরবে মেনে নেয়; মেনে নেয় এই বন্ধুদেশের ধর্ষণ, এবং এভাবে পরোক্ষে ইতালীর ফ্যাসিস্ত স্বৈরাচারকে সমর্থন জানায় পূর্বভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও আড়াআড়িভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের ওপরে এক বিরাট ক্ষমতা কায়েম করতে। দ্বিতীয়তঃ যখন কতিপয় জেনারেল এবং অনিয়ন্ত্রিত ফ্যাসিস্ত প্রতিক্রিয়াশীল স্পেনের আইনানুগ এবং গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে সেই দেশের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলে, ইংরেজ সরকার তখন পুনরায় কিছুটা দোদুল্যমানতা এবং কিছুটা সিদ্ধান্ত নেবার অক্ষমতা দেখিয়ে স্বাধীনতার চাইতে প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে, এবং এইভাবে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমদুয়ারে অগ্রগামী জার্মান এবং ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকে কম বেশি সম্ভব করে তোলে।

দুটি ক্ষেত্রেই সরকার চালিত হয়েছে একটা সঙ্কীর্ণ শ্রেণীচেতনা দ্বারা, যা তাকে সহানুভূতির দিক দিয়ে নিজের ঘরের গণতান্ত্রিক মানুষজনের চাইতে বিদেশী স্বেচ্ছাচারিতার অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তৎকালীন সরকার জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কাজ করেছে, এবং ঘটনাচক্রে এই সরকার যে স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালীদের প্রতিনিধিত্ব করত, তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেও ঘা দিয়েছে। হয়তো ধরে নেওয়া যেতে পারে যে স্পেনের ঘটনাবলী ইংরেজদের মনে ঐতিহাসিক কিছু স্মৃতির দরজায় নাড়া দিয়েছিল। ব্রিটিশ রেজিমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সালামাঙ্কা, বাদাজোজ, ভিত্তোরিয়া, আলবুয়েরা, তালাভেরা এবং ব্রিটিশরক্তে ভেজা আইবেরিয়ান উপদ্বীপের আরো অসংখ্য শহর ও গ্রাম। ব্রিটিশ ইতিহাসের বৃহত্তম সমুদ্রযুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়েছিল ট্রাফালগার অন্তরীপের অদূরে। ব্রিটিশ অস্ত্রের শব্দে মুখরিত এই বৃহত্তম মিলিটারি অভিযান, ব্রিটিশ ইতিহাসের শেষ সামরিক অভিযান যাতে জয় ও গৌরব উভয়েই এসেছিল, যাতে সমান মাত্রায় প্রদর্শিত হয়েছিল সাহস এবং সামরিক প্রতিভা—সেই অভিযান চালান হয়েছিল এক কঠোর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে স্পেনে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য। ব্রিটিশদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শৌর্যের সঙ্গে যেসব স্পেনীয় স্বেচ্ছাসেবকরা লড়াই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্পেনীয় জ্যাকবিনরা ও বিপ্লবীরা।

কল্পনাপ্রবণ প্রতিভাধরের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভেবেছিলেন ব্রিটেন ও স্পেন উভয়ের জন্যই এই লড়াই ছিল এক জাতীয় যুদ্ধস্বরূপ।

এমন এক রাজ্য থাকতেই পারে 'যার শিরোদেশে একজন মানুষেরই চিন্তা-ভাবনা কাজ করবে। যা কিছু করার তা রাজ্যের চূড়ান্ত ক্ষমতা যার হাতে সে-ই ইচ্ছেমত করবে' এহেন এক ঘৃণ্য, অমানবিক ধারণার বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল জনগণের এই যুদ্ধ। ঐ একই অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ দেখেছিলেন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৭৯৩ সালে; এবং তা ছিল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এক অন্যায় যুদ্ধ। সরকার সেখানে যে স্বল্পসংখ্যক মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করছিল, তাদেরই সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল দৃষ্টিকটুভাবে।

নেপোলিয়ান যখন প্রাণবন্ত বৈপ্লবিক এক শক্তি থেকে গোটা ইউরোপ জুড়ে সামন্ততন্ত্রের বন্ধন ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আবার ইতিহাসেরই দ্বান্দ্বিক নিয়মে এই একই সামন্তান্ত্রিক শক্তিগুলির মিত্র এবং রক্ষাকর্তা হয়ে উঠলেন; যখন জাতীয় স্বাধীনতাযোদ্ধার স্তর থেকে তিনি সরে এসে অন্যান্য জাতিগুলির স্বাধীনতার ওপর অত্যাচার শুরু করলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল খুবই যুক্তিযুক্ত এবং প্রয়োজনীয়, ঠিক যতটা সঠিক এবং প্রয়োজনীয় ছিল তাঁর পরাজয়ও।

টিউডরদের থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অব্দি ইংরেজ বুর্জোয়াজি ইতিহাসের একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তারা দেশের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশসাধন করেছিল, সৃষ্টি করেছিল এক মহৎ সাহিত্য এবং এক মহৎ বিজ্ঞান, প্রভাবিত করেছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির বিকাশ এবং পর্যায়ক্রমে নিজেও প্রভাবান্বিত হয়েছিল তাদের দ্বারা। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল তার শ্রেণীস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ। যখন এই দুটি জিনিস একান্তভাবে সম্পর্কিত হয়নি, যখন তাদের অন্ধ করে রেখেছিল সম্পত্তির লোভ, এবং স্বল্পসংখ্যক পচনশীল এবং সঙ্কীর্ণ শাসনকর্তার অযোগ্যতা, তখন সাধারণত তার ফলশ্রুতি হয়েছিল জাতীয় দুর্যোগ, যেমন আমেরিকার যুদ্ধে, বা বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম দিকটিতে। এই বুর্জোয়াজি এবং বুর্জোয়া মানসিকতা সম্পন্ন অভিজাততন্ত্রের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড নামক ছোট দ্বীপটির এক মুঠো মানুষের শক্তি ও সাহস এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই বস্তুটি লাভ করতে তাদের কাজে লাগাতে হয়েছিল ঘৃণ্য নিষ্ঠুরতাকে। যে যে দেশ তারা জয় করেছিল, সেখানে তারা স্থাপন করে-ছিল এমন স্বৈরাচারের ভিত, যা তাদের স্বদেশে কোনদিন সহ্য করা হোতনা। এ কাজ তারা করেছিল বিজিত থেকে বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তার অভিজাত মিত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক কর আদায়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু, এমন

কি এখানেও, তাদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। যদিও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সপক্ষে কৈফিয়তদানকারীরা এই কথাটি যেভাবে ব্যবহার করেন, আমি সেই অর্থে 'প্রগতিশীল' কথাটি ব্যবহার করছিনা। মার্ক্স যেভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের এই বৈপ্লবিক দিকটিকে বর্ণনা করেছেন, তা ভোলা যায় না। তার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ইংল্যাণ্ড এবং প্রাচ্যের সম্পর্কের মধ্যে কিছু গুরুতর উপাদান পাওয়া যায় যা জাতীয় প্রতিভাকে প্রাণবন্ত করে তোলার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সেই নব-কল্পনা গড়ে তুলবার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল। পরে এই ব্যাপারে আলোকসম্পাত করতে হবে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব প্রসঙ্গে মার্ক্স বলেছিলেন :

"ল্যাঙ্কাশায়ারে সুতো কাটার লোককে এবং বাংলাদেশে তাঁতীকে প্রতিষ্ঠিত করে, অথবা হিন্দু চরকাচালক এবং তাঁতী উভয়কেই দূরে হটিয়ে দিয়ে ইংরেজ হস্তক্ষেপ এই আধা-বর্বর, আধা-সভ্য সম্প্রদায়গুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিপ্রস্তর, এবং এভাবে জন্ম দিয়েছিল এক মহত্তম এবং, সত্যি কথা বলতে কি, এশিয়ার একমাত্র সামাজিক বিপ্লবের। …এ কথা সত্যি, হিন্দুস্থানে এক সামাজিক বিপ্লব সম্ভব করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ড চালিত হয়েছিল কিছু নীচ স্বার্থ দ্বারা, এবং সেগুলি জোর করে চাপাতে গিয়ে সে আরো মূর্খসুলভ কাজ করেছিল। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হল, এশিয়ার সামাজিক রাজ্যে মানুষ কি কোন মৌলিক বিপ্লব ব্যতিরেকেই তার পূর্ণভাগ্য লাভ করতে পারবে ; যদি না পারে, তবে ইংল্যাণ্ডের যত অপরাধই থাকুক না কেন, এই বিপ্লব সংঘটিত করতে ইংল্যাণ্ড ছিল ইতিহাসের হাতে নিছক যন্ত্রস্বরূপ।"

এই আলোচনায় শেষ টানতে গিয়ে মার্ক্স আরো বলেছেন :

"ইংরেজ বুর্জোয়াজি যাই করতে বাধ্য হোক তা জনসাধারণের মুক্তিও আনতে পারবেনা, তাদের সামাজিক পরিস্থিতি রদ বদলও করতে পারবেনা। বুর্জোয়াজি কেবলমাত্র উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের ওপরই নির্ভর করেনা। জনসাধারণ এই শক্তিগুলি কিভাবে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে তার ওপরও নির্ভর করে। কিন্তু যে জিনিসটি বুর্জোয়াজি কখনো করতে ভোলেনা তা হল উভয়ের জন্যই একটি বস্তুবাদী জমি তৈরী করে যাওয়া। বুর্জোয়াজি কি তার চাইতে বেশি কখনো কিছু করেছে ? ব্যক্তিকে বা সমষ্টিকে রক্তপাত, মলিনতা, দুর্দশা আর অধঃপতনের মধ্যে টেনে না নিয়ে গিয়ে কি বুর্জোয়াজি কখনো কোন প্রগতি আনতে সক্ষম হয়েছে ? যতদিন খোদ গ্রেট

ব্রিটেনে সমসাময়িক শাসনযন্ত্র শিল্পসভ্যতাজাত সর্বহারাদের হাতে উচ্ছেদ না হচ্ছে, যতদিন হিন্দুরা স্বয়ং ইংরেজদের জোয়াল নিজেদের হাতে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মত যথেষ্ট বলিষ্ঠ না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়রা তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের বপন করা সমাজের নতুন উপাদানগুলি থেকে ফল আহরণ করতে পারবে না।"

মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী মনে রাখলে ইংরেজ সরকারের নীতি আফ্রিকা ও স্পেনে কেন পর্যুদস্ত হয়েছে আমরা সেটা বুঝতে পারবো। ভারত ভূমির ওপর ইংরাজদের যে অধিকার রয়েছে সেটা ইংরাজ সরকারকে তার অর্থনৈতিক শক্তির অনেকটাই যোগায়। এক দিকে সেই অধিকার রক্ষার আকাঙ্ক্ষা : আরেকদিকে জার্মানি বা ইটালীতে মানব সভ্যতার অগ্রগতির শত্রু ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি স্বভাবজাত সহানুভূতি। আমাদের শাসকশ্রেণী, এই দুনিয়ায় যার প্রগতিশীল ভূমিকা অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে, সেই শাসকশ্রেণী এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে এমনই দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত যে সেটা প্রায় অপরাধের সমান। সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ জনসাধারণের স্বার্থ থেকেও শাসকগোষ্ঠী নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, এবং এমনকি ব্রিটিশ জনসাধারণ যে স্বাধীনতাসমূহ ও জাতীয় স্বাধীনতা ভোগ করে সেগুলিকেও এনে ফেলেছে এক বিরাট ঝুঁকির মুখে।

ক্ষয়িষ্ণু ইংরেজ শাসকদের অগাধ সম্পত্তি যাদের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে এই রকম কিছু বৃহৎ শক্তি আছে যারা ইংরেজদের চাইতেও অনেক বেশি বাছবিচারহীন এবং স্বৈরাচারী, যারা সংস্কৃতির সাধারণ মানবিক অধিকারের সঙ্গে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করে অবক্ষয়ের চূড়ান্ততম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। এই অধিকার রক্ষা করতে হলে শাসকশ্রেণীকে অবশ্যই সংঘবদ্ধ হতে হবে গণতান্ত্রিক চেতনা এবং প্রগতির সঙ্গে ; রুখে দাঁড়াতে হবে ফ্যাসীবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার তাঁরা তর্ক করেন, এমত অবস্থায় হয়তো শেষ অব্দি স্বদেশে তাঁদের সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে কিছু ব্যক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে তাঁদের বিপদে ফেলবে। সুতরাং এক দ্বিধার মধ্য দিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এমন এক সমঝোতা করতে হবে যা কোন ব্রিটিশ-ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, বা একচেটিয়া শিল্পব্যবসায়ের চাইতেও অধিকতর ঝুঁকিতে ফেলবে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকারগুলিকে। এতে করে ভারতবর্ষে, আফ্রিকাতে বা পশ্চিম এশিয়াতে দস্যুবৃত্তিও চলতে পারবে ভালভাবেই।

গণতন্ত্র এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আরবীয়, আফ্রিকান ও ভারতীয় জন-

সাধারণের সংগ্রামকে সমর্থন জানানোর দিকে আজকাল ইংরেজরা আগ্রহী। মুক্ত মানুষের মৈত্রীই সবার স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হতে পারে, এমনকি ইংরেজদের স্বাধীনতারও। সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারের যে ঠুঁটো মূর্তি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্র তৈরী করে গিয়েছে তা জাতি হিসেবে ইংরেজদের পূর্ণ স্বাধীনতার এক বিরাট প্রতিবন্ধক। তাদের তৈরী দেয়ালের নীচে একদিন তারাই চাপা পড়বে। এবং ইংরেজরা যদি নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত না হয় এবং বন্ধুত্বের হাত না বাড়িয়ে দেয় এক স্বাধীন ভারত, স্বাধীন আফ্রিকা ও স্বাধীন আরবের দিকে, তাহলে সেই দেয়ালের নীচে তাদেরও চাপা পড়বার সম্ভাবনা প্রবল।

এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে এত সুদূরপ্রসারী আলোচনার একমাত্র কারণ হল এই সমস্যার সঠিক সমাধানের সঙ্গে আমার প্রবন্ধের বিষয়, শৈল্পিক সমস্যাটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আজ একটি জাতি হিসেবে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। এ আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে আমরা ইতিহাসের এমন একটা সময়ে জন্মেছি, যখন আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আজ্ঞা করা হচ্ছে। এরকম একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে হ্যামলেট তার ভাগ্যকে নিয়ে অনুশোচনা করতে পেরেছিল। এবং আমরাও ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারি আরো শান্তিপূর্ণ এক সময়ের জন্য। কিন্তু আমরা স্বীয় সিদ্ধান্ত নেবার থেকে খুব একটা দূরে সরে যেতে পারি কি? পারলেও হ্যামলেট যতদূর গিয়েছিল ততটাই যেতে পারি। তার বেশি নয়। আমরা সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ যার মৃতদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আমরা পাশে সরে দাঁড়াতে পারি না। আমাদের কার্য দ্বারাই আমাদের কল্পনাশক্তিকে করতে হবে সুদূরপ্রসারী, কেননা আমাদের ভেতরকার আবেগ আকাঙ্ক্ষার কাছে আমাদের যথার্থ ও বিশ্বাসী হয়ে থাকতে হবে।

লণ্ডনে আর্থার শ্নিৎস্‌লের নামক এক বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান নাট্যকারের একটি নাটক চলছে। বিষয়বস্তু হল ইহুদী-বিদ্বেষ। মিস্টার ডেসমণ্ড ম্যাককারথি এক সংবেদনশীল আলোচনাতে বলেছেন, নাটকটি পুরনো ধাঁচের, উপরন্তু রচয়িতাও জীবিত নেই। কিন্তু অদ্ভুতরকম জীবন্ত হল এর বিষয়বস্তু, এমন কি রচয়িতার জীবদ্দশাতে যতটা ছিল, তার চাইতেও বেশী জীবন্ত। সমালোচক আরো বলেন, নাটকটি পুরনো ধাঁচের, কেননা "নাটকটির গঠন পুরোপুরি নাটকটির সঙ্গে খাপ খাইয়েই তৈরী করা হয়েছে, যা আজকাল খুব কমই হয়, কেননা যে সব নাট্যকাররা তাঁদের নিজেদের কাজ সবচাইতে ভালভাবে জানেন,

তাঁরা নিজেরা জীবন সম্বন্ধে কি চিন্তাভাবনা করবেন তা জানেন না, এবং সেই কারণেই তাঁরা যথোচিত ভাবে এমন নাটক লেখেন যা দর্শককে ভাবাতে পারে।"

শিল্পী নিজে জানে না জীবন সম্বন্ধে কি চিন্তাভাবনা করতে হবে। তবু যতক্ষণ শিল্পী জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে সাহস না পাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি জীবনও সৃষ্টি করতে পারেন না। তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোকজনকে নিয়ে তিনি ছোটখাটো এক চিত্র নির্মাণ করতে পারেন, বা একেবারেই ক্ষতিকর নয় এইরকম আবেগ ইত্যাদিকে তিনি ব্যবচ্ছেদ করে দেখাতে পারেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে, কিন্তু মন ব্যতীত তিনি জীবন সৃষ্টি করবেন কি ভাবে! "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমার অস্তিত্ব আছে" কথাটা শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনই প্রযোজ্য। ফরাসী প্রাবন্ধিক অ্যালেই খুব চমৎকারভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, সমসাময়িক মনস্তত্ত্বের একটি প্রধান দোষ হল, অস্বাভাবিকতা ও অসুস্থতাতে খুব বেশি পরিমাণে বিশ্বাস করা। সামগ্রিক মানবসমাজ থেকে দূরে সরে থাকবার প্রচেষ্টা হল জীবনের সামগ্রিক ভয়ভীতিরই অংশ বিশেষ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সিদ্ধান্ত ছিল: "এই মানবসমাজ থেকে আমরা যেন কখনো পরিত্যক্ত না হই। এবং আমরা আশা রাখব।" গোটা মানবসমাজ থেকে পরিত্যক্ত না হলে তখনই কেবলমাত্র আশা থাকতে পারে।

আধুনিক ঔপন্যাসিক আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকের প্রাথমিক ত্রুটি অনেক সময়ই গ্রহণ করে নেন। অতঃপর প্রথম জন অস্বাভাবিকতা ও অসুস্থতা সংক্রান্ত স্বীয় কল্পনার একটি ভিত্তিভূমি খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ আশা নামক বস্তুটি হয় তাঁর থাকেই না, অথবা আশার কোন ভিত্তিভূমি খুঁজে নেবার সাহসটুকুও তাঁর থাকে না। একথা এভলিন ওয়া সম্বন্ধে সত্যি হয়েছে—তিনি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে আটকে গিয়েছেন রোমান চার্চের দুর্বোধ্য নিরাশাবাদে। এ কথা খাটে অ্যালডাস হাক্সলি প্রসঙ্গেও, যিনি ঐ একই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রচার করেন এক নেতিবাচক, শান্তিবাদী নৈরাজ্যকে। প্রকারান্তরে তা যাবতীয় কার্যকলাপের নেতিকরণের সামিল, এবং মিস্টার ওয়ার গোটা দুনিয়াকে তার ভালমন্দসহ সার্বিকভাবে পরিত্যাগ করে দেওয়ার সঙ্গেওএর খুব একটা মূলগত তফাৎ নেই বললেই চলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে "সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকের হাতে তরবারি হল ঘৃণার সর্বাপেক্ষা বোধগম্য প্রকাশ।" অ্যালডাস হাক্সলি সু এবং কু'র মধ্যে এই পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম ছিলেন, কেননা তা করতে গেলে মানবজীবন সম্বন্ধে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার, যা অস্বাভা-

বিকতা ও অসুস্থতার অস্তিত্বকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় না। অতএব হাক্সলি ঘৃণার এই প্রতীকটিকে এতই ঘৃণা করেছিলেন, যা তিনি স্বয়ং শয়তানকেও করতেন না।

আজ রুশবিপ্লব ঘোষণা করেছে, অত্যাচারএবং মানুষের ওপর মানুষের শোষণ ছাড়াও মানবজীবন সংগঠিত করা সম্ভব। মানবজীবন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মুক্ত এবং সাম্যবাদী মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তির উপর রুশবিপ্লব যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে, তার অভাবই আধুনিক কল্পনাকে এরকম কৃশকায় করে দিচ্ছে। সোভিয়েত সাহিত্য যতই নবীন এবং অসম্পূর্ণ হোক না কেন, এর গুরুত্ব রয়েছে এখানেই। আমাদের নিজেদের তেজে এবং স্বাধীনতার অফুরন্ত উৎস থেকে কি করে আবার আমরা নতুন ক্ষমতা পেতে পারি, রুশ বিপ্লব তা দেখিয়ে দিয়েছে। এই স্বাধীনতার মন্ত্র আমাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ; এই স্বাধীনতা হল মানুষ যা হবেই, তাকে সেইমত করে তোলার স্বাধীনতা।

এই একই অনুপ্রেরণা দায়ক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তাঁর কালে কল্পনাশক্তি অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের উৎস থেকে। "Great was it in that dawn to be alive"। এই সূর্যোদয়ের বিশাল ব্যাপ্তি তাঁর মনমানসে এনেছিল 'লিরিকাল ব্যালাড্স্'এর ঝঙ্কার। পরবর্তীকালের দুর্দশাগ্রস্ত বছরগুলিতে, যে করেই হোক, ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই সতেজ দৃষ্টি অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিল। কিন্তু স্পেনের জাতীয় বিপ্লবে এবং ইংরেজ জনসাধারণের মধ্যে সেই বিপ্লব যে ধরনের আলোড়ন তুলেছিল, তাতে সেই সতেজভাব পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। এই সতেজভাব তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের অন্যতম মহান এক নিদর্শন রেখে যেতে। কাব্যিক কল্পনার যথার্থ ভিত্তিভূমি উন্মোচিত করতে গিয়ে Tract on the Convention of Cintra-তে একজায়গায় তিনি বলেছেন :

উৎপীড়ন স্বয়ং নিজের শত্রু। এক অন্ধ ও পূর্ব নির্ধারিত শত্রু। এই উৎপীড়নের জন্যই স্পেনের উপকার হয়েছে। স্পেন এক অভাবনীয় বর্বর অত্যাচারের বলি হয়েছিল আর তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ভালবাসাভরা ও ঘৃণ্য একটি বস্তুর। যার মধ্যে ভীতিও আছে, আশাও আছে। মানব মনের দাবীকে যথাযথ ভাবে (যদি তা সম্ভব হয়) তৃপ্ত করেছে। যে হৃদয় স্পেনের হয়ে এগিয়ে এসেছে, তা যদি পিছিয়ে পড়ে, তবে সেই পশ্চাদপসরণ হবে হৃদয়টির আভ্যন্তরীণ, গঠনমূলক দুর্বলতার জন্য ;

বহির্জগৎ থেকে সরবরাহ করা রসদের অভাবের জন্য নয়। কিন্তু এরকম লোকবিশ্বাস আছে এবং এরকম বিশ্বাস বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় যে অনেকেরই হৃদয় গঠনগত দিক দিয়ে যথার্থই দুর্বল। এবং তা অনেকসময়ই পশ্চাদপসরণকারী হয়। সেইসব হৃদয় যথাসময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এগিয়ে আসতে পারে না। যাঁরা এই প্রতারণার মধ্যে আছেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করব পেছন পানে তাকাতে, দৃষ্টি রাখতে নিজেদের চতুর্দিকে, অভিজ্ঞতার সন্ধানে। এই ব্যাপারটা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে এক বিশ্বাস আসে। সেই বিশ্বাস কেবল যে ভ্রান্ত বিশ্বাসটিকে সমর্থন করে না তাই নয়, তা এও প্রমাণ করে যে প্রকৃত সত্য আসলে সেই ভ্রান্ত ধারণার একান্ত বিরোধী। যুগযুগান্তের ইতিহাস দেখুন—ঝড়ের পর ঝড় আর সংগ্রাম—সংগ্রাম বিদেশে, সংগ্রাম স্বদেশে, সংগ্রাম অল্পসময়ের ব্যবধানে বা নিরবিচ্ছিন্ন, এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে, শেষে পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত সংঘর্ষে—কেন? কি কারণে? কিন্তু তবুও আছে সাহস, আছে অধ্যবসায়, আছে আত্মোৎসর্গ, উদ্দীপনা—ঠিক যেমন আছে স্বীয় ভয়ঙ্কর নগ্নতায় প্রকাশিত নিষ্ঠুরতা, যা সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে নিষ্ঠুর মানুষকে, যা কখনও কখনও টেনে এনেছে আপাতদৃষ্ট শুভসঙ্কেতের লোভ দেখিয়ে কিছু সদাশয় লোককে। যারা সুমেরুপ্রভার মত কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য। যা পরস্পর পরস্পরের আক্রমণকারী অসংখ্য দল; গণবিক্ষোভ, বিক্ষোভ ব্যক্তির, বিক্ষোভ সমষ্টির; শাণিত নখে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হিংস্র ঝড়···চোরকাঁটার মত আটকে থাকা দুর্দশাজনিত উদ্বেগ ও উৎপীড়ন, অন্ধকারে হানা দেওয়া প্রেতাত্মার মত লজ্জা; ভয়ের মত চেপে বসা প্রতিশোধস্পৃহা, অসুস্থ উচ্চাশা। এইসব আভ্যন্তরীণ অস্তিত্বসকল এবং প্রতিটি শহরে ও গ্রামে দৃশ্য এবং পরিচিত দৈনন্দিন ঘটনাবলি শহরের রাজপথে এবং নাট্যশালার চার দেয়ালের মধ্যে জনস্রোতের সহিষ্ণু ঔৎসুক্য ও সংক্রামক হর্ষোল্লাস? কোন মিছিল বা গ্রামীন নৃত্য, শিকার, ঘোড়দৌড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, বিশাল কিছু লাভের পর আনন্দোল্লাস, ঘণ্টাধ্বনি সহযোগে তা পালন করা, অথবা কোন মূর্খ উত্তরাধিকারীর পৈতৃক রাজ্য লাভ···এই সবই তর্কাতীতভাবে দেখিয়ে দেয় যে, যাবতীয় কলহে, প্রতিযোগিতায়, সন্ধানকার্যে, আনন্দোল্লাসে, যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে, মানুষের যে আবেগ তা মানুষের নিজের দ্বারাই খুঁজে নেওয়া হোক বা তাদের ওপর আরোপিতই হোক—এ সবই অপরিমেয়ভাবে ছাপিয়ে যায় সংলগ্ন ঘটনাটিকে বা বস্তুটিকে। মানবসভ্যতার আসল দুঃখটা এখানেই তার মানে এই নয় যে মানুষের মন সততই ব্যর্থ হয়—আসলে কথাটা হল এই যে, কার্যকলাপ ও

জীবনের পথ এবং দাবীদাওয়াগুলি মানবিক চাহিদাগুলির মর্যাদা ও গভীরতার সঙ্গে খুব কমসময়েই তাল রেখে চলে অতএব পশ্চাদপসরণ করতে যা কিছু বা যে কেউই ধীরগামী হক না কেন, তাকে বর্জন করতে এবং তার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করতে সময় লাগে না মোটেই।"

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কল্পনা এবং জীবনের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন, স্নিৎস্লের-এর সমালোচনা করতে গিয়ে মিস্টার ম্যাককারথি ঠিক তার উল্টোটি ভেবেছেন, এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে খুব মিলে গিয়েছে আধুনিক লেখকদের বক্তব্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থের দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক এবং বীরোচিত, কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গি এমন এক স্থির বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত, যা বিশ্বাস করে, মানুষ হল "যাবতীয় ঘটনাবলির সার্বভৌম কর্তা, যা বিশ্বাস করে মানুষের আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা ও গভীরতা পূর্ণতা পেতে পারে একমাত্র কাজের মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকেও ছাপিয়ে উঠতে পারলে। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত ইতিহাসে, মানবজাতির সাধারণ ইতিহাসে, এরকম মুহূর্ত খুব দুর্লভ যখন জীবনের আকাঙ্ক্ষা, মানবআকাঙ্ক্ষার মর্যাদা ও গভীরতার সঙ্গে পুরোপুরি সমান তালে চলতে পারে। আমরা আজ এরকম এক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি যখন গোটা দুনিয়া জুড়ে শ্রেণীসংগ্রাম "এক স্থির লক্ষ্য তৈরী করে নিয়েছে। তা একই সঙ্গে ভালবাসার ও ঘৃণার—চেতনার ও আকাঙ্ক্ষার। তা মানবাচেতনার দাবীদাওয়ার তুলনায় প্রচুরই বলা চলে।" যে ঔপন্যাসিক এই কথা বুঝতে পারবেন তিনি তাঁর কালের ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়াবেন, তিনি নতুন করে সৃষ্টি করবেন আধুনিক সভ্যতার মহাকাব্য, তিনি সৎ থাকবেন যথার্থ ইংরেজ উত্তরাধিকারের প্রতি।

ফ্রান্সের গণতন্ত্র ভালভাবে জরীপ করলে দেখা যায় সেখানে বুদ্ধিজীবী মহলের আন্দোলন রিপাবলিকান চেতনার রাজনৈতিক পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সমান মাত্রায় ঘটে চলেছে। ফরাসী জনসাধারণের জাতীয় স্বাধীনতা সঙ্কটের মুখোমুখি, তাঁদের অমূল্য জাতীয় উত্তরাধিকার বিপদাপন্ন। তবুও তাঁরা এক সাধারণ সমরাঙ্গণে, জোটবদ্ধ হয়েছেন তাঁদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে, এবং তাঁদের দেশকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও সুখী করে তুলতে। এই আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ ঐক্যের সঙ্গে প্রথম থেকে সংযুক্ত হয়ে এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্ন খেটে খাওয়া মানুষজনকে সংহত ও একত্র করার জন্য ছড়িয়ে পড়ে ফরাসী সাহিত্যের সবচাইতে বিচিত্র উপাদানগুলিকে সংঘবদ্ধ করেছে, বিশেষতঃ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তো বটেই। সাম্রাজ্যবাদী ম্যালরঁ, নৈরাজ্যবাদী সেলিন, উদারনীতিক জুল রোমঁ্যা,

সমাজতান্ত্রিক ব্লক, চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জিদ, এঁরা সকলেই একটি সাধারণ জমি খুঁজে নিতে পেরেছেন। আবার তাঁরা এসে মানুষের কমিউনে প্রবেশ করেছেন, আর সেই মানবসমাজ তাঁদের সাহায্য করেছে ফরাসী সাহিত্যের মহৎ ট্র্যাডিশনগুলি পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য। তাই তার মধ্যে তাঁরা তাঁদের শিল্পের জন্য প্রাণদায়িনী শক্তিটিকে খুঁজে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ডেসমণ্ড ম্যাককারথি ব্রিটিশ নাট্যকারদের সম্বন্ধে যেরকম বলেছেন যে তারা জানেই না জীবন সম্বন্ধে কি ভাবা উচিত, এইরকম চূড়ান্ত অপমান আর তাঁদের স্বীকার করতে হবে না।

আমার মতে উপন্যাসের পুনর্জন্মের জন্য যা অপরিহার্য, সেই আধুনিক ও বৈপ্লবিক কল্পনাশক্তিকে গড়ে তোলার জন্য আরেকটি উপাদানের ঘাটতি আছে। তা হল বর্ণ, স্বপ্নালু কল্পনা বা ফ্যাণ্টাসি এবং ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উপাদান, যা আমরা রেনেশাঁর সময় থেকেই প্রায় হারিয়ে বসে আছি। তখন তা এসেছিল প্রাচ্য থেকে, সদ্যআবিষ্কৃত ইন্দ্রজালের দেশ প্রাচ্য থেকে। হাজার হাজার মাইল মরুভূমির ওপর দিয়ে ক্যারাভানের সারি যেত সুদূর চীনের দিকে, ইংল্যাণ্ড এবং পর্তুগালের নাবিকরা পরিক্রমা করে বেড়াত গোটা পৃথিবীটাকে—এসব তখন নতুন নতুন সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ঘটাত যা সত্যিই মানবমনে জ্বালিয়ে দিত সন্ধানের ও জিজ্ঞাসার আগুন। যে উপাদানের কথা আমি বলতে চাইছি, তা সম্ভবত সবচেয়ে পরিস্ফুট সার্ভাতের মধ্যে, যদিও তা শেক্সপীয়রের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

এখন এশিয়া তার দীর্ঘ ঘুম ভেঙে উঠছে, এখন এইসব প্রাচীন ও ঐতিহাসিক লোকজনের মধ্যে তাদের তৃপ্ত জীবনীশক্তির এক বৈপ্লবিক ঘোষণা শোনা—"পশ্চিমী" ভাবধারা প্রাচ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে বলে, আবেগপ্রবণ লোকেরা অনুতাপ করছে। "পশ্চিমী" ভাবধারা বলতে তারা বিজ্ঞান ও উৎপাদনের কথা বোঝাচ্ছে। তাঁদের অনুশোচনার প্রয়োজন নেই। এশিয়ার জনগণের কিছু অংশতো ইতিমধ্যেই তাঁদের মুক্তি অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁরা যেদিন আধুনিক বিজ্ঞান ও উৎপাদনের এই উপকরণগুলিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করবেন, সেদিন আর তারা স্বীয় দুর্বলতাসমূহকে ক্রীত-দাসসম অনুকরণ করবেন না। জীবনসংক্রান্ত এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে তাঁদের সহযোগিতা হবে একান্ত প্রয়োজনীয়। এশিয়ার জনসাধারণের কথা আমি উল্লেখ করছি বারবার, কেননা পৃথিবীতে তাঁদের সভ্যতাই প্রাচীনতম এবং বলিষ্ঠতম। কিন্তু এও আমাদের ভুললে চলবেনা যে, এক মুক্ত মানব-

সভ্যতার স্বপ্ন আরো জোরদার করে তুলতে পারে আফ্রিকার অব্যবহৃত শক্তির আধার রাশি রাশি কালো মানুষ এবং আমেরিকার ইন্দো-স্পেনীয় অধিবাসীবৃন্দ।

আজ পৃথিবী যেভাবে খণ্ড-বিখণ্ড তা আশাহত করে। অবশ্য ঐক্যের জন্য বিবিধ শক্তি এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কথাটি নবযুগের ঔপন্যাসিকের সর্বদা মনে রাখতে হবে এবং সর্বাগ্রে। ভারতবর্ষের ওপর মার্ক্সের আলোচনায় এই ঐক্যসাধনের প্রণালী নিয়ে এত চমৎকার ইঙ্গিত দেওয়া আছে, যে প্রবন্ধের শেষে তার থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়াটা হবে সম্ভবত সবচাইতে যুক্তিযুক্ত :

"একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে মূলধনকে তার অস্তিত্ব জিইয়ে রাখতে হলে দরকার মূলধনের কেন্দ্রীভবন। বিশ্বের বাজারে এই কেন্দ্রীভবনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিকটভাবে উন্মোচিত করে দেয় প্রতিটি সভ্য শহরে অধুনা সক্রিয় রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্তর্নিহিত, আঙ্গিক নিয়মকানুনগুলিকে। ইতিহাসের বুর্জোয়া অধ্যায়কে নতুন পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তিভূমিটি তৈরী করে দিতে হবে—একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বজনীন আদানপ্রদান, এবং সেই আদানপ্রদানের সহায়ক উপকরণসমূহ, আর অন্যদিকে মানুষের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ এবং বস্তুতান্ত্রিক উৎপাদনকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বিজ্ঞানোচিত শাসক ও নিয়ামক হিসাবে। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লব যেভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ গঠন করেছিল, বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যও সেভাবেই নতুন পৃথিবীর এই বস্তুতান্ত্রিক অবস্থাসমূহ সৃষ্টি করে দেয়। এক বিশাল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যখন বুর্জোয়া অধ্যায়ে অর্জিত সাফল্যগুলির নিয়ামক ও পরিচালক হয়ে দাঁড়াবে, যখন তা অধিকার করবে বিশ্ব বাজারকে ও উৎপাদনের আধুনিক শক্তিগুলিকে, এবং যখন তা অগ্রসরমান জনসাধারণের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেবে সেগুলিকে, কেবলমাত্র তখনই মানবসমাজের প্রগতিকে এক করে দেখা হবে না সেই আদিম হিন্দু পুত্তলির সঙ্গে, যে অমৃত পান করেনা, পান করে রক্ত, নিহতের মস্তকের করোটি থেকে।"

॥ সহায়ক সংকেত ॥

শাঁসঁ ছ্য জেসং—ফরাসী ভাষায় শাঁসঁ (Chanson) মানে হল গান। প্রাচীন ফরাসী ভাষায় প্রায় আশিটি মধ্যযুগীয় মহাকাব্যিক কবিতাকে শাঁসঁ ছ্য জেস্ং বলা হয়। জেস্ং কথাটির অর্থ, প্রাচীন ফরাসী ভাষায়, কোন দুঃসাহসিক বীরত্বপূর্ণ কাজ।

দাফঁ এবং ক্লো—আনুমানিক ৩০০ খৃঃ রচিত এক গ্রীক প্যাস্টোরাল রোম্যান্সের নাম। সম্ভবতঃ লংগাস নামে এক সোফিস্ট লেখকের রচনা। ঘটনা, বাল্যপ্রেমের এক মহান এবং রোম্যান্টিক আখ্যান। পরবর্তীকালে অনেকের রচনাতেই দাফঁ ও ক্লো'র প্রভাব আছে;

হেরোডেটাস—খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দীর গ্রীক ঐতিহাসিক। হ্যালিকারন্যাসাস-এ জন্ম। তিনি পার্সিয়ান যুদ্ধের শিল্পসম্মত এক চিত্র বর্ণনা করেছেন।

ঈভলিন ওয়া—(১৯০৩-৬৬) অসাধারণ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরসের অধিকারী ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ডিক্লাইন এ্যাণ্ড ফল, ভাইল বডিজ, ব্ল্যাক মিসচিফ ইত্যাদি উপন্যাসের রচয়িতা।

এডমাণ্ড ক্যাম্পিয়ন—(১৫৪০-৮১) ইংরেজ জেসুইট। বিশ্বাসঘাতকতার অভি-—যোগে প্রথম এলিজাবেথের সরকার এঁকে হত্যা করে। ক্যাম্পিয়ন ছিলেন মতাদর্শের দিক দিয়ে রোম্যান ক্যাথলিক। প্রচার চালিয়েছিলেন অ্যাংলিকান চার্চের বিরুদ্ধে।

জে. ব্লক - (১৮৮৪-১৯৪৭) জঁ। রিচার্ড ব্লক, ফরাসী প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সাংবাদিক। আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন সমাজতন্ত্রের জন্য। সমাজতান্ত্রিক এই লেখক মস্কোতে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় দীর্ঘ দিন ছিলেন।

ক্যালভিনিজম—জার্মান থিওলজিয়ান এবং সংস্কারক জন ক্যালভিন (১৫০৯-৬৪) -এর থিওলজি এবং তত্ত্বসমূহের অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত ইনস্টিটিউট্স্ (১৫৫৯)-এ। ক্যালভিনিজম বা ক্যাল-ভিনবাদ বলতে আমরা এগুলিই বুঝে থাকি। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, রিফর্মেশন নতুন কিছু করেনি, কেবলমাত্র তা পবিত্র করে তুলেছিল চার্চকে, ফিরিয়ে আনছিল তার প্রাথমিক আবহাওয়া এবং বাতিল করে দিচ্ছিল মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদ এবং।

কোড নেপোলিয়ন—কোড নেপোলিয়ন (ফরাসী সিভিল কোড) আইন রূপে পাশ হয় ১৮০৪ সালের ২১শে মার্চ। নাম দেওয়া হয়েছিল কোড সিভিল দ্য ফ্রাঁসেই। ১৮০৪-এ প্রথম নেপোলিয়নকে সম্মান প্রদর্শনার্থে এর নাম পাল্টান হয়—কোড নেপোলিয়ন।

রাবেলা— ফ্রাসোঁয়া রাবেলা (১৪৮৪-১৫৩৩) ফরাসী লেখক, সুবিদিত চিকিৎসক এবং হিউম্যানিস্ট। তাঁর অনবদ্য ব্যঙ্গরচনা গার্গাতুঁয়া এৎ পাঁতাগ্রুয়েল। এই রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার থেকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন।

পজিটিভিস্ট স্কুল—জন লক, ডেভিড হিউম, জন স্টুয়ার্ট মিল, জর্জ বার্কলি ইত্যাদি পজিটিভজ্‌ম্‌-এর বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পজিটিভিজ্‌ম্‌-এ বিশ্বাসী ব্যাক্তিদের পজিটিভিস্ট বলা হয়। অগাস্ট কোম্‌ৎ তাঁর পজিটিভিস্ট দর্শন অনুযায়ী বলেন, এই কথাটি সংক্ষেপে বর্ণিত করে সেইসব মানবচিন্তাকে যা এক থিওলজিক্যাল অবস্থার মধ্য দিয়ে এসে প্রথমে মেটাফিজিক্যাল বা দার্শনিক এক স্তরে প্রবেশ করেছে, এবং সর্বশেষ এসে মিশেছে এক বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার সাথে।

মঁতেইন— মাইকেল দ্য মঁতেইন (১৫৩৩-১৫৯২), ফরাসী লেখক, যিনি স্বীয় প্রকৃতির গভীরে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে মানবজাতির সামনে এক নতুন দর্পণ তুলে ধরেছিলেন এবং জন্ম দিয়েছিলেন এক নতুন সাহিত্য ফর্মের : প্রবন্ধের। তাঁর প্রধান রচনা—'দি এসেজ'।

তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন দেকার্তে, প্যাস্কাল। তাঁদের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে তাঁর প্রভাব পড়েছিল বেইল ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দর্শনের ওপর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন নীটশেকে এবং আঁদ্রে জিদকে।

থিওফাইল গ্যতিয়ের—(১৮১১-৭২)) ফরাসী কবি, ঔপন্যাসিক সমালোচক ও সাংবাদিক। রোম্যান্টিক কালের প্রথমদিকের রুচি অভিরুচিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের দশকগুলির নান্দনিকতা ও ন্যাচারলিজমে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন ইনি।

গ্যঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়—এডমণ্ড লুই আঁতোয়াঁ ঔ দ্য গ্যঁকুর (১৮২২-৯৬), এবং জুল অ্যালফ্রেড ঔ দ্য গ্যঁকুর (১৮৩০-৭০)। দুই ভাই, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম

দুজন। শিল্প সমালোচক, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক এবং ডায়রি লেখক হিসেবে এঁরা প্রসিদ্ধ।

জেমস মার্ক ব্যাল্ডউইন—আমেরিকান দার্শনিক। জন্ম: ১৮৬১; মৃত্যু: ১৯৩৪।

ইরাসমাস—ডেসিডেরিয়াস ইরাসমাস (১৪৬৬-১৫৩৬) মানবতাবাদী এবং উত্তরাঞ্চলের রেনেশাঁর মহত্তম চরিত্র। ১৫১৬ খৃঃ তিনি দি নিউ টেস্টামেন্টের একটি সংস্করণ বের করে খ্যাতি লাভ করেন।

ট্রিস্টান অ্যাণ্ড ইসোল্ট—ট্রিস্টান ওয়েলশ বা কেল্টিক রোম্যান্টিক লিজেণ্ডের এক নায়ক। আর্থারিয়ান সাইক্‌ল্-এ এর উল্লেখ আছে। কর্ণওয়ালের রাজা মার্কের ভাইপো হল ট্রিস্টান। পিতৃব্যের জন্য আয়ারল্যাণ্ডের রূপসী ইসোল্টকে ধরে নিয়ে আসছিল সে। অজ্ঞাতে সে ইসোল্টের সঙ্গে মন্ত্রপূত এক পানীয় পান করে এবং দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্ম নেয়। মার্ক একথা জানতে পারে। অতঃপর দুজনের বিচ্ছেদ এবং শেষঅবধি উভয়েরই যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু। স্যার টমাস ম্যালরি, টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড, স্যুইনবার্ণ প্রভৃতি ট্রিস্টান থীমের ওপর লিখেছেন।

উইলিয়াম কবেট—(১৭৬৩-১৮৩৫) ইংরাজ লেখক, সাংবাদিক ও প্রগতিপন্থী। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লব থেকে ভিক্টোরিয়ান যুগের সূত্রপাত — এই অধ্যায়ে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের জীবন কথা তাঁর উপজীব্য। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত দুটি বই হল 'রুরাল রাইডস্' ও 'অ্যাডভাইস্ টু এ ইয়ঙ ম্যান'। একাধারে যুদ্ধের নিপীড়ন এবং অন্যদিকে কৃষি ও যন্ত্র বিপ্লবের প্রভাবে সমাজের ভাঙচুর তদানীন্তন মানুষকে কিভাবে পর্যুদস্ত করছিল তারই আনুপূর্বিক বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর রচনায়।

উইলিয়ম মরিস—(১৮৩৪-৯৬) ইংরেজ কবি, শিল্পী এবং সমাজতান্ত্রিক। প্রধান লেখা: দ্য লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অব জেসন, দ্য আর্থলি প্যারাডাইস ইত্যাদি। ১৮৭৭-এ সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশন অব এনসিয়েণ্ট বিল্ডিংস্ প্রতিষ্ঠা করেন।

র‍্যাবঁ— (জঁ নিকোলাস) আর্থার র‍্যাবঁ (১৮৫৪-৯১); ফরাসী কবি ও অ্যাডভেঞ্চারার। সিম্বলিস্ট মুভমেণ্টের অন্যতম পথিকৃৎ।

জন রাস্কিন:—(১৮১৯-১৯০০) লেখক, সমালোচক ও শিল্পী। ভিক্টোরিয় ইংল্যাণ্ডে গণরুচি ও গণচেতনার ওপর প্রভাব ফেলেন। বিরোধী

পক্ষকে অনুপ্রাণিত করেন এক অবাধ দর্শনের নীতিতে বিশ্বাস করতে।

চসার— জিওফ্রে চসার (খৃঃ-জন্ম আনুমানিক ১৩৪০)—ইংরেজী সাহিত্যের জনক বলা চলে। ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রিসেইডে, লিজেণ্ড অব গুড উইমেন, ক্যান্টারবেরি টেলস ইত্যাদি তাঁর সৃষ্টি।

জিওভান্নি বোকাচ্চিও—(১৩১৩-৭৫) ইতালীয় সাহিত্যিক ও বিশ্ববরেণ্য হিউ-ম্যানিস্ট। অমর কথাসাহিত্য 'ডেকামেরনের' রচয়িতা।

প্যাস্টন— পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের চিঠিপত্রের বৃহত্তম সংগ্রহ বা প্যাস্টন লেটারস। লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পত্র-গুলি ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

স্যার টমাস ম্যালরি—ইংরেজী গদ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপকদের মধ্যে অন্যতম। আনুমানিক ১৪৭০ সালে ক্যাক্সটনের প্রকাশনায় ইনি 'মর্ট ডি আর্থার' রচনা করেন। এঁর প্রাঞ্জল ভাষা সর্বজনবোধ্য।

শাতোব্রাঁ— ফ্রাঁসোয়া রেনে দ্য শাতোব্রাঁ (১৭৬৮-১৮৪৮) ফরাসী সাহিত্যিক ও রাজনীতিবীদ। ফ্রান্সের প্রথম রোম্যান্টিক লেখকদের মধ্যে অন্যতম। ১৮২২ সালে কংগ্রেস অব ভেরোনাতে এঁকে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠান হয়।

জর্জ বার্কলি— (১৬৮৫-১৭৫৩) অ্যাংলিকান বিশপ এবং দার্শনিক। লক এবং হবের বিরোধীতা করেছিলেন বার্কলি। দার্শনিকদের বিরোধীতা করা ছাড়াও তিনি মুখর ছিলেন নব্য গাণিতিক পদার্থবিদদের এবং কফিহাউসের ভণিতাপূর্ণ, বাচাল "মুক্ত চিন্তা ভাবনার সমর্থক"দের বিরুদ্ধে।

মিগুয়েল দ্য সার্ভান্তেঁ—(১৫৪৭-১৬১৬) স্পেনের ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও কবি। 'ডন কুইক্সোট' উপন্যাসের জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

লক— জন লক (১৬৩২-১৭০৪) ইংরেজ দার্শনিক। ইংল্যাণ্ডে 'এন-লাইটেনমেণ্ট এবং রীজন' এর যুগের প্রবর্তক। মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনুপ্রেরণাদাতা। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'থিওরি অব নলেজ,' 'পলিটিক্যাল থিওরি', 'থিওরি অব এডুকেশন' ইত্যাদি কালজয়ী।

রিলেটিভিস্ট স্কুল- আপেক্ষিকতা বা রিলেটিভিটির তত্ত্বে বিশ্বাসীদের এই নামে অভিহিত করা হয়। গ্যালিলিও, লরেন্‌ৎস্‌, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে আধুনিক করে তোলেন।

ভলটেয়ার - (১৬৯৪-১৭৭৮) মহান ফরাসী লেখকদের মধ্যে অন্যতম। আজও তিনি বিশ্ববরেণ্য তাঁর বিশ্লেষণধর্মিতা ও বিদ্রূপাত্মক লেখনীর জন্য। গোটা জীবনে তিনি মানবজাতির সামগ্রিক সম্মুখ পদক্ষেপের কথা বিবৃত করে গিয়েছেন। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'কাঁদিদ'।

দেনিস দিদেরো—(১৭১৩-৮৪) ফরাসী পণ্ডিত ও দার্শনিক। অসাধারণ বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর। 'এনসাইক্লোপিদি'র সম্পাদনা করেছিলেন তিনি।

চার্টিস্ট ধর্মঘট—গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম জাতীয় আন্দোলন। সম-নির্বাচন এলাকা, সার্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্টের সদস্যদের বেতন, সম্পত্তিকে কোন কোয়ালিফিকেশন হিসেবে না ধরা, ব্যালটে ভোট এবং বাৎসরিক পার্লামেণ্ট—এই ছয়টি ইস্যু নিয়ে পীপল্স্ চার্টার প্রস্তুত হয়। শুরু হয় পুলিশী দমন। উত্তর ইংল্যাণ্ডে ১৮৪২ সালে বিরাট ধর্মঘট এবং দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার—(১৮২১-৮০) ফরাসী ঔপন্যাসিক। ল্য এদুকেশঁ সেঁতিমেইন-তল, ল্য তেনতেইশঁ দ্য স্যাঁং অাঁতোয়াঁ, মাদাম বোভারি, সালামবো, ব্যুভার্দ্ এৎ পেয়ুশেৎ ইত্যাদি উপন্যাসের স্রষ্টা।

বালজাক—(১৭৯৯-১৮৫০) ফরাসী ঔপন্যাসিক। সমস্ত সমাজ তার বিশাল ব্যাপ্তি ও ব্যাপক বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত তাঁর ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ রচনা-'ল্য কোমেদি হিউমেইন'-এ।

ল্যাফর্গ—জুল ল্যাফর্গ (১৮৬০-৮৭) ফরাসী সিম্বলিস্ট কবি। মৃত্যু, একাকীত্ব এবং একঘেয়েমির অবসেশন তাঁর ছিল। এই অবশেসনকে বিদ্রূপা-ত্মক তির্যক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন তিনি 'ল্য কমপ্লেইন্‌ৎস্-'এর কবিতাগুলিতে। ফরাসী সদবাস্তববাদীরা হয়তো তাঁকে অবহেলা করেছেন। কিন্তু ইমেজিস্টরা তাঁর প্রভাব স্বীকার করেছেন। প্রশংসা করেছেন তাঁকে টি, এস, ইলিয়ট এবং এজরা পাউণ্ড।

স্পিনোজা — বারুচ (বেনিডিস্ট) স্পিনোজা (১৬৩২-৭৭) ওলন্দাজ ইহুদি দার্শনিক। ইহুদি ধর্মের অন্ধ প্রথা ও বিশ্বসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং ইহুদি ধর্মসভা কর্তৃক সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এথিক্স' 'পোলিটিক্যাল ট্রিটিজ'ও 'প্রিন্সিপল্স অফ দি ফিলজফি অফ দেকার্ত।'

দেকার্তে—রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০) ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম

মহান এক স্তম্ভ। কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি, থিওরেটিক্যাল পদার্থবিদ্যা, মেথডোলজি ও মেটাফিজিক্স্-এর জগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

বেকন—(১৫৬১-১৬২৬) দার্শনিক ও পণ্ডিত। মধ্যযুগীয় ও আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যেকার সন্ধিক্ষণটির 'নব্য দর্শন' সম্পর্কে তিনি যা মতামত প্রকাশ করে গিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়।

কাণ্ট—ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) জার্মান দার্শনিক। 'সমালোচনামূলক' "তুরীয়" এবং "ফর্ম্যাল' আদর্শবাদের অন্যতম প্রবক্তা।

হেগেল—জর্জ উইলহেল্ম্ ফ্রিডরীখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১); জার্মান দার্শনিক। প্রপঞ্চবাদ ও দ্বন্দ্ববাদ সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। পরবর্তীকালে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ক্ষেত্রে মার্কস তাঁকে যৌক্তিকভাবে সমর্থন করেন নি।

আলেক্সাণ্ডার হিউম—(১৫৬০-১৬০৯) স্বনামধন্য স্কটিশ কবি। ধর্মীয় কিছু প্রবন্ধের রচয়িতা। কিছু স্তোত্র, ধর্মীয় গীতি ইত্যাদির সংগ্রহীতা। তিনি একটি আত্মজীবনীও লিখে গিয়েছেন।

সিসিল জন রোডস—ব্রিটিশ অভিযাত্রী। রোডেশিয়াকে রাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে এঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

হ্যাভলক এলিস—(১৮৫৮-১৯৩৯) ব্রিটিশ চিকিৎসাবিদ, প্রাবন্ধিক। মানুষের যৌন অভিপ্রায় ও চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা বিশ্ববিখ্যাত।

ইভান পোত্রোভিচ পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) রুশীয় শারীরবিদ্যাবিশারদ। রক্ত সঞ্চালন, ডাইজেষ্টিভ গ্ল্যাণ্ডগুলির ক্রিয়া এবং কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ণ ও গবেষণা সর্বজনবিদিত।

লুই ফার্দিনাণ্ড সেলিন—(১৮৯৪-১৯৬১) ফরাসী সাহিত্যিক। 'জার্নি টু এণ্ড অব দ্য নাইট' তাঁর প্রথম উপন্যাস। সেই উপন্যাসের জন্যই তিনি খ্যাত। ফরাসী সাহিত্যের প্রচলিত প্রাচীন রীতিনীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন তিনি।

ঈসকাইলাস—(৫২৫-৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ) প্রাচীনতম এবং সম্ভবতঃ মহত্তম গ্রীক ট্র্যাজিক কবি। ওরেস্টিয়ান ট্রিলজি, সেভন এগেইনস্ট থীবস ইত্যাদি তাঁর রচনা।

অ্যারিস্টোফেনিস—সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক কমেডি নাট্যকার। একাধিক রাজনৈতিক নাটক, মিথলজিক্যাল বারলেস্ক্ এবং প্যারডির রচয়িতা।

উল্লেখযোগ্য রচনা—দি ক্লাউড্‌স্‌, দি ওয়াস্‌প্‌স্‌, দি ফ্রগস্‌ ইতাদি।

আঁদ্রে ম্যালর—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্ম। ফরাসী সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ।

এরসকাইন ক্যাল্‌ড্‌ওয়েল—(১৯০৩) আমেরিকান লেখক। প্রধান তিনটি উপন্যাস টোব্যাকো রোড, গড্‌স্‌ লিট্‌ল্‌ একর, ট্রাবল ইন জুলাই।

শলোখভ—মিখাইল আলেক্সান্দ্রোভিচ শলোখভ (১৯০৫-) রুশ ঔপন্যাসিক। ১৯৬৫ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। ১৭ বছর বয়সে লিখতে শুরু করেন তিনি। তাঁর প্রথম বই 'দোন্‌স্কি রাস্‌কাজি'। একগুচ্ছ বাস্তবধর্মী ছোটগল্পের সংকলন। অন্যান্য লেখা 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন', 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড' ইত্যাদি।

স্তেঁধাল—ফরাসী ঔপন্যাসিক মারী আঁরি বেইল (১৭৮৩-১৮৪২) এর ছদ্মনাম। তাঁর অধিকাংশ লেখাতে আত্মজীবনীমূলক ছাপ আছে কিছু। পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। তার মধ্যে দুটি অসমাপ্ত। একদা অবহেলিত স্তেঁধালের গদ্যরীতি আজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার অধিকারী। অসাধারণ ছিল তাঁর সাইকোলজিক্যাল দৃষ্টির গভীরতা।

ল্যুডাইটস—১৮১১ সালের শেষ দিকে এদের আবির্ভাব। মূলতঃ বিধ্বংসী কার্যকলাপের সাহায্যে এই দলটি তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে দিতে চেয়েছিল। প্রথম আবির্ভাব নটিংহামে। এরা সাধারণত মুখোস পরিহিত থাকত এবং চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাত রাত্রে। বাস্তবই হোক বা কাল্পনিকই হোক এদের দলপতি ছিল রাজা লাড। সম্ভবতঃ পৌরানিক নেড লাড থেকে এই নাম নেওয়া হয়। লর্ড লিভারপুলের সরকার চূড়ান্ত দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়।

এমিল অগাস্ট অ্যালেইন—(১৮৬৮-১৯৫১) ফরাসী দার্শনিক। এঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ। পল ভালেরির বন্ধু ছিলেন তিনি। সক্রেটিসের মত অ্যালেইন মানব মনকে উজ্জীবিত করে ও তাকে নাড়া দিয়ে মননশীলতাকে জাগরূক করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।